বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের রিডিং ম্যাটেরিয়ালস
সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প

বাংলাদেশ চর্চা

নীলুফার বেগম
এমডিএস, বিপিএটিসি
ও
গবেষণা প্রকল্প পরিচালক

এস এম জোবায়ের এনামুল করিম
গবেষণা কর্মকর্তা, বিপিএটিসি
ও
গবেষণা প্রকল্প সহযোগী

আবদুল্লাহ মাহবুবুজ্জামান খান
সহকারী পরিচালক, বিপিএটিসি
ও
গবেষণা প্রকল্প সহযোগী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

সূচিপত্র

বিষয়/লেখক		পৃষ্ঠা নং
মডিউল ১ ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সামাজিক বিবর্তন		
১.১	বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় – নীলুফার বেগম	১
১.২	বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পটভূমি – ইয়াসমিন সুলতানা	৮
১.৩	বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বৃটিশ শাসনের প্রভাব – রফিকুল ইসলাম ভূঞা	১৪
১.৪	বাংলাদেশের জাতিসত্তার সন্ধান – মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা	২৫
১.৫	বাংলাদেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমুহ – অধ্যাপক মোফাজ্জালুল হক	৩৩
১.৬	বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য – ডঃ বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর	৩৭
১.৭	ভাষা আন্দোলনের প্রভাব – আ ক ম মাহবুবুজ্জামান	৩৯
১.৮	বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ও সচলতা – নীলুফার বেগম	৪৬
১.৯	গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো – এম সালিমুল্লাহ খান	৫৮
১.১০	গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন – ম ইমামুল হক	৬২

বিষয়/লেখক	পৃষ্ঠা নং

মডিউল ২ ঃ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ

২.১ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কৌশল — ৭০
- শেখ মুস্তাফিজুর রহমান

২.২ বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন কৌশল — ৮৩
- সৈয়দ শামসুল আলম

২.৩ বাংলাদেশের পশুসম্পদ উন্নয়ন কৌশল — ৯৩
- মোঃ আনিছুর রহমান

২.৪ বাংলাদেশের বনসম্পদ উন্নয়ন কৌশল — ১০৩
- কাজী হাসান ইমাম

২.৫ বাংলাদেশের খনিজ ও জ্বালানী সম্পদ উন্নয়ন কৌশল — ১২৬
- সৈয়দ শামসুল আলম

মডিউল-৩ ঃ বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ

৩.১ জননীতি ও নীতি প্রক্রিয়া — ১৪৬
- মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা

৩.২ নীতি বিশ্লেষণের বিভিন্ন মডেল — ১৫১
- মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা

৩.৩ বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষানীতি — ১৫৬
- প্রফেসর এম হোসেন আলী

৩.৪ বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য নীতি — ১৭০
- ডঃ মোঃ তারেক

৩.৫ বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য নীতি — ১৮৩
- ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফরিদ

৩.৬ বাংলাদেশ সরকারের শিল্প নীতি — ১৮৭
- ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফরিদ

৩.৭ বাংলাদেশে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যাবলী — ১৯১
- মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা

বিষয়/লেখক	পৃষ্ঠা নং

মডিউল ৪ ঃ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

৪.১ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি ঃ একটি পর্যালোচনা ১৯৩
- ডঃ আবরার চৌধুরী

৪.২ সার্ক ও আসিয়ান ঃ একটি তুলনামুলক আলোচনা ২১৩
- কাজী মোঃ শামসুল আলম

৪.৩ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহ ২২৮
- ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফরিদ

৪.৪ জাতীয় শক্তি-এর নির্ধারক উপাদানসমূহ ২৩৩
- মুঃ আব্দুল কাদের

৪.৫ বাংলাদেশ ও নিকট প্রতিবেশি রাষ্ট্রসমুহের সম্পর্ক ২৪২
-এ কে এম সবুর

৪.৬ নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ ২৫৭
- কাজী মোঃ শামসুল আলম

বাংলাদেশ চর্চা

মডিউল-১ ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য
ও
সামাজিক বিবর্তন

বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

নীলুফার বেগম

এমডিএস, বিপিএটিসি

কোন জনগোষ্ঠির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় জানতে হলে, নৃতত্ত্ব কি তাই আগে জানা প্রয়োজন। নৃ হলো মানুষ , এবং তত্ত্ব হলো শাস্ত্র। সুতরাং নৃতত্ত্বকে মানব শাস্ত্র বলা যায়। Anthropology শব্দটির উৎস গ্রীক শব্দ Anthropos ও Logia হতে যার অর্থ যথাক্রমে মানুষ ও পাঠ। মানুষ সম্পর্কিত পাঠই Anthropology অর্থাৎ নৃতত্ত্ব বা নৃবিজ্ঞান। মানুষ ও তার কর্মের বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনায় নৃতত্ত্ব সমৃদ্ধ। মানুষের উৎপত্তি ও তার দৈহিক, সামাজিক তথা আচরণের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত গবেষণা নৃতত্ত্বের আলোচনাভুক্ত।

প্রাচীনকালে নয় মাত্র গত শতাব্দীতে এ বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। কিন্তু বয়োকনিষ্ঠ হলে কি হয়, এর যথেষ্ঠ গুরুত্ব রয়েছে। সেজন্য অন্যান্য বিজ্ঞানের ছাত্ররাও এ বিজ্ঞানের চর্চা করছে। নৃবিজ্ঞানের দু'টি দিক রয়েছে ঃ

১) দৈহিক বা দেহগত দিক
২) সাংস্কৃতিক বা মনোগত দিক।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা মানুষের এক একটি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু নৃবিজ্ঞান হলো মানুষের সামগ্রিক দিকের বিশদ পর্যালোচনা। নৃবিজ্ঞানের মুল কথা হলো কোন জিনিসের অংশ বিশেষকে বিচ্ছিন্নভাবে জানা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী হোবল বলেন 'No Part can be fully or even accurately understood apart from the whole' - অতএব নৃবিজ্ঞান কেবল প্রাণী হিসেবে মানুষের পর্যালোচনা নয়, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সংস্কৃতির গবেষণাও বটে।

অন্যান্য বিজ্ঞানের একটা সুবিধা আছে যা নৃতত্ত্বে নেই। অন্যান্য বিজ্ঞানের বিচার্য বিষয় মানুষ নয় অন্য কিছু। তাই অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্তে আসতে পারা অনেক সহজ। কিন্তু নৃতত্ত্বের বিচার্য বিষয় হলো মানুষ, আর নৃবিজ্ঞানী নিজেও হলেন মানুষ। যেহেতু বিচার্য বিষয় ও বিচারক উভয়ই মানুষ, তাই এখানে নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্তে আসা অনেক কঠিন ব্যাপার। মানুষের নানা পুর্বধারণা এবং পুর্বকল্পিত বিশ্বাস এখানে সহজেই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে চায়।

বর্তমানে নৃতাত্ত্বিকরা মানুষকে সাধারণত তিনটি বড় ভাগে (great races) ভাগ করেন, যেমন -

১. নিগ্রয়েড বা পশমী চুল (Ulotrichi)
২. মঙ্গলয়েড বা সোজাচুল (Leiotrichi)
৩. ককেশীয় বা তরঙ্গচুল (Cymotrichi)

অনেকে এর সাথে 'অষ্ট্রালয়েড' নামে একটি চতুর্থ বিভাগ যোগ করতে চান, যার মধ্যে পড়ে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, ভারত উপমহাদেশের সাঁওতাল, ওরাও, কুরুম্বা, চেঞ্চু প্রভৃতি আদিবাসী, সিংহলের আদিবাসী ও জাপানের আইমু । কিন্তু অন্যেরা বলেন, যেহেতু এদের চুলের বৈশিষ্ট্য ককেশীয়দের অনুরূপ, তাই এদের বিচার করতে হবে ককেশীয়দের বিশেষ শাখা হিসেবে । এঁরা এই শাখার নাম দেন প্রত্ন ককেশীয় বা 'আর্কাইক ককেশয়েড' (Archaic Caucasoid)। নিগ্রয়েড,মঙ্গোলয়েড ও ককেশয়েড-এই তিনটি বড় রেসকে আবার ভাগ করা হয় বিভিন্ন ছোট ছোট রেসে ।

যে ৭টি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এই রেসগুলো ভাগ করা হয় সেগুলো হলো ১) মাথার চুল ২) মাথার আকৃতি ৩) নাকের আকৃতি ৪) চোখের অবস্থা ৫) মুখের আকৃতি ৬) গায়ের রং ৭) দেহের উচ্চতার পরিমাপ ।

সাধারণত কোন দেশের অধিবাসী কেবল এক রকম দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষ নিয়ে গঠিত নয়, বরং একাধিক রেস দ্বারা গঠিত । এদের সম্পর্কে জানলে আমাদের বুঝতে সুবিধে হয় কিভাবে একটি দেশের জনসমষ্টি গড়ে উঠেছে এবং তাদের মধ্যে কি কি প্রভাব কাজ করছে । কারণ, বিভিন্ন রেস সাধারণতঃ বয়ে আনে বিভিন্ন সংস্কৃতি, আনে স্বতন্ত্র ইতিহাসের ধারা ।

রেস ও জাতি ঃ ইউরোপের অনেক ভাষায় রেস শব্দটা এসেছে ইটালীয়ান রাজ্জা (Razza) শব্দ থেকে । সম্ভবত ইটালীয় ভাষায় শব্দটা এসেছে আরবী রাস (Ras) শব্দ থেকে । রাস মানে শিরোনাম । রেস বলতে বুঝায় দৈহিক আকার আকৃতির বিশেষ মিল যে সব আকার আকৃতি চলে বংশ পরম্পরায় । অন্য দিকে Nation বা জাতি বলতে বুঝায় ইতিহাসের ঘটনা ধারায় গড়ে উঠা এমন একটা জনসমষ্টি যারা বাস করে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে, কথা বলে একটি বিশেষ ভাষায় ও নিজেদের মধ্যে অনুভব করে একটি সংস্কৃতি ও আবেগগত ঐক্য ।

রেস থিউরী ঃ রেস থিউরী বিশ্বাস করে পৃথিবীর সব রেস, কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে এক নয় । সব রেস সমান উন্নত নয়, বরং কোন কোন রেস জন্মগতভাবেই অন্য রেস অপেক্ষা উন্নত । আর উন্নত রেস অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রেসের উপর প্রভুত্ব করবেই । রেস থিউরীর মাধ্যমে ইউরোপের ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে চান ফরাসী ঐতিহাসিক উগস্ত্যা তৈরী । তিনি বলেন ফরাসী বিপ্লব হলো

আসলে দু'টি রেসের মধ্যে সংঘাত । এটা হলো রোমান কৃষক ও মধ্যবিত্তদের সাথে ফ্রান্সের রাজা ও আভিজাত্যের সংঘাত । পরে আরেক জন ফরাসী লেখক গাবিনো যিনি রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন তিনি আর্য মাহাত্ম্যের কথা প্রচার করে একটি বই লিখেন । তিনি বলতে চান যে, ইউরোপের সাধারণ মানুষ সকলেও অনার্য যারা নিজেদের শাসন করতে অক্ষম । গাবিনোর শিষ্য লাপাজ প্রমান করতে চান যে, শহরে যারা বাস করে তারা সাধারণতঃ করিৎকর্মা এবং আর্য বংশ উদ্ভুত । কিন্তু গ্রামের কৃষকরা তা নয় । আধুনিক রেস থিউরীর একটা বড় অংশই আর্য রেসের ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে । বিষয়টি ভাল করে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে আর্য বলতে কি বুঝায় ।

আর্য রেস (Aryan Race) পন্ডিতগণ মনে করেন যে, সংস্কৃত, লাতীন, গ্রীক , জার্মান ও কেলাটিক ভাষা পরস্পরের সাথে যুক্ত এবং এসব ভাষায় যারা কথা বলে তাদের পুর্ব পুরুষ ছিল এক । ভাষা তাত্বিক ম্যাক্স মুলার (১৮২৩-১৯০০) এর নাম দেন আর্য । তিনি শব্দটি গ্রহণ করেন সংস্কৃত ভাষা থেকে যার শব্দগত অর্থ অভিজাত অথবা প্রভু । আর্য বলতে বুঝায় এমন এক সম্ভ্রান্ত জাতিকে যারা উত্তর ভারতে আসে বহুদিন আগে বাইরে থেকে । এরা ছিল মহাপরাক্রান্ত যোদ্ধা জাতি । ম্যাক্স মুলার বলেন আর্য ও ইউরোপীয় কিংবদন্তীর উরভন্ধ একই রেস, মুলারের পর একজন ইংরেজ লেখক হুষ্টন ষ্টুয়ার্ট চেম্বার্লেন তাঁর Foundation of the twentieth century তে বলেন জার্মানরা খাঁটি আর্য রক্ত বহন করছে এবং তিনি নিজে এত বেশী আর্যভক্ত হয়ে উঠেন যে জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণ করে জার্মানীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন । জার্মানরা গ্রহণ করে তাঁর এই আর্যবাদ এবং গড়ে তুলে জাতির তত্ত্ব । যার ফলশ্রুতিতে জার্মানীতে ইহুদী নিধন শুরু হয় এবং লক্ষ লক্ষ লোক এই আর্যবাদের শিকার হয় ।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই রেস থিউরীর প্রভাব দেখা যায় । ভারতে ইংরেজ শাসক শ্রেণীও দেশীয়দেরকে কালা আদমী বলে ঘৃণা করেছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জাপানীরাও প্রচলন করে এক ধরণের রেস মতবাদের । তাদের মতে যাদের গায়ে লোম বেশী তারা বিবর্তনের দিক থেকে পিছিয়ে থাকা লোক । যেহেতু মঙ্গোলীয়দের গায়ে লোম কম, তাই তারা বিবর্তনিক দিক থেকে উন্নত । রেস থিউরী পাকিস্তানী আমলেও দেখা যায় । তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের 'প্রভু নয় বন্ধু' গ্রন্থে, তাতে তিনি মন্তব্য করেন যে বাঙ্গালীরা জন্মগতভাবেই হীন । মানুষের ইতিহাস থেকে রেস থিউরীর স্বপক্ষে কোন সমর্থন পাওয়া যায় না । কারণ দেখা যায় জনসমষ্টির দৈহিক আকার না বদলালেও তার ইতিহাস বদলায়, আজকের গ্রীকদের সাথে প্রাচীনকালের গ্রীকদের দৈহিক পার্থক্য খুব বেশী ঘটেছে , এমন কথা কেউ বলবে না । কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের চিন্তা ও কর্মের ঐশ্বর্য্যের সাথে আজকের গ্রীসের তুলনা হয় না । মানুষের মধ্যে কারো গায়ের রং কালো, কারো হলুদ , কারো সাদা, কারো মাথার চুল পশমী, কারো সোজা, কারো বা ঢেউ খেলানো, কারো নাক বোঁচা বা টিকালো । কিন্তু এসব শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কোন যোগাযোগ আছে বলে প্রমাণিত হয়নি । যদিও বা তা প্রমাণের চেষ্টা অতীতে অনেক হয়েছে এবং এখনও কিছু কিছু হচ্ছে ।

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বিশ্ব মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামে যে দেশটি তার স্থান অধিকার করে নিয়েছে তার জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তির আলোচনা বা বিশ্লেষণ বিচ্ছিন্ন বা এককভাবে করা সম্ভব নয়। কারণ যেমন অদ্যাবধি শুধুমাত্র বাংলাদেশের মানুষ নিয়ে নতুন করে আলাদা কোন গবেষণা হয়নি , অপরদিকে একথাও অনস্বীকার্য যে, একমাত্র বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে এর জনগণের নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তিও ঘটেনি । তাই এই উপমহাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের আংগিকেই এই বিষয়টির আলোচনা সম্ভব ।

দেহের বিভিন্ন অংশের পরিমান গ্রহণ করে এই উপমহাদেশের মানুষকে প্রথম বিশ্লেষণ করতে চান নৃতাত্ত্বিক স্যার হারবাট রিজলে । তাঁকে বলা চলে এই উপমহাদেশের জনগণের নৃতাত্ত্বিক আলোচনার প্রকৃত জনক । রিজলের মানবগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় মানুষের দৈহিক আকৃতির বিভাগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কেবল মাত্র আর্য/দ্রাবিড় ও মঙ্গোলয়েডরাই, ছিলেন অবিমিশ্র । কিন্তু আর সকল মানবগোষ্ঠীই মিশ্র প্রকৃতির বলে তাঁর অভিমত । এই উপমহাদেশের মানুষ এই তিনটি বিশুদ্ধ মানব ধারা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বলে তাঁর ধারণা ।

রিজলে তার People of India গ্রন্থে বাঙ্গালীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিয়ে বলেন যে, এদের অধিকাংশের মাথা গোল, নাক মধ্যমাকৃতি থেকে চওড়া, উচ্চতা মাঝারি । বাঙ্গালীর গায়ের রং শ্যাম, কালো, কিছুটা পীত । বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এবং পাবর্ত্য অঞ্চলে যে সব উপজাতি বসবাস করে তাদের মাথাও গোল । রিজলে এ থেকে অনুমান করেন যে, বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীতে মঙ্গোল প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে । তবে তিনি আবার তাদের গায়ের রং, নাকের গঠন, মুখে দাঁড়ি গোফের প্রাচুর্য ও চোখের গড়ন দেখে মত দিয়েছেন যে, এদের মধ্যে দাবিড় প্রভাবও বিদ্যমান । মোট কথা রিজলে যা বলতে চান তা হলো বাঙ্গালীরা মঙ্গোল দ্রাবিড় প্রভাবিত এক শঙ্কর জাতি ।

রিজলের তত্ত্বকে সমালোচনা করেন রমা প্রশাদ চন্দ তার Indo Aryan Race বইতে । চন্দ্রের পরে রিজলের সমালোচনা করেন বিরজা শংকর গুহ তাঁর An outline of Racial Ethnology in India শীর্ষক বইয়ে । বাংলাদেশের সভ্যতার ইতিহাস কতদিনের পুরাতন তা কোন মনীষী নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না । তবে এ সভ্যতার বয়স যাই হোক না কেন মানব প্রজাতিরই একট অংশ যে এই বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী এ কথা স্বীকার করতেই হবে ।

জীবের ক্রমবিকাশের ধারায় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের আদিতে কোন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল কিনা তা বলা যায় না । তবে ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম ও উত্তর গিরিপথ দিয়ে নানা জনগোষ্ঠী এখানে প্রবেশ করেছে । এরা কালক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে তথা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে । প্রাগৈতিহাসিক যুগে খ্রীষ্টপুর্ব ১৫০০ অব্দে আফগানিস্তানের পথ ধরে এবং উত্তর পুর্ব অঞ্চল থেকে মঙ্গোলীয়রা ভারতে প্রবেশ করে । ক্রমে ক্রমে তুর্কী, ইরান এবং উত্তর

ইউরোপীয়রাও ভারতে এসেছে। আর্য এবং অন্যান্যদের আগমনের পুর্বেও ভারত বর্ষে এক সভ্য জাতির বাস ছিল। দ্রাবিড় জাতি সিন্ধু অঞ্চলে এবং অষ্ট্রিক ভাষীরাও ভারতের পুর্বে ও দক্ষিণ অঞ্চলে বাস করতো। বার্মা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বাংলার পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করে। এই মানবগোষ্ঠীই বর্তমানে বাংলাদেশের আদিবাসীদের পুর্ব পুরুষ বলে অনেকে মনে করেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাংলাদেশের যেসব বর্ণের উৎপত্তি লক্ষ্য করা যায় সেগুলো ছাড়াও বাংলার জনগোষ্ঠিতে নানা বর্ণের মিশ্রণ ঘটেছে। আর্যদের পর পরই এদেশের পার্সীক ও শক জাতিরা এসেছে বলে ইতিহাসে প্রমাণ মেলে। তারা বাঙ্গালীর দেহে মধ্যমাকৃতি, গোলমাথা, দীর্ঘ, উন্নত নাক ও পীতাভ চোখের ছাপ রেখে গেছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজবংশেরও আগমন ঘটেছে, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের পুর্বে এখানে তুর্কী, পাঠান, মুঘল, ইরানী এবং আরবীয়রা এসেছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠির রক্তের ধারা বাঙ্গালীর দেহে এমনভাবে সংমিশ্রিত হয়েছে যে বাঙ্গালীর দেহ বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকালে দেখা যায় তার একই দেহের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরিচায়ক।

ভাষার উৎপত্তি এবং বিকাশের মাধ্যমেও কোন অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যায়। এ মানদন্ডে বাংলাদেশের ভাষার উৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আর্য প্রভাবের পুর্বে এখানে অষ্ট্রিক ভাষার প্রচলন ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ অঞ্চলে আদি অষ্ট্রেলীয় প্রভাব পড়ে ছিল। অষ্ট্রিক ভাষা ছাড়াও দ্রাবিড় ভাষার উপাদান বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়। অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং অবৈদিক আর্য ভাষার উপর শতাব্দী ধরে বৈদিক আর্য ভাষার প্রভাব পড়ায় বির্বতন ও রুপান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়। এর মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গালী জাতি বা বাংলা কোনটাই অবিমিশ্র নয়।

এভাবে বাংলাদেশের জনগণের নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, জনতাত্ত্বিকভাবে এখানে বহু রেসেরই সংমিশ্রণ ঘটেছে। এদের মধ্যে যেগুলো বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ তার মধ্যে প্রটোও অষ্ট্রলয়েড বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। একে 'ভেদ্দা' বলা হয়ে থাকে। এদের মাথা লম্বা, নাক চ্যাপ্টা এবং রং কালো বা বাদামী। প্রাচীনকালে যে সব জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তাদের মধ্যে এরা অন্যতম। জনতাত্ত্বিকদের মতে তাদের পর পরই লম্বা মাথা বিশিষ্ট ভূমধ্যসাগরীয় ককেসয়েড বাশ্বেতকায় এখানে আগমন করে। এদেরকে আর্যও বলা হয়ে থাকে। অধিকন্তু ছোট বা চওড়া মাথা বিশিষ্ট আর্মেনয়েড ইন্দোইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানবগোষ্ঠীও এখানে আগমন করে বলে মনে করা হয়। আর্যকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় খ্রীষ্টপুর্ব এক হাজার বছরের মধ্যে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী, আফগান, মুগল, আরবী, আবিসীনীয় ও ইরানী অনেক জনগোষ্ঠি এই উপমহাদেশে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে এসব বহিরাগত মুসলিমরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাংলাশের চট্রগ্রাম, নোয়াখালী ও সিলেট অঞ্চলে আগমন করেন। এ সময়ে তাই এদের সংমিশ্রণে বাংলাদেশের জনতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে নুতন উপাদান

সংযোজিত হয় । বাংলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান ঐসব বহিরাগত মুসলমানদের বংশধর বলে অনুমান করা হয় । খাসীয়া , সাঁওতাল ও 'প্রটো অষ্ট্রেলয়েড' দলভুক্ত । মঙ্গোলয়েড রেস উপাদান দেখা যায় গারো, হাজং, মুরং ও টিপরা ইত্যাদি আদিবাসীদের মধ্যে ।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী যে দৈহিক দিক থেকে এক রকম নয় তা দেখা যায় মাথার আকৃতি ও চামড়ার রঙের পার্থক্যের মধ্য দিয়ে । সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায় যে, সমুদ্রতীরবর্তী অধিবাসীদের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বণিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যে মানবগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল তা স্থানীয় লোকদের সঙ্গে তুর্কী ও সর্বমোট জনগোষ্ঠীর রক্তের সংমিশ্রণের ফল ।

বাংলাদেশের জনগণের দৈহিক আকৃতি ছাড়াও এই উপমহাদেশের নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তির গবেষণায় স্যার উইলিয়াম জোনস তার ভাষা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে স্বমত প্রকাশ করেছেন । উইলিয়াম জোনস প্রথমে আর্যদের সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করেন । পরে গ্রীয়ারসন এই উপমহাদেশের আর্য ভাষাগুলোকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে বলে মত প্রকাশ করেছেন । একটিকে বলা চলে মধ্য দেশীয় পরটিকে প্রান্তিক । মধ্যদেশীয় আর্য ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশ অঞ্চলে । আর প্রান্তিক আর্য ভাষার পরিচয় মিলে সিন্ধু, গুজরাট, উরিষ্যা ও বাংলায় । সাধারণভাবে মনে করা হয় মধ্যদেশিক আর্যদের মাথা ছিল লম্বাকৃতির আর অন্যদিকে প্রান্তিক আর্যদের মাথা ছিল গোল । এরা ছিল আলপাইন । প্রথমে প্রান্তিক আর্য ভাষীরা এই উপমহাদেশে এসেছিল । কিন্তু তাদের পরাজিত করে মধ্যদেশীয় আর্যরা তাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরিয়ে দেয় । তাই প্রান্তিক আর্যরা সরে যায় সিন্ধু, গুজরাট ও বাংলার মত প্রান্তিক এলাকায় । এ কারণেই প্রান্তবাসীদের ভাষা আর মাথার আকৃতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় বিশেষ সাদৃশ্য ।

এভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে এই উপমহাদেশের পটভূমিকায় বাংলাদেশের জনগণের নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশে অনেক রেসেরই অবদান রয়েছে । বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সব মানব ধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাদের প্রটো অষ্ট্রালয়েড ও অলাপাইন মানব ধারার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এরপর উল্লেখ করতে হয় মঙ্গলীয় মানব ধারার কথা । মোট কথা, এই উপমহাদেশে বিভিন্ন সময় নানা কারণে যে সব মানগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে তাদেরই সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী । তাই তাদের নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি কোন একক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় ।

সুতরাং আলোচনা শেষে উপসংহারে বাল যায় যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন রেসের আগমণে এ শংকর জাতির সৃষ্টি হয়েছ আর এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে বাংলাদেশর জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তির মূল সুর ।

References :

1. Sir Herbert Risley : The People of India ; Thacker Spink & Co. Calcutta, 1908.

2. Rama Parashad Chanda : The Indo Arayan Races ; Verendra Research Society, Rajshahi, 1916.

3. B.S. Guha : An Out-Line of Racial Ethnology in India ; Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1937.

4. D.N. Majumdar & C. Radhakrishna Ra: Race Elements in Bengal ; Asia Publishing House, Calcutta, 1960.

5. P. Gisbert: Fundamentals of Sociology, Orient Longmans Private Ltd.., Calcutta, 1959, pp.262-284.

6. M.P. Nimkoff (ed) Race and Ethnic Relation; E Houghton Mifflin Company, Boston; 1958, pp 26-27.

৭। শ্রী মীনেন্দ্রনাথ বসু ঃ বাঙ্গালীর পরিচয়, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স লিঃ কলিকাতা, ১৩৫২ বং।

৮। এবনে গোলাম সামাদ ঃ বাঙ্গালীর জন্ম পরিচয়, আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, রাজশাহী, ১৯৭২।

৯। এবনে গোলাম সামাদ ঃ নৃতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

১০। মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান ঃ প্রাগৈতিহাসিক ব্রহ্মপুত্র, সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, ওয়ারী বটেশ্বর, বিচিত্রা, ২২ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ পৃঃ ১৮-২৫।

১১। এ কে এম আমিনুল ইসলাম, এই পৃথিবীর মানুষ, ১ম ও ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পটভূমি

ইয়াসমিন সুলতানা
উপ-পরিচালক, বিপিএটিসি,

১.০ ভূমিকা

১.১ সংস্কৃতি কি - এ সম্পর্কে এখনও বিতর্কের অবসান হয়নি। ধারণা করা হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইংরেজী culture শব্দটির উৎপত্তি। সাধারণ ধারণা যে, সংস্কৃতি শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। বৈদিক যুগে সংস্কৃতি বলতে বোঝাত যজ্ঞ প্রভৃতির প্রস্তুতি। তবে অনেকে এ ধারণা অর্ধ-সত্য বলে মনে করেন। সংস্কৃতি শব্দটি culture অর্থে বাংলা ভাষায় চালু করেন রবীন্দ্রনাথ। এর আগে কিছুকালের জন্য culture অর্থে কৃষ্টি শব্দটি বাংলা ভাষায় চালু হয়ে ছিলো।

২.০ সংস্কৃতির সংজ্ঞা

সংস্কৃতি সম্পর্কে গোপাল হালদার (১৯৮৪) বলেছেন -মানুষ হিসাবে মানুষের আসল পরিচয়ই তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে যেয়ে বদরুদ্দীন উমর (১৯৭৪) সংস্কৃতির পরিধিকে বিভক্ত করেছেন - প্রথমতঃ জীবনে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যা করে অর্থাৎ যা বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ জীবন উপভোগের যাবতীয় পদ্ধতি এবং আয়োজনই এর অন্তর্গত। আনিসুজ্জামান (১৯৭৬) এই পর্যায়টিকে 'মানস- সংস্কৃতি' বলে আখ্যা দিয়েছেন - সাহিত্য-দর্শন, শিল্পে-সংগীতে মানসিক প্রবৃত্তির যে বহিঃ প্রকাশ ঘটে সেটাই বলা যায় মানস- সংস্কৃতি।

বদরুদ্দীন উমরের মতে, কোন একটি লোকের সংস্কৃতি কী, একথা বোঝার জনা তাই প্রয়োজন তার আর্থিক জীবন, ভাষা, শিক্ষা রুচি ইত্যাদি সব কিছুরই সাথে ওয়াকিবহাল হওয়া।

৩.০ জাতীয় সংস্কৃতি

৩.১ জাতীয় সংস্কৃতি কোন একটি উপাদানে জন্ম লাভ করে না। ধর্ম, ভাষা, রাষ্ট্র, দেশ, কাল কোনটিই এককভাবে সংস্কৃতির জনক নয় বা নিয়ামকও নয়। সবকিছুর দানে, প্রভাবে ও মিশ্রণে সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব। কাজেই সংস্কৃতি কখনও অবিমিশ্র হতে পারে না। সৃজনে-গ্রহণে, বরণে-বর্জনে সংস্কৃতি চিরকাল ঋদ্ধ ও দেশকালের উপযোগী হয়েছে (আহমদ শরীফ, ১৯৯১) বাংলা দেশের সংস্কৃতিও তেমনি বহু ভাষা জাতি ধর্মের মিশ্রণে সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

৪.০ সংস্কৃতি ও জাতীয়তা

সংস্কৃতি ও জাতীয়তা শব্দ দু'টো ভিন্নতা বহন করে । তেমনিভাবে জাতিসত্ত্বা ও জাতীয়তা ভিন্ন বিষয় বোঝায় । জাতিসত্ত্বা বলতে বোঝায় নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে আমাদের জাতিগত পরিচয় । অপরদিকে জাতীয়তা বলতে নাগরিকত্বকে বোঝায়। আমাদের জাতীয়তা বহুবার পাল্টেছে , কিন্তু, জাতিসত্ত্বার দিক থেকে আমরা 'বাঙালী'ই রয়ে গেছি । এখানে **'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পটভূমি'** বোঝাতে চিরন্তন বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক পটভূমিকে বোঝাই শ্রেয় হবে ।

৫.০ বাংলাদেশের সংস্কৃতির উৎস ও বৈচিত্র্য

৫.১ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পটভূমি বৈচিত্র্য বহন করে । এই বৈচিত্র্যই বাঙালীর সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করেছে । একসময় দ্রাবিড় ভাষা-ভাষীদের ভারতের আদিম অধিবাসী মনে করা হতো । পরে প্রমানিত হয় আর্যভাষীদের মত দ্রাবিড় ভাষীরাও এদেশে আগন্তুক মাত্র । তাদের আগে প্রাক-দ্রাবিড় (Pre Dravidians) বা আদি বা (Proto Australoid) জাতিসমুহ বাস করতো । বলা হয়ে থাকে তারাই ভারতের আদিম অধিবাসী (ডঃ অতুল সুর,১৯৯৪)। এদেশে মুসলিম বিজয়ের মধ্য দিয়ে তুর্কি, আরব, ইরান ও মধ্য-এশিয়ার সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাব পড়ে এখানকার মানুষের জীবন চর্চায়। পরবর্তীতে পর্তুগীজ, ফরাসী, ডাচ এবং সর্বোপরি ইংরেজদের আগমন এদেশের সাংস্কৃতিক ধারাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে ।

৬.০ বাংলাদেশের আদি সংস্কৃতি

নব্যপ্রস্তর যুগেই প্রথম নাগরিক সভ্যতার শুরু । সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি সে যুগের সুমহান নগর সভ্যতার প্রতীক । বাংলাদেশে এরকমই একটি সভ্যতার নিদর্শন হচ্ছে পান্ডুরাজার ঢিবি (বর্ধমান জেলার অন্তর্গত)। এখানে মানুষ বাস করতে শুরু করেছিলো খ্রীস্ট পুর্ব ২০০০ সাল থেকে এবং তাম্র সভ্যতার জন্ম দিয়েছিলো । বাংলাদেশের মানুষের সে সময় ক্রীটদ্বীপ ও ভূমধ্যসাগরসহ অন্যান্য দেশের সংগে সবচেয়ে বেশী বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিলো। বাণিজ্যিক সম্পর্কের সুত্রধরে সেসব দেশের সংগে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানও বিদ্যমান ছিলো ।

৬.২ অতীতে বাংলা বা বাংগালা নামে কোনো অঞ্চল অভিহিত হয়নি যার ভাষাভিত্তিক কোন ভৌগলিক পরিচয় ছিলো। রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র, পুন্ড্র ও সমতট-হরিকেলের মত কৌম সমাজ ও খন্ড খন্ড জনপদের পরিচয় পাওয়া যায় । (মমতাজুর রহমান, ১৯৯০) কৌমপতি ছিল সর্ববিষয়ের নিয়ন্ত্রক ।

৬.৩ বৈদিক আর্যদের পুর্বে যারা বাস করতো তাদের মধ্যে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোংগলীয় ও নেগ্রিটো প্রধান। তাদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস, সমাজ গঠন ও জীবন যাত্রা প্রণালীতে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পাল বংশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাল রাজাদের হাতে বাংগালী প্রথম রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। পালদের সময় থেকে বাংলার মানুষ একটি সামগ্রিক ঐক্যবোধ তথা স্বজাত্যবোধে উজ্জীবিত হয়।

৬.৪ উল্লেখ্য যে, উত্তর এবং পশ্চিম ভারত থেকে ব্রাহ্মণগণের বাঙলায় আগমনের সাথে সাথে উচচশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে সংস্কৃত চর্চার সাড়া জাগে। সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র হিসাবে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণরাই টোল স্হাপন করেছিলেন তা নয় বরং বৌদ্ধদের বিহারগুলো সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অনুশীলনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলো। বিশেষ করে পাল রাজাদের আনুকূল্যে শুধুমাত্র বৌদ্ধ শাস্ত্র চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো তাই-ই নয়, সেখানে বিদ্যার্থীরা দর্শন, চিকিৎসা, বেদ, ব্যাকরণ, সঙ্গীত চিত্রাঙ্কন, জ্যোতিষ শাস্ত্র, যোগ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতো। চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলো। বাংলাদেশের ময়নামতি, পাহাড়পুর, মহাস্হানগড় ইত্যাদি স্হানে বাঙালীর শিল্প সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে চিহ্ন রয়েছে,তা এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি বিশেষ অংশ।

৬.৫ বলা হয়ে থাকে, সেনদের সময়ে সংস্কৃত-সাহিত্য চর্চার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকলেও সেন রাজাদের সময়ে বাংলার সামাজিক জীবনে একটি মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় তা হচ্ছে দেশভিত্তিক বর্ণবাদী সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার।

৭.০ মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের সংস্কৃতি (মুসলিম আমল)

৭.১ প্রাক্- মুসলিম যুগের পুর্ব-ভারতে কোন অখন্ড আঞ্চলিক সভ্যতার উম্মেষ ঘটেনি। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি পুর্ব-ভারতে একটি স্বাধীন রাষ্টের জম্ম দেবার ক্ষেত্রে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের নামে অবিস্মরনীয়। তিনিই প্রথম লক্ষণাবর্তী, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও- এ তিনটি অঞ্চলকে একত্রিত করে নিজেকে স্বাধীন শাসনকর্তা হিসাবে ঘোষণার মধ্য দিয়েই 'বাঙলা' বা বাঙালা নামের প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং রাঢ়, গৌড়, পৌন্ড্র, সমতট ও হরকেলের মত খন্ড খন্ড জনপদই ইলিয়াসী আমলে 'বাঙালা' আখ্যা পেলো।

৭.২ মুসলমানদের আগমনের ফলে মধ্যযুগে বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতিতে মানবতাবাদের এক নুতন ধারার সুচনা হয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সামন্ত সমাজ ব্যবস্হায় মুসলমান বণিক ও সুফী সাধকদের আগমনের প্রভাব পরিস্হিতির গুনগত দিকের পরিবর্তন সাধন করতে শুরু করে। এরাই

সনাতন ধর্মের অত্যাচার ও বর্ণবাদের বৈষম্যের শিকার জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের সাম্যবাদের বানী শুনিয়ে এক নতুন জীবনবোধের ধারণা সঞ্চারিত করেন । বৌদ্ধ বিপ্লবের সাম্যবাদে বাংলা যেমন উদ্ভাসিত হয়েছিল মুসলমানদের বিজয়ে তা আরও প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে ।

মুসলিম শাসকরা বাংলাভাষা এবং সাহিত্যের অসাধারণ পৃষ্ঠপোষকতা করেন । এ সময় রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ ছাড়াও মঙ্গলকাব্য পদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি হয় । সপ্তাদশ শতকে রোমান্সকাব্য একটি বিশেষ প্রাধ্যান্য পায়। এসময় দেব-দেবীর পর্যায় পার হয়ে বাংলা কাব্য সাধারণ মানুষের আবেগ অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে ।

৮.০ আধুনিককালের সংস্কৃতি (ইংরেজ আমল)

৮.১ ১৬৩২ সালে হুগলী থেকে পর্তুগীজরা বিতাড়িত হবার পরই, তাদের জায়গা দখল করে ইংরেজরা । এদেশে ইংরেজদের আগমন আজও বির্তকের বিষয় হয়ে রয়েছে । এটি সত্য যে একদিকে ইংরেজদের আবির্ভাব এদেশে সমাজ, রাষ্টীয় জীবনে এবং চিন্তা-চেতনায় একটি আধুনিক ধারার উন্মেষ ঘটিয়েছিল তেমনি এরা বাংলার শিল্পসমূহকে ধ্বংস করে পদলেহনকারী একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল ।

৮.২ ইংরেজদের আগমন বাংলার মুসলমানদের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে । নবাবী হারিয়ে মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে দুরে থাকে অন্যদিকে হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে বিভিন্ন নতুন নতুন পেশায় নিয়োজিত হয় ।

৮.৩ ১৭৯৩ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে বাংলায় এক নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং এদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু । এরা 'বাবু কালচারের' জন্ম দেন । সাতশ' বছরের রাজভাষা হিসেবে প্রচলিত ফারসী ভাষার জায়গায় ইংরেজী ভাষা প্রতিষ্ঠা পাবার পর হিন্দু-মুসলমানদের সাংস্কৃতিক বৈষম্য প্রবল রূপ পায়।

৮.৪ ইউরোপীয় সংস্কৃতি ভারতীয়দের পৌরাণিক সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা পরিবর্তন আনতে পারবে এ চিন্তা রেখে রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ সালে হিন্দু সমাজের একাংশকে নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেছিলেন । সেসময় কিছু শিক্ষিত বাঙালী সাংস্কৃতিক জাগরণের সুচনাও করে ছিলেন । ঐ সময়ে মুসলমানরা ওহাবী আন্দোলন ও ফারায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অবকাঠামোকে একটি নতুন রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছে।

৯.০ পাকিস্তান আমলঃ সাংস্কৃতিক আঘাত

৯.১ পাকিস্তানের জন্মলাভের পর থেকেই পাকিস্তানী শাসকরা বাঙালীদের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে পর্যুদস্ত করতে উদ্যোগী হয় । মুলতঃ বাংলাভাষার ওপর আঘাত হেনে সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করাই ছিল পাকিস্তানী শাসকদের মুল উদ্দেশ্য । ভাষা কাজ করে দু'ভাবে - সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক একক হিসেবে (মুনতাসির মামুন, ১৯৮৬)। ভাষা যে রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করে তা দেখা গেছে ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হবার কিছুকাল পরে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের সময় । উর্দুভাষী শাসকরা বাংলা ভাষাকে ইসলামীকরণের দোহাই দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য চাপিয়ে দিতে. চেয়েছিলো । তারা আরবী, রোমান হরফে কিংবা আরবী -ফারসী শব্দগুলি বাংলা লেখার প্রয়াসী হয় । ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত এদেশের মানুষ সহজভাবে মেনে নেয়নি । ১৯৪৭ সালের মধ্যেই একটি সচেতন মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ গড়ে উঠেছিল । বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী প্রথম সাংগঠনিক রুপ পায় ১৯৪৭ সালে তমুদ্দন মজলিস গঠন করার মাধ্যমে । ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক চেতনার রূপ পরিপুষ্ট হয়েছিলো ।

১০.০ বাংলাদেশ ঃ উপসংহার

১০.১ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সুত্র ধরেই পরবর্তীতে স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম । জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে এখনও আমাদের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠিত ধারণা তৈরি হয়নি । কেউ কেউ বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে দেখেন বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি হিসাবে, কেউ বা জাতীয় সংস্কৃতিকে বিবেচনা করেন 'বাঙালী সংস্কৃতি' বা হিন্দু সংস্কৃতি হিসাবে । বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি এদেশের সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আরেকটি পক্ষ সংস্কৃতি নির্মানের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন (রেজোয়ান সিদ্দিকী,১৯৯৬)। এক্ষেত্রে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র বাণী প্রণিধানযোগ্য -''আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী । এটি কোনও আর্দশের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা । মা-প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাংগালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক/টিকিতে কিংবা টুপি-লুংগি-দাঁড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল সম্পাদিত বাংলাদেশঃ বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে, সাগর পাবলিশার্স,১৯৯০

২। বন্দোপাধ্যায় শৈলেশ কুমার, বাংলা ও বাংগালী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০।

৩। মামুন, মুনতাসীর, উনিশ শতকে পুর্ববংগের সমাজ, ডানা পাবলিশার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৮৬

৪। শরীফ, আহমেদ, গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা, আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯১

৫। সিদ্দিকী রেজোয়ান, পুর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ১৯৯৬ বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা।

৬। সুর, অতুল, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৪,

৭। হালদার, গোপাল, বাঙালী সংস্কৃতির রূপ, মুক্তধারা, বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ১৯৭৫।

৮। হান্টার, ডব্লিউ, ডব্লিউ, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্ খোশরোজ কিতাবমহল, ঢাকা ১৯৮২।

৯। রায়, অন্নদা শংকর, সংস্কৃতির বিবর্তন, দি প্যারট প্রেস, কলকাতা ১৯৮৪, ।

১০। রহিম, মুহম্মদ আবদুর, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব

রফিকুল ইসলাম ভূঞা
যুগ্ম সচিব

ভারতীয় উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শক্তির অনুপ্রবেশ

বাংলাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের বুনিয়াদ ও শাসনের সুবিশাল যন্ত্র অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে গড়ে উঠেছিল। সতের শতকের প্রথম দিকেই বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য চরম অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এই যুদ্ধসন্ধিক্ষণে ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন সামন্ত স্বৈরাচারী শাসন প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং আত্মঘাতী যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এহেন সামন্ত সমাজ ও অর্থনীতির চরম ভগ্ন দশায় যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল, তখনই (সতেরো শতকের প্রারম্ভে) ইউরোপে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপক বাণিজ্য বিস্তারে সাফল্য লাভ করে। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠির প্রকৃত পথিকৃত ছিল দুঃসাহসী পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো দ্য গামা, যিনি ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে সীমাহীন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছেন। ১৫১০ খৃঃ পর্তুগীজ গোয়া দখল করেন। পর্যায়ক্রমে দমন, দিউ, পানঝিম, হুগলী দখল করেন। ১৫৯০ থেকে ১৬১৪ খৃঃ পর্যন্ত পর্তুগাল উপমহাদেশের বাণিজ্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলো পরবর্তীতে ওলন্দাজরা (১৬০৪খৃঃ) উপমহাদেশে কারখানা স্থাপন করে। ১৬৪০ সালে মাদ্রাজে এবং ১৬২৫ সালে চুচুঁড়ায় তাদের ঘাঁটি স্থাপিত হয়। এরপর দিনেমারগণ (ডেনমার্কের অধিবাসী) ১৭৫৫ সালে শ্রীরামপুরে কুঠি স্থাপন করে।

উপমহাদেশে বাণিজ্য সন্ধানে আগতদের পরের দলে হচ্ছে ইংরেজ। ১৬৬৭ সালে উপমহাদেশে ফরাসী বাণিজ্য পোতের আবির্ভাব হয়। ১৬৬৮ সাল থেকে একে একে সুরাট, পন্ডিচেরী, মাহে, ক্যারিকল ও চন্দন নগরে কুঠি স্থাপতি হয়। ঘটনা পরম্পরা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 'ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' গঠন করে উপমহাদেশে বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংরেজ হচ্ছে বিলম্বিত অভিযাত্রী।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয় ও বাংলাদেশে ক্ষমতা লাভ

ব্রিটিশ বাণিজ্য পুঁজির প্রতিভূ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সুদীর্ঘ ২৫০ বছর ধরে পরিব্যপ্ত মহারানী ১ম এলিজাবেথের আমলে ১৬০০ খৃঃ থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়ার শাসন আমলে ১৮৫৮ এর ঘোষণা পর্যন্ত এর কার্যকাল। প্রাথমিক পর্যায়ে বাণিজ্য সুবিধা নিয়ে জোর লড়াই হয়েছে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে এবং শেষের দিকে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে। সতের দশক ছিল মুলতঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অপ্রতিহত বাণিজ্য সম্প্রসারণের যুগ। উপমহাদেশের সুরাট (১৬১২) মাদ্রাজে সেন্ট জর্জ কোর্ট (১৬১৯)

, (১৬৩৯) এবং ফোর্ট ইউলিয়াম (বাংলাদেশে) ১৮৯৬ কোম্পানীর বাণিজ্যিক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী বাণিজ্য সম্প্রসারণ করে কোম্পানী ১৮ শতকের গোড়ার দিকে এক প্রবল অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৯৮ সালে কোম্পানী মোঘল বাদশা আওরঙ্গজেবের অনুমতিক্রমে বাংলাদেশের সুতালটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম কিনে নিয়েছিল - পত্তন বা ইজারা নয়, রীতিমত জমির মালিক। ১৭১৫ সালে কোম্পানী কলিকাতার সন্নিকটবর্তী অতিরিক্ত ২৮টি জনপদ কিনে নিতে সক্ষম হয়। ক্রমাগতভাবে জন-গুরুত্বপুর্ণ স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ তৈরী করে কোম্পানী নিজেদের ক্ষমতা সুসংহত করে। অবশেষে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে প্রহসনমূলক যুদ্ধে জয়লাভ করে কোম্পানী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এবং পর্যায়ক্রমে উপমহাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্প্রসারণের মজবুত বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করে।

> ''বণিকের মানদন্ড দেখা দিল
> রাজদন্ডরূপে পোহালে শর্বরী'' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিদেশী বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডরূপে দেখা দেয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছিলেন ঃ 'বঙ্গ তারে আপনার গংগোদকে পরিশুদ্ধ করি, নিল চুপে চুপে '- তখন মনে হয় কবি কল্পনা যথাযথ হয়নি - কারণ ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার কাহিনীতে এত কলংক, এত অনাচার, এমন অমানুষিকতা আছে যে তাকে 'পরিশুদ্ধ করা গংগোদকের পক্ষে সম্ভব নয়'।

কোম্পানীর আমলে নির্লজ্জ লুন্ঠন

১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সালের মধ্যে বাংলার মসনদ পাবার লোভে মীরজাফর ও মীরকাশেমকে কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীদের ৫০ লাখ পাউন্ড অর্থ দিতে হয়েছিল কোম্পানীর কর্মচারীরা দেশে ফিরে অবৈধ অর্থে খুদে নবাব সেজে বসতো।

১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে এদেশ থেকে বিলাতে তিন কোটি আশি লক্ষ পাউন্ড চালান করা হয়েছিল। এর অর্থ হলো বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৬০ কোটি টাকা শুষে নেয়া হয়েছিল যার দাম ১৯০০ সালের হিসেবে ৩০০ কোটি টাকা এবং আজকের হিসেবে গড়ে ১৫০০ কোটি টাকারও বেশী হয়।

এদেশের ঐশ্বর্য্য

একথা সর্বজনবিদিত যে ইংরেজা এদেশ দখল করার সময়ে দেশের ঐশ্বর্যের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্ণিয়ারা,মানুচি, ট্যাবর্নিয়ের প্রভৃতি পর্যটক এদেশের সমৃদ্ধির বিবরণ দিয়ে গেছেন (সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে)। মুর্শিদাবাদের ঐশ্বর্য দেখে লর্ড

ক্লাইভ বলেছিলেন , ' এই শহর লন্ডনের মতই বৃহৎ, জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধ, তফাৎ শুধু এই যে এখানে এমন সব ধনী ব্যক্তি আছেন যাদের তুলনা লন্ডনে নেই '।

বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বৃটিশ শাসনের প্রভাব

অশুভ প্রভাব ঃ একচেটিয়া বাণিজ্য ও এদেশের আর্থিক সম্পদের উপর পুর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে কোম্পানী অতিদ্রুত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার শুরু করে দেয় । কোম্পানী পলাশী যুদ্ধের তিন বছরের মধ্যে বাংলা ও দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে । একই সংগে কোম্পানী এদেশের স্থানীয় সামন্ত-শাসক, অভিজাত, ধনী ও পুরানো জমিদারদের সঞ্চিত বিপুল অর্থ ও ধন-ভান্ডার হস্তগত করে ।

এদেশ থেকে কোম্পানী বিপুল অর্থ লুন্ঠন করার ফলে ব্রিটেনে পুঁজির ভান্ডার যথেষ্ট বেড়ে যায় । এতে সেদেশের অর্থনীতিতে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয় । ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব ঘটানোর জন্য যে মুলধন সঞ্চয় একান্ত আবশ্যক হয়েছিল তার প্রধান উৎস ছিল উপমহাদেশের লুন্ঠিত সম্পদ । শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনে কলকারখানার অভাবনীয় সম্প্রসারণ ঘটে । অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছন যে, সে সময়কার ব্রিটেনের জাতীয় আয়ের বিপুল অংশ উপমহাদেশ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে আসে ।

ক) পলাশীর যুদ্ধের পর ভারত বর্ষ থেকে কি পরিমাণ সম্পদ ব্রিটেনে পাচার করা হয়েছিল তা অনুমান করা কঠিন উল্লেখ করে ডব্লিউ ডিগবি বলেনঃ 'এ সম্পদের পরিমাণ ৫০০,০০০,০০ পাউন্ড থেকে ১,০০০,০০০,০০০ পাউন্ডের মধ্যে ছিল বলে ধারণা করা যায় । পলাশী ও ওয়াটার লু এর মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষ হতে ইংরেজদের ব্যাংকে জমাকৃত সম্পদের পরিমাণ সম্ভবত শেষোক্ত পরিমাণ অর্থাৎ একশত কোটি পাউন্ডে দাঁড়িয়েছিল ।

খ) **ক্রিষ্টোফার হিলের মতে ঃ**''শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির সংস্থান কিভাবে হলো ? ইংল্যান্ডে অধিকাংশ পুঁজির সমাগম হযছিল ভিনদেশ থেকে, এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দাস ব্যবসা এবং বিশেষভাবে যে উৎসটির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত বর্ষ থেকে পরিকলপিত উপায়ে লুন্ঠিত ধনরাজি ।''

গ) কার্ল কার্মস এর উদ্ধৃতি দিয়ে আন্দ্রেঁ গান্ডার ফ্রাংক বলেন ,'ইউরোপ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে পুঁজির সমাবেশ হয়েছিল বাংলাদেশ ও ল্যাটিন আমেরিকার প্রধান প্রধান অঞ্চল হতে ব্যাপক সম্পদ লুন্ঠনের মাধ্যমে ।'

ঘ) একই সত্য ব্রুকস এডামস এভাবে উপস্থাপন করেন,"ইংরেজ কর্তৃক বাংলাদেশে যে দস্যুবৃত্তি পরিচালিত হয় - তারই ফলশ্রুতিতে ইংল্যান্ডে নজীরবিহীন পুঁজির পাহাড় গড়ে তোলে-- যা শিল্প বিপ্লবকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।"

অন্যদিকে ল্পি পুজিঁর স্বার্থে উপনিবেশগুলিকে কাঁচামাল যোগানের দেশে এবং ব্রিটিশ পণ্যের খোলা বাজারে পরিণত করা হয়।

এদেশের বাণিজ্য ও উৎপাদন ব্যবস্থায় একচেটিয়া প্রাধান্য লাভ করে কোম্পানী সুপরিকল্পিত ভাবে বাংলার ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের ধ্বংস করার নীতি গ্রহণ করে। ঢাকার জগৎ বিখ্যাত মুসলিন কাপড়' প্রায় দুই শতাব্দী ধরে সারা ইউরোপের বাজার দখল করে ছিল। কিন্তু কোম্পানীর দুঃশাসনের ফলে এদেশের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। ১৭৯৯ সালে যেখানে বস্ত্র রপ্তানী ছিল ১২ লাখ টাকা, ১৮১৩ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় সাড়ে তিন লাখ টাকায়। ১৮১৭ সালে ঢাকার মসলিন প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি এসে পড়ে।

এদেশের বস্ত্রশিল্প ইউরোপ ছাড়াও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বাজার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু ১৮৪৪ সাল থেকে ইংল্যান্ড থেকে পাকানো সুতা আমদানীর ফলে বস্ত্রশিল্প ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে. এগিয়ে যায়। তাঁতীরা জীবিকার্জ্জনের উপায় হারায়। ১৮১৮ সাল থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে ব্রিটেন থেকে এদেশে সুতা রপ্তানীর পরিমাণ পাঁচ হাজার গুণ বেড়ে যায়। ১৮৫০ সালের দিকে এদেশ থেকে রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে নীল একটি প্রধান দ্রব্য হয়ে ওঠে। নীলকর সাহেবেরা এদেশের দরিদ্র নীলচাষীদের উপর যে বর্বর অত্যাচার চালিয়েছিল তা অত্যন্ত লোমহর্ষক। জনৈক শ্বেতকায় ম্যাজিষ্ট্রেট একজন মিশনারীকে বলেছিলেন যে, ' এক বাক্স নীল রং কোন সময়েই নীলচাষীর লাল রক্তে রঞ্জিত না হয়ে বিলেতে পৌছাত না।' বিলেতী রক্ত যাদের মধ্যে রয়েছে সে সব নীলকর সাহেবেরা আদালতে দন্ডিত হবেন সেটা ভাবাও যেতোনা।

বিদেশে ইংরেজদের এহেন ঘৃণ্য কার্যকালাপের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রখ্যাত উপন্যাসিক যাযাবর দুঃখ করে বলেছিলেন 'বিদেশে ইংরেজদের দেখলে আর ডারউইন তত্ত্বে সন্দেহ থাকেনা'।

১৮৫৯-৬০ সালে নীলচাষীদের চাপা অসন্তোষ প্রকাশ্য বিদ্রোহে রূপ নিয়েছিল। যশোর নদীয়া, পাবনা প্রভৃতি জেলায় - যেখানে নীল চাষ বেশী হতো সেখানে বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমনকি চাষীরা নীলকুঠি, স্থানীয় সরকারী অফিস, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী প্রভৃতিতে সশস্ত্র আক্রমন চালায়। বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবিরা নীল বিদ্রোহের সমর্থনে সরব হয়ে ওঠেন। দীনবন্ধু মিত্রের নীল দপর্ণ নাটক ও পাদরী লং (প্রকৃত পক্ষে কবি মাইকেল মধুসুধন) কর্তৃক এ নাটকের ইংরেজী অনুবাদ বাংলাদেশে

ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । ১৯৬০ সালে 'ইন্ডিগে কমিশন ' গঠন করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায় ।

অনুরূপ ভাবে রেশম ও বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ তাঁতীদের উপরও নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালানো হয় । কথিত আছে যে, কোম্পাীর কাজ যাতে না করতে হয় সে জন্য অনেক তাঁতী ক্ষোভে-দুঃখে নিজেদের বুড়ো আংগুল কেটে ফেলে ।

১৭২০ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে আইন করে বলা হয় যে, উপমহাদেশ থেকে আমদানীকৃত সুতী বা রেশমী বস্ত্র বিলাতে কেউ ব্যবহার করতে পারবে না । যার ফলশ্রুতিতে যে উপমহাদেশ একদা ইউরোপসহ পৃথিবীর বহুদেশে সুতী কাপড় রপ্তনী করতো - সে -ই বৃটেনের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হলো ।

ইংরেজদের সংকোচন নীতির ফলে রেশমী ও পশমী কাপড়, লোহা, কাঁচ ,কাগজ, চীনামাটির বাসন সবদিক দিয়েই এদেশের শিল্পের সর্বনাশ ঘটতে লাগলো । - তাঁতী , কর্মকার করে হাহাকার - এটাই ছিল সেদিনের সঠিক বর্ণনা ।

কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহগুলির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেন নবাব মীর কাশিম । প্রবল বীরত্বের সাথে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত হন (১৭৬৪ সালের বক্সার যুদ্ধে) । ১৭৬০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত ৪০ বছর ইংরেজদের বিরুদ্ধে বহু বিদ্রোহই সংঘটিত হয় ।

ক) ১৭৬১ সালে কোম্পানীর নিয়োজিত ইজারাদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে । পরবর্তীতে ইজারাদারি ব্যবস্থা রহিত হয় ।

খ) ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ১৭৯৯ সালে মেদিনীপুরে কৃষক , পাইক, সর্দার ও জমিদারদের সম্মিলিত বিদ্রোহ ঘটে । পরবর্তীতে বাঁকুড়া , বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ।

গ) ১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরে উত্তর বংগে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ চলেছিল । ইংরেজ ঐতিহাসিকগন সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে বেপরোয়া দস্যুবৃত্তি বললেও এর পক্ষে কোন ঐতিহাসিক স্বাক্ষ্য পাওয়া যায় না । কারণ দীর্ঘ চার দশক ধরে বেশ জনসমর্থন নিয়েই এই সংগ্রাম চলেছিল ।

ঘ) ১৮৫৫ সালের সাওঁতাল বিদ্রোহ ঃ এটি প্রধানতঃ ছিল কৃষক বিদ্রোহ। বিদ্রোহীরা এমন এক স্বাধীন রাজ্যের কল্পনা করেছিল যেখানে কাউকে ভূমির খাজনা দিতে হবে না। প্রায় ৩০,০০০ বিদ্রোহী এতে যোগ দেয়। ১৮৪৬ সালে অত্যন্ত নিমর্ম ভাবে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশের বহুস্থানে স্বাধীনতা সংগ্রাম - যেমন চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন (মাষ্টার দা সুর্যসেন কর্তৃক), পশ্চিম বাংলায় ক্ষুদিরাম বসু, বাঘা যতীন, ওয়াহাবী আন্দোলন, ফারায়জী আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

ঙ) ১৮৫৭ সালের মহা অভ্যুত্থান

১৮৫৭ কালপর্বের সালে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সিপাহীদের মহা অভ্যুত্থান উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও বিস্মৃতি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, ব্যাপক জনসমর্থনই ছিল এই মহাবিদ্রোহের ভিত্তিভূমি। এ প্রসংগে কার্ল মার্কস এর মুল্যায়ন বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন যে, বৃটিশ শাসক যেটাকে সাময়িক বিদ্রোহ বলে ভাবছে সেটা আসলে একটা জাতীয় বিদ্রোহ।

১৮৫৭-৫৯ কালপর্বে সিপাহী বিদ্রোহ উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সুদুর প্রসারী ফলাফল এনেছিল। জওয়াহেরলাল নেহেরু তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন যে এই বিদ্রোহ সারা ভারতে বৃটিশ প্রশাসনকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। মহা বিদ্রোহের পরেই বৃটিশ সরকার ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে।

বৃটিশ শাসনে দুর্ভিক্ষের প্রাবল্য

১৮৩৭, ১৮৫৭, ১৮৭৭, ১৮৯৭-- দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত সালগুলো উপমহাদেশের আধুনিক ইতিহাসে মর্মন্তদ ঘটনার সাক্ষ্যবহ - উন্নতি ও সমৃদ্ধি সেখানে অপরিচিত- আছে হাহাকার, সীমাহীন দারিদ্র আর বিপর্যয়ের চিহ্ন। এসব দুর্ভিক্ষে উপমহাদেশের কয়েক কোটি মানুষ মারা যায়।

বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বৃটিশ শাসনের শুভ প্রভাব

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকারের মতে 'পলাশী যুদ্ধের পর অর্থাৎ ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন তারিখে উপমহাদেশে মধ্যযুগ শেষ হয়ে আধুনিক যুগের পত্তন হয়েছিল। তিনি উচ্ছাসিত হয়ে আরও বলেছিলেন যে, ১৭৫৫ - ১৭৭৬ সালের মধ্যে বিশ বছরেরও কম সময়ে দেশ ধর্মভিত্তিক শাসনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে আরম্ভ করেছিল। পশ্চিম থেকে নতুন ভাব ধারার সঞ্জীবনী স্পর্শে যেন শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, মানুষের কাজ এবং রাজনৈতিক জীবন সর্বত্র আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো। স্বর্গ থেকে প্রেরিত এক যাদুকর এসে যে তার দন্ড ছুঁয়ে প্রাচ্য দেশীয় স্থানু সমাজের শুষ্ক কঙ্কালগুলিকে

জীবন্ত করে তুলছে (বাংলার ইতিহাস) । অবশ্য জনাব সরকারের এহেন উচ্ছাস নিয়ে বির্তকের সৃষ্টি হয়েছিল।

ক) লর্ড হেষ্টিংসের আমলে শাসন সংস্কার

(১৭৭২-১৭৭৪ গর্ভণর এবং ১৭৭৪-১৭৮৫ গর্ভণর জেনারেল) যদিও বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগে হেষ্টিংসের বিচার (ইমপিচমেন্ট) হয়েছিল , তথাপি তিনি যে একজন প্রতিভাবান শাসক ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায় । ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁকে মহামতি আকবরের সংগে তুলনা করেছিলেন ।

ক্লাইভের আমলের দ্বৈত শসন ব্যবস্থার ফলে যে অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাকে দুর করে তিনি রাজস্ব ও দেওয়ানী আদালত সুষ্ঠুভিত্তিক করেন । কোম্পানীর আমলের সুপারভাইজার এর পদ কে কালেক্টর পদে উন্নীত করা হয় । তিনি মৌলভী ও হিন্দু পন্ডিতদের কাছ থেকে মুসলিম ও হিন্দু আইনের ব্যাখ্যা সংগ্রহ করেন । এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করেন ।

১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাশ হয় । এতে কোম্পানীর উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় । কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম একজন প্রধান বিচারপতি (স্যার ইলাইজা ইম্পে) ও তিন জন বিচারপতি নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় । হিন্দু আইন ও আইন-ই আকবরীর ইংরেজী অনুবাদ , কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি লর্ড হেষ্টিংসের অমুল্য অবদান ।

খ) লর্ড কর্ণওয়ালিশ (১৭৮৬-৯৩) এর অবদান

লর্ড কর্ণওয়ালিশের সংস্কার সমুহ উপমহাদেশের সমাজ জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে । তিনি নিম্নলিখিত সংস্কার আনয়ন করেন ঃ দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা সুস্হ করণ, পুলিশ ব্যবস্থায় গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন, থানার শাসনকর্তা হিসেবে দারোগা নিয়োগ, পুলিশ সুপার নিয়োগ, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের গোড়া পত্তন, কর্মচারীদের সততা, নিয়মানুবর্তিতা ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কিত ‘কোড’ প্রবর্তন । সর্বোপরি ১৭৯৩ সালের রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ।

গ) লর্ড ওয়েলেসলির কৃতিত্ব (১৭৯৮-১৮০৫)

তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিরাট সুবিস্তৃত ও পরস্পর সংলগ্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ।

ঘ) **লর্ড মিন্টো (২৮০৭-১৮১৩)**

তিনি মোটামুটি মধ্যমপন্থি শাসক ছিলেন। অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা রক্ষার বিধান করেন। এবং উদীয়মান শিখ শক্তির সাথে সৌহার্দ্যপুর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় অর্থ সাহায্য করেন। তাছাড়া বেসামরিক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

ঙ) **লর্ড আমহার্স্টের অবদান (১৮২৩-২৮)**

আসাম, জৈন্তিয়া, কাছাড় ও মনিপুর পরোক্ষভাবে ইংরেজ অধিকারভুক্ত হয়। এবং ব্রহ্মদেশের সাথে সন্ধি হয়।

চ) **লর্ড বেন্টিংক এর সংস্কার (১৮২৮-৩৫)**

বিভাগীয় কমিশনার পদ প্রবর্তন। তাঁর সময় ভারতীয়দের দেওয়ানী মামলা বিচার করার অধিকার দেওয়া হয়। সতীদাহ নিবারণ ও ঠগী দমন তাঁর প্রসিদ্ধ কীর্তি। এছাড়া পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা, কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন প্রভৃতি তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করে।

ছ) **লর্ড অকল্যান্ড (১৮৩৬-৪২)**

তিনি শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, কৃষিকার্য, সেচ পরিকল্পনায় সংস্কার সাধন করেন।

জ) **লর্ড এলেনবরো (১৮৪২-৪৪)**

দাসপ্রথা লোপ, পুলিশি ব্যবস্থায় উন্নতি, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রর্বতন করেন।

ঝ) **লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৬)**

ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টারের মতে, শাসন ও অন্যান্য বিভাগে এমন কোন ক্ষেত্র ছিলনা যেখানে ডালহৌসী ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে যাননি।

অন্যতম সংস্কার সমূহ ঃ কারা ব্যবস্থার উন্নতি, ডাক, তার ও রেলপথ প্রতিষ্ঠা, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন, তুলা ও পাট চাষে উৎসাহ প্রদান, বনজ সম্পদের উন্নয়ন, ব্যাপক পুর্ত কর্মসুচি, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি নৌপথ সংস্কার, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি।

বৃটিশ ভাইসরয়দের শাসন

ক) লর্ড ক্যানিং ১ম ভাইসরয়

তিনি দয়ার্দ্র ক্যানিং হিসেবে খ্যাত ছিলেন । এছাড়া তিনি অনেক সংস্কারের সাথেও নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন । ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ পরবর্তী পরিস্থিতি তিনি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে মোকাবেলা করেন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিলোপ সাধন হয় । এ সময় ভারত সচিবদের পদ সৃষ্টি হয় । ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর মহাবিদ্রোহের সমাপ্তির পর ভারতে ইংলেন্ডের রানীর সরাসরি শাসনে প্রবর্তিত হয়; এ সময় হাইকোর্ট সমুহ স্থাপিত হয় ।

খ) লর্ড এলগিন ঃ ভইসরয় (১৮৬২-৬৩)

তাঁর সংক্ষিপ্ত সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সীমা নির্ধারণ এবং ভূটানে অভিযান ।

গ) স্যার জন লরেন্স (১৮৬৪-৬৯)

এ সময় আফগানিস্থান ও ভুটানে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকে ।

ঘ) লর্ড মেয়োঃ ভাইসরয় (১৮৬৯-৭২)

এ সময় আফগান্সিহানের সাথে সখ্যতা স্হাপিত হয় । তিনি অনেক গুরুতুপুর্ণ প্রশাসনিক ও আইনের সংস্কার করেন । আন্দামান ও নিকাবর দ্বীপের রাজধানী পোর্ট ব্রেয়ারে আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন ।

ঙ) লর্ড নথব্রুকঃ ভাইসরয় (১৮৭২-৭৬)

এ সময় কিছু কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধিত হয় । সুয়েজখাল উদ্বোধন হওয়াতে উপমহাদেশে ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি হয় । তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতের দুর্ভিক্ষের আশংকা দুরীভূত হয় ।

চ) লর্ড লিটন ঃ ভাইসরয় (১৮৭৬-৮০)

এ সময়ে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার অভিষেক হয় দিল্লীতে । লর্ড লিটন অত্যন্ত সুবক্তা এবং আইনকানুনের বিপুল সংস্কার করেন । এ সময়ে দুর্ভিক্ষে প্রায় ৫০ লাখ লোক মারা যায় । 'ফ্যামিন কোড' চালু হয় । তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে মনোনয়ন প্রথা চালু করেন । ১৮৭৮ সালের প্রেস এ্যাক্ট চালু হয় ।

ছ) লর্ড রীপন ঃ ভাইসরয় (১৮৮০- ১৮৮৪)

অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন । তিনি লবন শুল্ক হ্রাস, প্রেস এ্যাক্ট বাতিল এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখেন । ফ্যাক্টরী আইনের সুচনা হয় এ সময়ে । লর্ড রিপন বন্ধু বলে খ্যাত ছিলেন । তিনি এ দেশে আদমশুমারির ব্যবস্থা করেন । রিপন একবার বলেন 'আমাদের এত জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে যদি আমরা প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মৃত্যু নিবারণ না করতে পারি তবে আমরা কেমন করে বলি যে ইংরেজ শাসন ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত '। এ সময় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রসার এবং ফৌজদারী আইন বিধির পরিবর্তন হয় ।

১৮৮৪-৮৮ লর্ড ডাকারন এবং ১৮৮৮-১৮৯৪ লর্ড ল্যান্সডাউন ভাইসরয় পদে আসীন ছিলেন । এ সময়ে কিছু কিছু শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন হয় ।

জ) ১৮৯৪-১৮৯৯

লর্ড এলগিনের শাসনামলে অনেক গুরুত্বপুর্ণ অর্থনৈতিক সংস্কার সাধিত হয় ।

ঝ) লর্ড কার্জন ঃ ভাইসরয় (১৯০০-১৯০৯)

বিদ্যায়, বাগ্মিতায় ও অদম্য সাহসের জন্য বিখ্যাত ছিলেন । তাঁর সময়ে ১৯০৬ সালে বঙ্গ ভঙ্গ আইন পাশ হয় । কৃষকদের অবস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজস্ব নীতি প্রণীত হয় । শিক্ষার প্রসারে তিনি মুল্যবান অবদান রাখেন ।

গ্রন্থপঞ্জী

১। জাগরণ ও বিস্ফোরণ- কালিচরণ ঘোষ ।

২। ভারতবর্ষের ইতিহাস- হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।(পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)

৩। বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান - আজিজুর রহমান মল্লিক ।

৪। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ - সারল চট্টোপাধ্যায় ।

৫। বাংলার ইতিহাস - যদুনাথ সরকার ।

6. Mian Currents of Indian History- R.C. Majumder & P.N. Chopra.

7. The State Industrialization and Formation in India-- Dr. Anupama Sen.

8. History of India - Sharfuddin Ahmed (Ed.) (Asiatic Society of Bangladesh).

9. Dhaka- A Study in Urban History and Development- Sharfuddin Ahmed, Centre of South Asian Studies, University of London.

10. The Oxford History of India - Vincent A. Smith.

11. The Indian Musalmans- W.W. Hunter.

12. The Future Results of British Rule in India- Karl Marx.

13. Advance History of India- R.C. Majumder.

14. On Colonialism- Karl Marx.

15. India Wins Freedom- Maulana Abul Kalam Azad.

16. The Last Days of the British Raj- Leonard Mosley.

বাংলাদেশের জাতিসত্তার সন্ধান

মোশাররাফ হোসাইন ভুইঞা
উপ-পরিচালক, বিপিএটিসি

১.০ **ভূমিকা**

১.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে ,

"আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি ।"

১.২ প্রস্তাবনায় আরও বলা হয়েছে ,'আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা - যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে ।'

১.৩ সংবিধান দেশের জনগণের আকাঙ্খার প্রতিফলন এবং রাষ্ট্রপরিচালনার সর্বোচ্চ আইন । এটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের সামষ্টিক পরিস্থিতির আইনগত ভিত্তি । কিন্তু আইনের পেছনেও রয়েছে ইতিহাস- যে ইতিহাস বাংলাদেশের জনগণকে স্বতন্ত্র জাতিসত্তায় বিকশিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে । আইনগত অর্থে এ জাতির জন্ম ১৯৭১ সনে হলেও বাংলাদেশের জাতিসত্তার মূল অনেক গভীরে প্রোথিত । বলা যায়, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে আমাদের জাতিসত্তা পরিণতি লাভ করেছে ।

২.০ **জাতিসত্তার ধারণা**

২.১ বাংলা ভাষায় 'জাতি' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় । বক্ষ্যমাণ আলোচনায় এটি ইংরেজী 'Nation' শব্দটির সমার্থক । অপরদিকে 'সত্তা' মানে বলা হয় অস্তিত্ব , বিদ্যমানতা, নিত্যতা ইত্যাদি । সুতরাং 'জাতিসত্তা' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'nation' বা জাতি হিসেবে অস্তিত্ব । জাতি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের অস্তিত্বের উৎস অনুসন্ধানই এ আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ।

২.২ জাতি হিসেবে আমাদের সত্তা, কিংবা সাধারণভাবে মানুষের জাতিগত বিন্যাস অনেক পুরনো হলেও জাতি, জাতিসত্তা, জাতীয়তা, জাতীয়তাবোধ, জাতীয়তাবাদ- প্রভৃতি ধারণা অবশ্যই বর্তমান যুগের । প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ইউরোপে প্রথম এ ধারণা বিকশিত হয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে

বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির স্বকীয়তাবোধ জোরদার হয়। সেই সঙ্গে এশিয়া , আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হতে থাকে । এ সময় নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর জনসাধারণের মধ্যে সুগভীর জাতীয়তাবোধ লক্ষ্য করা যায় । এ সকল দেশের মুক্তি - সংগ্রামে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত হন । প্রকৃতপক্ষে জাতিগত চেতনা এসব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মুল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে ।

২.৩ জাতিসত্তা, জাতীয়তাবোধ, জাতীয়তাবাদ, এগুলো মুলত মরমী প্রপঞ্চ । এর সঙ্গে মানুষের অনুভূতির প্রশ্ন জড়িত থাকে । মানুষের পরিচিতির বিভিন্ন মাত্রা (dimension) থাকে; এটি ব্যক্তির বেলায় যেমন প্রযোজ্য , তেমনি প্রযোজ্য সমষ্টির ক্ষেত্রে । জাতিগত পরিচয়ের ক্ষেত্রেও এ বহুমাত্রিকতার প্রশ্নটি পরিহার করা দুষ্কর । এ প্রসঙ্গে খুশবন্ত সিং- এর খ্যাতনামা রচনা Why I Am An Indian হতে উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে ।

"Are you an Indian first and a Punjabi or Sikh Second ? Or is it the other way round ? I don't like the way these questions are framed and if I am denied my Punjabiness or my community tradition, I would refuse to call myself Indian. I am Indian, Punjabi and Sikh."

২.৪ এ বহুমাত্রিকতা সত্ত্বেও জাতিগত পরিচিতির একটি মৌলিক উপাদান থাকে , যা একটি জনগোষ্ঠিকে এক সুত্রে গ্রন্থিত করে । সে মৌলিক উপাদান হতেই সৃষ্ট হয় জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবোধ - যা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মুল প্রেরণা । এ মৌলিক উপাদানও বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন হতে পারে- কিন্তু এর সুদুরপ্রসারী প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই ।

২.৫ Hans Kohn তাঁর Nationalism: Its meaning and History গ্রন্থে লিখেছেন, "Nationalism is a state of mind, in which supreme loyalty of the individual is felt to be due to the nation-state." বর্তমান যুগে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে nation-state এর ভিত্তিতে যে জাতিসত্ত্বা গড়ে উঠেছে, সেখানে আনুগত্যের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপুর্ণ । এ আনুগত্য অবশ্যই স্বতস্ফূর্ত এবং অনেকগুলো ব্যাষ্টিক অনুভূতি ও আনুগত্যের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে একটি জাতিগত পরিচিতি ।

২.৬ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে জাতিসত্তার বিভিন্ন উপাদান লক্ষ্য করা যায় । যেমন, নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ভৌগলিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি । একটি দেশের সকল মানুষের মধ্যে এ সবগুলো উপাদান বিদ্যমান থাকবে- এটি অকল্পনীয় । প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক উপাদানের অভিন্নতা কিংবা প্রাধান্য একটি জাতির বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে ।

৩.০ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

৩.১ উর্পযুক্ত উপাদানসমুহের আলোকে যদি বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানই বেশী কাজ করেছে। তার আগে ১৯৪৭ সনে ভারত-বিভাগ তথা পাকিস্তান-রাষ্ট্রের জন্মের পেছনে সক্রিয় ছিল ধর্মীয় অনুভুতি। তারও আগে অবিভক্ত ভারতে জাতিসত্তা বিকাশের পশ্চাতে ভাষাগত কিংবা ধর্মীয় চেতনা কোনটিই মৌলিক উপাদান ছিল না। ভারতে আগেও অনেক ভাষা ও ধর্মের লোক বসবাস করেছে এবং এখনো করছে।

৩.২ জাতি হিসেবে বাঙ্গালীর ইতিহাস অনেক পুরনো। বাংলা ভাষার ইতিহাসও অনেক দিনের। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। এ অভ্যুদ্বয়ের ক্ষেত্রে ভাষাগত চেতনা প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এ প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই এদেশের মানুষ সচেতন হয়েছে নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে। ভাবতে প্রণোদিত হয়েছে জাতিসত্তার অন্যান্য উপাদান সম্পর্কে।

৪.০ প্রচীন বাংলার মানচিত্র

৪.১ বর্তমানে যারা বাংলাদেশের অধিবাসী বলে পরিচিত, তারা সবাই অভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোক নয়, একথা প্রায় সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে এ জাতি গঠিত হয়েছে। দুর অতীতে এ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল কোমবদ্ধ এবং শত শত বছর যাবৎ তারা কোম জীবনেই অভ্যস্ত ছিল। প্রতিটি কোম আলাদা আলাদা জায়গা নিয়ে মোটামুটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পুর্ণ জীবন যাপন করত, অন্যান্য কোমের সঙ্গে যোগাযোগ বড় একটা ছিল না। এ পর্যায়ে বৃহত্তর জনচেতনা ও সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল সীমিত। পরবর্তী কালে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ফলে বিভিন্ন কোমের মধ্যে যোগাযোগ, সংঘাত ও আদান-প্রদান শুরু হয় এবং কালক্রমে বৃহত্তর অঞ্চলগুলোকে ভিত্তি করে বিভিন্ন কোমের সমবায়ে কতগুলি বৃহত্তর কোমের উৎপত্তি ঘটে। বঙ্গ, পন্ড্র, রাঢ়, গৌড় প্রভৃতি জনপদের উৎপত্তি এই প্রক্রিয়ারই ফল।

৪.২ বঙ্গ খুব প্রচীন দেশ। মহাভারতেও বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন পুথিঁতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গ বলতে সাধারণভাবে বর্তমান বিহার এবং কলিঙ্গ বলতে বর্তমান উড়িষ্যাকে বোঝাত। বঙ্গ ছাড়াও সে যুগে এ অঞ্চলে যে সকল জনপদের অস্তিত্ব ছিল, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে পুন্ড্র, রাঢ়, সুহম, সমতট ও হরিকেল। মোটামুটিভাবে বর্তমান ঢাকা বিভাগ ও বৃহত্তর বরিশাল (তৎকালীন নাম চন্দ্রদ্বীপ) অধিকাংশ সময়ে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ জনপদের সীমা কখনও কখনও পুর্বে ও পশ্চিমে আরও বিস্তৃত হয়েছে। মোটামোটি ভাবে বর্তমান রাজশাহী বিভাগ তথা উত্তর বঙ্গ নিয়ে তৎকালীন পুন্ড্র

জনপদ গঠিত ছিল। গুপ্ত যুগে এটি 'পুন্ড্রবর্ধন' নামে গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি ভুক্তিতে পরিণত হয়। তদানীন্তন পুন্ড্রের রাজধানী ছিল বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান। পুন্ড্রবর্ধনের মুল ভূখন্ড এক সময়ে 'বরেন্দ্র' নামে অভিহিত ছিল।

৪.৩ বৃহৎসংহতি ও পুরনো পুথিঁপত্রে 'উপবঙ্গ' নামে একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এক সময় উপবঙ্গ বলতে বর্তমান বৃহত্তর যশোর জেলা ও তার আশে পাশের এলাকাকে বোঝানো হত। 'প্রবঙ্গ' নামে একটি জনপদেরও অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এর সঠিক অবস্থান জানা যায় না। একাদশ শতকের শেষদিকে 'উত্তর বঙ্গ' ও 'অনুত্তর বঙ্গ' নামে বঙ্গের দুটি ভাগ কল্পিত হয়েছিল। পদ্মা ছিল এই দু'টি ভাগের সীমানা।

৪.৪ পুরানো পুঁথিপত্রে 'সমতট' নামের একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমতট ছিল কামরূপের দক্ষিণে। বর্তমান আসাম ও মেঘালয় রাজ্যের প্রাচীন নাম কামরূপ। বর্তমান বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলা এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য সমতটের অংশ ছিল। সমতটের দক্ষিণে ছিল হরিকেল। প্রাচীন পুঁথি অনুযায়ী এ জনপদটি ছিল চন্দ্রদ্বীপ সংলগ্ন। সে থেকে ধারণা করা যায়, বর্তমান বৃহত্তর চট্রগ্রাম জেলা ছিল হরিকেলের অংশ।

৪.৫ মোটামুটিভাবে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল প্রাচীন রাঢ় জনপদ। এ জনপদের উত্তরাংশ বজ্রভূমি ও দক্ষিণাঞ্চল সুহমভূমি নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমা, সাঁওতালভূমিসহ সমগ্র বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল উত্তর রাঢ়। বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশ, হুগলি জেলার বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল দক্ষিণ রাঢ়। মহাভারতে, জাতকের গল্পে, বৌদ্ধ পুঁথিতে ও বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় তাম্রলিপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুহমভূমিতেই অবস্থিত ছিল বিখ্যাত তাম্রলিপ্তি বন্দর।

৪.৬ কোটিল্যের অর্থাশাস্ত্রে, বাৎস্যায়নের রচনায় ও অন্যান্য গ্রন্থে গৌড়ের সমৃদ্ধি উল্লেখ পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে বর্তমান মুর্শিদাবাদ- বীরভূমই ছিল প্রাচীন গৌড়ের মুল ভূখন্ড। গৌড়ের আধিপত্য কখনও কখনও পার্শ্ববর্তী জনপদসমুহ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

৪.৭ পুন্ড্র এবং গৌড়ের অধীনে সমগ্র বাঙ্গলাকে একত্র করার প্রয়াস সফল হয়নি। যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির চোখে ঘৃণা ও অবজ্ঞার বিষয়, অবশেষে সে 'বঙ্গ' নামেই বাংলার সকল জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল পাঠান আমলে। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নিজেকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ,' হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁর রাজধানী ছিল 'লাখনৌতি' বা 'লক্ষণাবতী' বা গৌড়ে। আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবার' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে

'আল' যুক্ত হয়ে 'বাঙ্গালা' হয়েছে। 'আল' বলতে শুধু ক্ষেতের আল নয়, ছোট বাঁধও বোঝায়। চাষের জমিতে পানি ধরে রাখার জন্যই আল বা বাঁধের প্রয়োজন হয়। শব্দটিতে বাংলাদেশের কৃষি নির্ভরতা ও নদীমাতৃকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। মোগল আমলে এ অঞ্চলকে বলা হত 'সুবা বাঙ্গালাহ'। বস্তুত বঙ্গ থেকেই 'বাঙ্গালা', ফারসি 'বাঙ্গালাহ' পর্তুগিজ 'বেঙ্গালা', ইংরেজী 'বেঙ্গল', এবং আমাদের ভাষায় 'বাংলা' ও 'বাংলাদেশ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

৫.০ নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

৫.১ বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যে নরগোষ্ঠীর প্রভাব সবচাইতে বশী, তা হল 'আদি-অষ্ট্রেলীয়' বা 'ভেড্ডিড। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সঙ্গে চেহারার মিল থাকায় এদের বলা হয় 'আদি অষ্ট্রেলীয়'। আর শ্রীলঙ্কার ভেডডাদের মত দেখতে বলে এদের নৃতাত্ত্বিক নাম 'ভেড্ডিড'। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, 'দ্রাবিড়' বা 'আর্য' আসলে নরগোষ্ঠীর নাম নয়, ভ্যষাগোষ্ঠীর নাম। একই নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষার প্রচলন দেখা যায়। কাজেই ভাষা দিয়ে নরগোষ্ঠীর নাম করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টির অবকাশ থাকে, যদিও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

৫.২ বাংলাদেশের জনগোষ্ঠির মধ্যে আরেকটি রক্তের ধারা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় এবং তা হচ্ছে মঙ্গলীয়। বাংলাদেশের মানুষের ওপর যে মঙ্গোলীয় উপগোষ্ঠীর প্রভাব সবচাইতে বেশী, তাদের বলা হয় প্যারোইয়ান। পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজাতীয়দের মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্তধারার মালয়- ইন্দোনেশীয় উপগোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট। বিভিন্ন ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুতে মানুষের বিচিত্র জীবনপ্রবাহ তাদের চেহারায় এমন বৈচিত্র এনেছে যে, কোন্ রক্তধারা কোথায় কতটুকু মিশেছে, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

৫.৩ খৃষ্টপুর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে 'ইন্দো-আর্য' নামে পরিচিত ককেশীয় জনগোষ্ঠী উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে এ উপমহাদেশে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে এরা উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত ও পুর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং কালক্রমে এখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়। 'উচ্চবর্ণের' লোকদের মধ্যে এই নরগোষ্ঠীর চেহারার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তবে, ভেড্ডিড ও মঙ্গোলীয় রক্তের প্রভাব বাংলাদেশের সামগ্রিক জনগোষ্ঠির মধ্যে নেহাত কম।

৫.৪ ইন্দো-আর্যদের আগমনের পর পরই সম্ভবত পারস্য তূর্কিস্তান এলাকা থেকে শক জাতির লোকেরা ভারতবর্ষে অভিযান চালায়। তারা উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে, বিশেষত দক্ষিণ ও পুর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং কালক্রমে অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিশে যায়। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, এদেশের 'উচ্চবর্ণের' লোকদের গোল মাথার মুলে রয়েছে এই শক জাতীয় উপদান।

৫.৫ বাংলার বাইরের অনেক পরাক্রমশালী রাজা ও সেনাপতি বিভিন্ন সময়ে এদেশ আক্রমণ করেছে । তাদের সঙ্গীদের অনেকে হয়ত এদেশে স্থায়ীভাবে থেকে গেছে এবং কালক্রমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে গেছে । রাজপুত্রদের মধ্যে বিদেশী রাজকন্যা বিয়ে করার প্রচলন ছিল । এক্ষেত্রে বর্ণের বালাই ছিল না । এভাবেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রক্ত এসে মিশেছে । তুর্কি বিজয়ের পরও বাংলাদেশে কিছু ভিন্ন রক্তধারার স্পর্শ লেগেছে । বাংলাদেশে কয়েকজন হাবসি সুলতান রাজত্ব করেছেন । তাছাড়া হাবসি প্রহরী রাখার প্রচলনও এক সময় ছিল । এদের রক্ত মিশেছে এই জাতির মধ্যে । মধ্যযুগে মুসলিম সুফি সাধকরা এসেছেন সুদুর আরব থেকে । তাঁদের সঙ্গীরাও এসেছেন । দেশের দক্ষিণ পুর্বাঞ্চলে এসেছেন আরবি সওদাগররা । এর ফলে এই জাতির মধ্যে কিছু ভুমধ্যসাগরীয় রক্ত মিশে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক । মগ জলদস্যুদের উৎপাতে এক সময় অতিষ্ট ছিল বাংলাদেশের উপকূলীয় জীবন । এদের মাধ্যমে কিছু মগ রক্ত সঞ্চারিত হওয়া বিচিত্র কিছু নয় ।

৫.৬ বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের দৈহিক কাঠামো বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, আদি-অস্ট্রেলীয় অর্থাৎ ভেড্ডিড বৈশিষ্ট্যই বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মৌলিক ও প্রধান উপাদান । পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে ও পরিস্থিতিতে তাতে অল্পবিস্তর মঙ্গোলীয়, ইন্দো-আর্য ও শক পামিরীয় উপাদান এসে মিশেছে । সাধারণভাবে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে ইন্দো-আর্য ও শক পামিরীয় উপাদান এবং পুর্বাঞ্চলে মঙ্গোলীয় প্যারোইয়ান ও মালয়-ইন্দোনেশীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । এ বিচিত্র মেলামেশার ফলে শংকর জাতি হলেও এদেশের মানুষের দেহের একটি নিজস্ব গঠন দাঁড়িয়ে গেছে ।

৬.০ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

৬.১ আদি অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর মুল ভাষা ছিল ‘অষ্ট্রিক’ । স্বাভাবিকভাবে এদেশের আদি অধিবাসীদের ভাষা ছিল অষ্ট্রিক পরিবাভুক্ত । আজও আমাদের ভাষায় ‘কুড়ি’, ‘পণ’, ‘গন্ডা’, ‘গুঁড়ি’, ‘গুঁটি’, প্রভৃতি যেসব শব্দ প্রচলিত হয়েছে সেগুলো অষ্ট্রিক ভাষারই দান । দৈহিক পরিবর্তনের তুলনায় ভাষার পরিবর্তন হয় অনেক দ্রুত । কারণ, ভাষা অনেক বেশী গতিশীল ও প্রবাহমান । বিজয়ী সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিজিত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অনেকাংশে বদলে দেয় । সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রধান বাহন হচ্ছে ভাষা । কালের বিবর্তনে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোক এদেশে এসেছে । তাদের প্রভাবে এদেশের জনগোষ্ঠীর ভাষা ব্যাপকভাবে পরিবর্তন হয়েছে ।

৬.২ যে বৈদেশিক ভাষা প্রবাহ বাংলদেশের জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে প্লাবিত করেছে, তা হল ইন্দো-আর্য ভাষা । এ ভাষার আদি পরিশীলিত রূপ ‘সংস্কৃত’ । সাধারণ জনগোষ্ঠীর ব্যবহারে এই ভাষা রূপনিয়েছে ‘প্রাকৃত’ বা স্বাভাবিক জনভাষা হিসেবে । এই প্রাকৃত ভাষা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে । যেমন, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী । মাগধী প্রকৃত থেকেই বর্তমান বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেক ভাষাবিদ মনে করেন । স্বাভাকিভাবেই এ ভাষায়

গৃহীত হয়েছে আদি অষ্ট্রিক ভাষার অনেক শব্দ । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আর্যভাষী লোকেরা ভারতে আধিপত্য বিস্তারের সময় এখানকার আদিবাসীদের ব্যবহৃত দ্রাবিড় ভাষার অনেক শব্দ আর্য-ভাষায় আয়ত্ত করে নিয়েছিল । আর্য-ভাষার মাধ্যমে এমন অনেক দ্রাবিড় শব্দও বাংলায় এসেছে ।

৬.৩ লক্ষ্যণীয় যে, আর্য ভাষীরা বাংলায় খুব একটা বসতি স্থাপন না করলেও তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি এদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে । এর প্রধান কারণ, সংস্কৃত ছিল রাজভাষা । পরবর্তীকালে মুসলিম আমলেও রাজভাষা ছিল ফারসি । উল্লেখ্য, ফারসি ও ইন্দো- আর্য তথা ইন্দো- ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ।

৭.০ উপসংহার

৭.১ প্রাচীনকালে বিভিন্ন কোম মিলে যেসব জনপদ গড়ে উঠেছিল , সেগুলো একত্র করার জন্য বিভিন্ন সময় শক্তিশালী শাসকবর্গ চেষ্টা করেছেন । কিন্তু কৌম সমাজ স্থানীয় জনপদের সত্তাকে বৃহত্তর দেশসত্তায় মিলিয়ে দিতে আগ্রহী ছিল না । এদেশের মানুষের হৃদয়াবেগ , প্রাণধর্ম ও ইন্দ্রিয়ালুতার উৎসও হল সেই আদিম কৌম সমাজ । সাংসারিক জীবন ও পারিবারিক বন্ধনের প্রতি নাড়ির টান, রূপ-রস-গন্ধের প্রতি গভীর আসক্তি, বেদান্তে বিরাগ, শুষ্ক জ্ঞানার্জনের প্রতি অনাগ্রহ এসব এসেছে কৌম সমাজ থেকেই । এই চরিত্র একদিকে যেমন আমাদের শক্তি, অন্যদিকে তেমনি দুর্বলতা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে । শাসকবর্গ আর সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে দুস্তর ব্যবধান । একদিকে সমাজের সাধারণ স্তর হয়েছে একান্তভাবে ভূমি ও কৃষিনির্ভর, অপরদিকে শাসকবর্গ অভ্যস্ত হয়েছে ভিন্নতর সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রায় । রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজপতিদের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও আস্থা দেখা গেছে নিতান্তই কম । বৈদেশিক আক্রমণের মুখে শাসকবর্গের নেতৃত্বে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ খুব কমই ঘটেছে । ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও ভাষা পরিবারের সভ্যতা ও সংস্কৃতি মিলে একাকার হয়েছে এদেশের আদি অধিবাসীদের জীবনাযাত্রার সঙ্গে ।

৭.২ উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ, বাংলা ও বাঙালীর উৎস অনুসন্ধান করা হয়েছে । এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জাতিসত্তা ও রাষ্ট্রসত্তা এক নয় । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরেও রয়েছে । এ সব ক্ষেত্রে তারাও অভিন্ন ঐতিহ্যের অংশীদার । কিন্তু যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে, সেগুলো সময়ের বৃহত্তর পরিসরে সাম্প্রতিক হলেও স্বতন্ত্র জাতিসত্তা বিকাশে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ । বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধকে তীব্রতর করেছে এবং স্বাধীন সত্তার আন্বেষণে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে । স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ আমাদের জাতিসত্তার বিকাশে পরিণতি দিয়েছে ।

৭.৩ জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বের উৎস অনুসন্ধান জাতিসত্তার লালন ও বিকাশে অবদান রাখবে। এটি একদিকে গবেষণার বিষয়, অপরদিকে অনুভূতির। ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করতে সহায়ক হবে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, জাতীয় সংস্কৃতি(national culture) হচ্ছে মুল স্রোতধারা (dominant culture) এবং অপরাপর সংস্কৃতি (sub-culture)এর সমষ্টি। পুর্বোক্ত রচনায় খুশবন্ত সিং বলেছেন "I am convinced that our guaranteed diversity is our strength as a nation." বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি ভারতের মত এত বৈচিত্র্যপুর্ণ নয়। তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে যে সীমিত বৈচিত্র রয়েছে, তাকেও বৃহত্তর অর্থে বাংলাদেশের জাতিসত্তার অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সাম্য ,স্বাধীনতা, সুবিচার, কল্যাণ ও গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ হবে আমাদের জাতিসত্তার লালন ও বিকাশের উজ্জীবনী শক্তি।

বাংলাদেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা সমূহ

অধ্যাপক মোঃ মোফাজ্জালুল হক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের অনেকেরই ধারণা এ দেশটিতে একটি জাতি বাস করে। সত্তর দশকের প্রথম দিকে ধারণা ছিল পুর্ব পাকিস্তানে একটি জাতি বাস করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্কালে ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, এটি এক নেতা এক জাতির দেশ। সে দেশটি হচ্ছে আজকের বাংলাদেশ, আর জাতিটা হচ্ছে বাঙ্গালী। অথচ বাংলাদেশে প্রায় ৩৬ টার মত ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বা আছে। মোটামুটি ভাবে ২৫টির মত জাতিসত্ত্বা আছে বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। কিন্তু এদের বেশীর ভাগই ক্ষুদ্র। এ সমস্ত ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার বাস মুলতঃ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, দেশের পুর্ব ও পুর্ব দক্ষিণ অঞ্চলে। এদের মোট সংখ্যা সরকারী ভাবে ৬-৭ লক্ষের মত। বেসরকারী পরিসংখ্যানে সিলেটের চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকসহ ৩০ লাখের কাছাকাছি।

বাংলাদেশের বৃহত্তর পার্বত্য চট্রগ্রামে প্রায় ১৪/১৫টি ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বা রয়েছে। তন্মধ্যে চাকমারাই প্রধান। চাকমা উপজাতি থেকে উদ্ভুত সমস্যা বাংলাদেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ সমস্যা। পাবর্ত্য চট্রগ্রামে মুলতঃ চাকমা ও শান্তি বাহিনীই হচ্ছে প্রধান সমস্যা। শান্তি বাহিনীর অধিকাংশ সদস্যই চাকমা, তবে কিছু মারমাও রয়েছে।

রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া অঞ্চলে সাঁওতালদের বাস। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় এদের সংখ্যা ব্যাপক ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে (By force) এদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় শক্তির সাথে এই বিতাড়ন ক্রিয়ার একটা যোগসুত্র রয়েছে। বিশেষতঃ রাষ্ট্র যন্ত্র ছিলো তখন পাকিস্তানী জেনারেল এবং মুসলিম লীগারদের হাতে। সাঁওতালদের সংখ্যা এখনো ২ লাখের মত। সাঁওতালরা মুলতঃ রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

বাংলাদেশের উপজাতি সমুহকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ

১) পাহাড়িয়া অঞ্চলের উপজাতি ঃ বাংলাদেশের উপজাতিদের অধিকাংশই বাস করে পাহাড়িয়া অঞ্চলে। বৃহত্তর পার্বত্য চট্রগ্রামে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা বা টিপরা, মুরং তনচঙ্গা, বনগাছী, পাংখো, খিয়াং ও কুকী উপজাতিরা বাস করে। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে খাসিয়া, মনিপুরী, নাগা ও রাজবংশীরা বাস করে। মুরংরা মুলতঃ বান্দরবান জেলার গহীন জঙ্গলে বাস করে। তারা নিজেদেরকে আদিবাসী বলে দাবী করে। কুকীরাও নিজেদেরকে আদিবাসী বালে দাবী করে। তবে চাকমারা কুকীদের কে মাঝে মধ্যে অত্যাচার করে। ময়মনসিংহের গারো পাহাড়দের পাদদেশে গারো উপজাতিরা বাস করে।

২) **সমতল ভূমির উপজাতি ঃ** কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে রাখাইন উপজাতি আছে । দিনাজপুর, রংপুর বগুড়া ও রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে সাঁওতাল , পিগমী ও রাজবংশীরা বাস করে । অনেকের মতে রাজবংশীরা নিম্ন গোত্রের হিন্দু । টাঙ্গাইল ও গাজীপুরে কিছু গারো বাস করে । পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় অল্প কিছু মারমা বাস করে ।

সরকারী তথ্যে বিশেষতঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিবেশিত তথ্যে উপজাতি লোক সংখ্যা কমিয়ে দেখাবার প্রবণতা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয় । বিগত জরীপে বাংলাদেশে উপজাতিদের লোক সংখ্যা দেখানো হয়েছে ৬ লাখ । অথচ কম করে হলেও ১৫ লাখের মত উপজাতি বাংলাদেশে রয়েছে বলে আমার ধারণা ।

বাংলাদেশের উপজাতিদের মধ্যে চাকমারা শিক্ষা দীক্ষায়, জ্ঞান বিজ্ঞানে শিল্প সংস্কৃতিতে অনেকটা এগিয়ে । চাকমাদের শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশী । প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের এক্ষেত্রে অনেকটা অবদান থাকলেও বর্তমানে চাকমাদের শিক্ষিত করে তোলার পেছনে সরকারের কোন ভূমিকা নেই । ভারতীয় উপমহাদেশের জন সংখ্যা ভিত্তিক রাজনীতির ধারা অত্যন্ত প্রবল । সে কারণে তারা পরিবার পরিকল্পনায় আদৌ বিশ্বাসী নয় ।

কুকীরা পার্বত্য চট্রগ্রামের দুর্গম অঞ্চলে বাস করে । ১৯৮১ সালে এদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার । বেসরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুরংদের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার, যদিও সরকারী সুত্রে বলা হয় ৮/১০ হাজারের মত ।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১.২ থেকে ১.৫ ভাগ উপজাতি আছে । সংখ্যায় অতি নগন্য হলেও এদের নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ভাষা আছে । এদের মধ্যে অবেগগত ঐক্য আছে । এদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি থাকলেও এদের পারস্পরিক বৈশিষ্ট্য আলাদা । কাজেই তারা তাদের ঐ সংস্কৃতি ধরে রাখার প্রচেষ্টা এখনো চালিয়ে যাচ্ছে । বাঙ্গালী জাতি সত্তা বিপুল সংখ্যাগরিষ্টতার কারণে তাদেরকে অবহেলা করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছে । ফলে তারা নিজেদেরকে বাঙ্গালী বলে মনে করে না । বরং তারা নিজেদেরকে পাহাড়িয়া উপজাতি বলেই পরিচয় দিতে আগ্রহী । যতো ক্ষুদ্র হোকনা কেন, তারা নিজেদেরকে পৃথক সত্তার অধিকারী বলে দাবী করে ।

উপজাতিদের জীবনের সাথে প্রত্যক্ষ উৎপাদনের যেমন সম্পর্ক আছে, তেমনি তারা ভোগবাদীও বটে । তাই তারা নাচ, গান ও মদ্য পানে অভ্যস্ত । এক সময় উপজাতিদের প্রচুর জায়গা জমি ছিল । কিন্তু রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও পার্বত্য চট্রগ্রামে তাদের জমির মালিকানা ধীরেধীরে বাঙ্গালীর হাতে চলে যায় । তবে এটা সাধারণ জনগণ করেনি । যারা করেছে তারা অনেকাংশে বিশেষ ভাবে প্রভাবশালী

এবং সমাজের উচ্চ পর্যায়ে আসীন। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সহজ সরলমানুষগুলো স্বভাবতঃ জমি জমার হিসাব রাখতে পারে না । জমির কাগজপত্রের প্রয়োজনীয়তাও বোধ করে না । সেই সুযোগে বাঙ্গালী সমাজের চালাক ও ফন্দীবাজ ব্যক্তিরা প্রশাসনের কিছু অশুভ শক্তির ছত্রছায়ায় উপজাতিদের জমিজমা ধীরে ধীরে গ্রাস করে । ফলে উপজাতিরা হয়ে পড়ে নিঃস্ব । পার্বত্য চট্রগ্রামের সমস্যা মুলতঃ ভূমি থেকে উৎসারিত । ৫৪০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে পার্বত্য চট্রগ্রাম । সমতল জমির পরিমাণ মাত্র ৩.৫% ভাগ । বেশীর ভাগই হচ্ছে পাহাড়. । যাতে সমতলভূমির মতো ফসল উৎপাদন সম্ভব নয় । যদিও উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগে পাহাড়ে সমতল ভূমির তুলনায় দশগুণ ফসল উৎপাদন করা যায় । কিন্তু তা বর্তমানে আমাদের দেশে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না ।

সরকার পার্বত্য অঞ্চলে বাঙ্গলীদের জমি বরাদ্দ দেয় । উপজাতীয়রা ভবিষ্যৎ নিয়ে তেমন চিন্তা করে না । এজন্যে তারা সঞ্চয়েও তেমন আগ্রহী নয় । সরকার তাদেরকে জমি বরাদ্দ দেয়ার আহ্বান জানালেও তারা তাতে তেমন কোন সাড়া দেয়নি । রাষ্ট্রের অঙ্গ সমুহ যেমন প্রশাসন, পুলিশ, অফিস আদালত- এসব কিছুই তাদের নিকট ভীতিকর জিনিস । তারা সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপনে বিশ্বাসী ।

পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজাতীয়দের অভিযোগ হচ্ছে বাঙ্গালীরা বিভিন্ন ছলে-বলে কৌশলে পার্বত্য চট্রগ্রামের জমি কেড়ে নিচ্ছে , তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবন যাত্রার স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করছে । তাদের জীবনে রক্ষণশীলতার প্রভাব খুবই কম । নারী-পুরুষের মেলা মেশা অত্যন্ত খোলামেলা । কিন্তু বাঙ্গালীরা তাদের নারীদেরকেও ধর্ষণ করছে । এসব কারণে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্রাগুলোর বদ্ধমুল ধারণা যে সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের সর্বদাই শোষণ করে । তাই তারা তাদের নিজেদের স্বকীয় সত্ত্বা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জীবন ব্যবস্হা টিকিয়ে রাখার জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছে । দেশের সমতল ভূমিতে বসবাসকারী সংখ্যা লঘুরাও নানা কারণে সংখ্যাগুরুদের উপর বৈরী ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে । এ জন্যই রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয় ।

বর্তমানে ভৌগলিক কারণে ভারত চাকমাদের সহায়তা দিয়ে চাকমা সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলছে । এটা এখন বাংলাদেশের একটা প্রধান সমস্যা । সেটা সমাধানের ক্ষমতা অনেকাংশেই প্রশাসনের হাতে । রাজনৈতিক মহলেও এক্ষেত্রে যথেষ্ট করণীয় আছে, তবে এখন পর্যন্ত আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি । আসলে চাকমা সমস্যাটি যদি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমাধান না করা হয় তবে অদুর ভবিষ্যতে তা আরো প্রকট আকার ধারণ করবে ।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তসমূহের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যার সমাধানে করণীয়

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের সমস্যার ব্যাপারে প্রকৃত পদক্ষেপ না নিলে সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। সেজন্য আমাদের করণীয় হচ্ছে ঃ

১. তাদের সমস্যার প্রকৃতি ও গভীরতা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা
২. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে অবহেলা না করে তাদের প্রতি সহমর্মী হওয়া
৩. পাবর্ত্য চট্রগ্রাম এবং তৎসংলগ্ন এলাকার সমস্যা নিয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনার মাধামে এর আশু সমাধান করা।

(বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রশিক্ষণার্থীদের অনুলিখন থেকে নিবন্ধটি প্রণীত হয়েছে।)

বাংলাদেশে মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

ডঃ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে মুক্তিযুদ্ধের তাত্ত্বিক কাঠামোর যথাযথ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই তাত্ত্বিক কাঠামোর উপাদানগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. জাতীয়তাবাদ

২. ঔপনিবেশিকতাবাদ

৩. সিভিল সমাজ

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠতাবোধ

৫. ইতিহাসের অটোনমী।

এখন আসা যাক উপাদানসমুহের পর্যায়ক্রমিক বিচার, বিশ্লেষণ ও মুল্যায়নে;

জাতীয়তাবাদের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। একে ব্যাখ্যা করা সহজসাধ্য নয়। জাতীয়তাবোধ হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় না। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ বোধ সৃষ্টি হয় বলেই বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্ম, ইতিহাস, আশা, আকাঙ্খা বদলে যেতে পারে। অবশেষে এই প্রক্রিয়ায় জাতীয়তাবোধ থেকেই জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির সাথে সাথেই এর প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না বরং তখন থেকেই তা হয়ে উঠে আরও কার্যকর ও বাজ্ময়। জাতীয়তাবাদের একটি ফ্রেম বা কাঠামো থাকে, এই বোধ জাতীয়তাবাদ তৈরী করে তা হলো কল্পনাকৃত ভুবন। এ বোধের মধ্যে যারা বসবাস করেন তারা একটি বিশেষ ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, এবং ইতিহাসের ধারক এবং বাহক। এগুলো ঐ নির্দিষ্ট কল্পনাকৃত ভুবন তৈরীর মুল উপাদান। এই বোধই আমাদের বাঙ্গালীর বোধ।

এখানে আরও যুক্ত রয়েছে ওপনিবেশিকতার বোধ। ওপনিবেশিকতার বোধের মধ্যে আমাদের বাঙ্গালীর বোধ লাঞ্ছিত হয়েছে, পদদলিত হয়েছে। বাঙ্গালীর এই বোধ উপস্থাপিত হয়েছিলো রাষ্ট্র পরিচালকদের কাছে নিকৃষ্ট হিসেবে। ফলে বাঙ্গালীর মধ্যে ঔপনিবেশিক বোধের বিরুদ্ধে এ প্রত্যয় জাগ্রত হয় যে বাঙ্গালী অধস্তন নয়, কিংবা বাঙ্গালী নিকৃষ্ট নয়। আর এই যে বোধই মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি রচনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সাবেক পুর্ব পাকিস্তানে ১লা মার্চ থেকে, যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার ৩৫টি নির্দেশের মুল কথা ছিল একটি সিভিল শাসন কয়েম করা যা মুক্তিযুদ্ধের আর একটি শর্ত। অসহযোগের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের যে সুচনা হয়, সেই অসহযোগ আন্দোলন যুদ্ধ শেষের আগেই সামরিক শাসনকে প্রত্যাখান করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের চতুর্থ শর্ত হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বোধ। সাবেক ভারতবর্ষ ও সাবেক পাকিস্তানের মুল সমস্যা ছিল সাম্প্রদায়িকতা। বাঙ্গালীরা সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি, বরং রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার বোধকে সর্বদা সমুজ্জ্বল রাখতে চেয়েছে। বাঙ্গালীর এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার বোধই সাবেক পুর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মানুষকে এক সুত্রে গেঁথে রাখতে উদ্দীপ্ত করেছে। সর্বশেষে মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাস তৈরী করে দিয়েছে।

আইয়ুব খান, বলেছিলেন বাঙ্গালী হলো মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি পুর্ব পাকিস্তানের ইতিহাস তৈরী করেছে এমনভাবে যে, বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ধর্ম, ভাষা-সবই নিকৃষ্ট।

মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক তাৎপর্য হলো- এই যুদ্ধ এই জনপদের বাসিন্দাদের অহংকারবোধ, জাতীয়তাবোধ তৈরী করে দিয়েছে যার ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি হয়েছে মর্যাদাবান। পরাধীনতা ও ঔপনিবেশিকতা ব্যক্তিকে মর্যাদাহীন করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ এই অর্থে পাকিস্তানের সামরিক আদর্শ, সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতার আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করে।

সিভিল সমাজ জরুরী একটি বিষয়। পাকিস্তানে সামরিক ক্ষমতাই ছিল রাষ্ট্রশক্তির মূলভিত্তি। পাকিস্তানের ২২ বছরের শাসনামলে ১৭ বছরই ছিল সামরিক শাসন। অথচ সামরিক শাসনের পরিবর্তে সিভিল শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙ্গালীরা মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বার বার যে সামরিক শাসন এসেছে তা মুক্তিযুদ্ধের ফলশ্রুতি নয়। বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই মুক্তিযুদ্ধ তাত্তিকভাবে সফল হয়েছে বলা যাবে। মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র দেশবাসীর সম্মতিতে সংঘটিত হয়েছে অথচ স্বাধীনতা পরবর্তী সামরিক শাসন দেশবাসীর সম্মতিতে আসেনি। তাই সামরিকতা প্রশাসনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি- এ কথা সত্য নয়। জনগণের মর্যাদাকে পুঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সিভিল সমাজ তৈরী একান্ত জরুরী। এতেই মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে।

ভাষা আন্দোলনের প্রভাব

আ ক ম মাহবুবুজ্জামান
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
বিপিএটিসি

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অভুতপুর্ব ঘটনা । বিশ্বের আর কোন জাতি বা দেশ তার মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বুকের তাজা রক্তে রাজপথ শীতল করেছে এমন দৃষ্টান্ত আজও দেখা যায়নি । এদেশের চিরঞ্জীব সন্তান বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার, সফিউর সহ নাম না জানা অনেকের শোণিত ধারায় বাংলাভাষা চির ভাস্কর হয়ে আছে । তাই বায়ান্নো সালের মহান ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলন এদেশের ইতিহাসে রেখেছে অম্লান স্বাক্ষর ।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

ভাষা আন্দোলনের প্রভাব আলোচনার পুর্বে এর একটি সংক্ষিপ্ত পটভূমি তুলে ধরা প্রয়োজন । পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির সৃষ্টি লগ্নে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযাচার্য ডঃ জিয়াউদ্দীন আহম্মদ পাকিস্তানের রাষ্টভাষা হিসেবে উর্দ্দুর নাম প্রস্তাব করলে উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'আজাদ' পত্রিকায় এক প্রবন্ধের মাধামে তার তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করেন । ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর 'তমুদ্দুন মজলিস' নামক একটি সংগঠন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 'বাংলা না উর্দ্দু ' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করে । এই পুস্তিকায় অধ্যাপক কাজী মেতাহার হোসেন ও অধ্যাপক আবুল কাসেম বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তোলেন । কিন্তু বাংলা ভাষার দাবী উপেক্ষিত হয় এবং সকল প্রকার দলিল, ফরম ও মুদ্রায় ইংরেজী ও উর্দ্দু ভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে । ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ শেরেবাংলা ফজলুল হক হলে একটি সর্বদলীয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে । এই পরিষদের উদ্যোগে ১৬ই মার্চ তারিখে পুর্ব পাকিস্তান ব্যাপী বাংলা ভাষার দাবীতে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয় । ঠিক ৪দিন পর ২১শে মার্চ তারিখে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম গর্ভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বের্তমানে স্বাধীনতা উদ্যান ও ভূতপুর্ব সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'উর্দ্দু এবং কেবল মাত্র উর্দ্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'' তিনি পুনরায় ঢাকাস্হ কার্জন হলের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ২৪শে মার্চ তারিখে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন । দুটি স্হানে বক্তব্য পেশকালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র 'না' ধ্বনি দ্বারা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । সেদিনের 'না'' সুচক ধ্বনিটি পুষ্প পল্লবে সুশোভিত হয়ে ১৯৫২ সালে ঢাকায় শুরু করে মহান ভাষা আন্দোলন এবং সুচনা করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির দীপ্ত প্রত্যয় ।

পাকিস্তানের ভাঙ্গনের পুর্বাভাষ

১৯৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের আন্দোলনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের বাইরে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বুদ্ধিজীবি ছাড়া অন্যদের মাঝে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি । তবু স্বরনীয় যে, ঐ সময়ে উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত পন্ডিত, বহুভাষাবিদ ও রসস্রষ্ট্রা সাহিত্যিক ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী (তৎকালীন বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ) 'চতুরঙ্গ' প্রত্রিকায় 'পুর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক এক নিবন্ধে শাসক গোষ্ঠির প্রতি বলিষ্ঠ হুশিয়ারী উচ্চারণ সহ সার্থক ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন । তিনি লিখেছিলেন ' আজ যদি জোর করে পোপের ভ্রান্তাদর্শ অনুসরণ করে উদ্দু ওয়ালারা পুর্ব পাকিস্তানের স্কন্ধে উর্দ্দু চাপান, তবে লুথারের মত লোক পুর্ব পাকিস্তানে খাড়া হবেন । যাঁরা অখন্ড পাকিস্তান চান তাঁরা এই কথাটি ভেবে দেখবেন । .... পুর্ব পাকিস্তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তার ঘাড়ে উর্দ্দু চাপানো হয়, তবে স্বভাবতঃই উর্দ্দু ভাষাভাষী বহু নিষ্কর্মা শুধু ভাষার জোরে পুর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করা চেষ্টা করবে এবং ফলে জনসাধারণ একদিন বিদ্রোহ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । ' বলা বাহুল্য, নিবন্ধটি প্রকাশেতর পর মুজতবা আলীকে কেবল মাত্র সরকারী রোষাণলেই পড়তে হয়নি ,বরং দেশমাতৃকা ত্যাগ করে পাকিস্তানী আমল শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল । ঐ ক্ষণজন্মা পন্ডিতের ভবিষ্যৎবাণী ১৯৫২ সালে প্রথম দফা সকল বাঙ্গালীর উপলব্ধিতে আসে এবং ১৯৭১ সালে চরমভাবে প্রমাণিত হয় । এক্ষেত্রে আরেকটি অদ্ভুত সম্মিলন লক্ষ্যনীয় যে, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোল।ন সংঘটিত হয় , ১৯৫৪ সালে হক-ভাসানী -সোহরোওয়র্দী ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে শাসক দল মুসলিম লীগের নাম নিশানা পুর্ব পাকিস্তানের বুক থেকে মুছে দিতে সফল হয় এবং মুজতবা আলীর ভবিষ্যৎবাণীর ঠিক ২১ বছর পরে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করে বাংলাদেরে অভ্যুদয় ঘটে ।

ভাষা আন্দোলনের প্রভাব

বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর বলেছিলেন, " বাঙ্গালীর ঐক্যের মুল সুত্রটি কি ? আমরা এক ভাষায় কথা কই । আমারা দেশের এক প্রান্তে যে বেদনা অনুভব করি, ভাষার দ্বারা দেশের অপর সীমান্তে তাহা সঞ্চয় করিয়া দিতে পারি । রাজা তাঁহার সমস্ত সৈন্যদল খাড়া করিয়া তাঁহার রাজদন্ডের সমস্ত বিভীষিকা উদ্যত করিয়াও ইহা পারে না ।" কিন্তু কবির বক্তব্যের সরলীকরণে বলা যায় যে, বাঙ্গালী বর্ণে নয়, ধর্মে নয়, সম্পদে নয়, কেবলমাত্র ও একমাত্র ভাষার বন্ধনেই আবদ্ধ ও একতাবদ্ধ । আষা আন্দোলন প্রথমবারের মত বাঙ্গালী জাতিকে ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত করেছিল ।

এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত অবয়বে আন্দোলনের প্রভাবসমূহ আলোচনা করা হলোঃ

রাজনৈতিক প্রভাব

ক) বিরোধী ছাত্র সংগঠনসমুহের ঐক্য

১৯৫২ সলের ভাষা আন্দোলনের প্ররিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠন 'নিখিল পুর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় ও অন্যানা কলেজ সংসদ থেকে উৎখাত করার জন্য পুর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ', পুর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাত্র সংগঠনসমূহ 'গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্ট' গঠন করে। গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্ট ১৯৫৩ সালে ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ) তে জয় লাভ করে এবং ডাকসুর সমাবর্তন উৎসবে নব নির্বাচিত ছাত্রী প্রতিনিধি ফরিদা বারী মালিক' আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালো বাসি ' নামক রবীন্দ্র সংগীতটি পরিবেশন করেন, যা পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে।

খ) বিরোধী রাজনৈতিক ঐক্য ও সাধারণ নির্বাচনে জয় লাভ

বিরোধী ছত্র সংগঠন 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট ' এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং ছাত্র সমাজের জোর প্রচেষ্টায় হক-ভসানী -সোহরাওয়র্দীর নেতৃত্বে একুশ দফার ভিত্তিতে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট শতকরা ৯৭ ভাগ ভোট পেয়ে পুর্ব পাকিস্তানের প্রায় সবকয়টি আসনে জয় লাভ করে। স্মরণীয় যে, ৫২ সালের ঘাতক মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে ময়মনসিংহের নান্দাইল কেন্দ্রে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা খালেক নওয়াজ খান। মুসলিম লীগের ভরাডুবি পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠিকে এ অঞ্চলের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে বাধ্য করে তোলে।

গ) প্রতিবাদী ভূমিকা পালনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি

১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতা দখলের পর পাকিস্তানের সবগুলো ভাষা লিখনের জন্য রোমান হরফ চালু করারএবং একটি জাতীয় ভাষা সৃষ্টির এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালান। ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই ও মুনির চৌধুরীর উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক প্রতিবাদ সভা। সে সময়ে আইয়ুব খানের দোর্দন্ড প্রতাপের মুখেও প্রতিবাদী ভূমিকা পালনে তৎপর হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রবৃন্দ এবং তাদের যুক্ত প্রয়াসে আইউব খানের ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দেয়া হয়।

১৯৬২ সালে সামরিক সরকার শিক্ষা সংকোচের প্রচেষ্টায় হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের চেষ্টা করলে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। ঢকার রাজপথ রঞ্জিত হয়

ওয়াজিউল্লাহ, বাবুল ও মোস্তাফিজুরের রক্তে। তবু সফল হয় ছাত্র আন্দোলন এবং শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল হয়ে যায়।

খ) বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থান

আইউব আমলে বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থানে সংঘটিত হয়। তার মধ্যে ১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ কর্তৃক তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খানের 'সমাবর্তন' অনুষ্ঠান বর্জন, ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফার স্বপক্ষে আন্দোলন ও সরকারী দমন নীতির প্রতিবাদ এবং ছাত্র সমাজের ঐতিহাসিক ১১ দফার আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে ছাত্র ও গণ আন্দোলনের মাধ্যমে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার চাপ সৃষ্টি এবং আইউব সরকার উৎখাতের আন্দোলন অন্যতম। উনসত্তুর সালেই প্রথম উচ্চারিত হয় 'তোমার দেশ আমার দেশ বাংলা দেশ বাংলাদেশ' শ্লোগান।

স্বাধীনতা আন্দোলন

১৯৭০ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক পরিচালিত সাধারণ নির্বাচনে পুর্ব পাকিস্তানে একচেটিয়া ভাবে আওয়ামী লীগের ছয় দফার বিজয় ঘটে। এতে পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা অর্পণে টালবাহানা আরম্ভ করে। আরেকবার ভাষা আন্দোলনের মত ইস্পাত দৃঢ় ঐক্য নিয়ে এদেশের জনগণ আন্দোলন আরম্ভ করে। অবশেষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালে ২৬শে মার্চ নিরস্ত্র বাঙ্গালী জাতির উপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিলে আরম্ভ হয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ১৬ই ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হয়।

সাংস্কৃতিক প্রভাব

ক) বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠান

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের আরেকটি ধারা যুক্ত হয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। ঘাতক নুরুল আমিনের সরকারী বাসভবন 'বর্ধমান হাউস' কে বাংলা একাডেমী তে পরিণত করা হয়। সেখানে বাংলা সাহিত্যের ও বাংলা ভাষার বিকাশের ধারা গড়ে ওঠে। ১৯৫৪ সাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র শিক্ষক সমন্বয়ে একটি ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, যার উদ্বোধন করেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এই সাহিত্য সম্মেলনেই অবহমান বাঙ্গালী ঐতিহ্য ও চেতনার ভিত্তিতে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনার সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উদযাপন করা হয়। এতে বাংলা ভাষার 'হাজার বছরের কবিতা ও গান বিশদভাবে আলোচনা হয় এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মুল ভিত্তি হিসেবে বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপরেখাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়।

খ) গণ সঙ্গীতের চর্চা ও প্রসার ঃ

ভাষা আন্দোলনের অন্যতম ফসল গণ সঙ্গীত গীত হতে থাকে হাটে বাজারে, গ্রামে -গঞ্জে। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুমিতে পারি ' 'ওরা আমার মুখের ভাষা 'কাইড়া নিতে চায় ' এবং 'বাংলা ভাষার আন্দোলন করলিরে বাঙ্গালী' 'ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলী, প্রভৃতি গণ সঙ্গীত আজও আপামর জন সাধারণের বুকের ধণে পরিণত হয়ে আছে।

গ) শহীদ মিনার ও সাংস্কৃতিক সম্মিলন ক্ষেত্র সৃষ্টি

ভাষা আন্দোলনে বাঙ্গালী জাতিকে একত্রিত করার মহান ভূমিকা পালনে জাতিকে উপহার দিয়ে গেছে শহীদ মিনার'। এ যেন ঐক্যের প্রতীক। যেমন করে কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ গেয়ে ওঠেন, 'স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার ? ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো চার কোটি পরিবার/ খাড়া রয়েছিতো/যে ভিত কখনো কোন রাজন্য পারেনি ভাঙ্গিতে। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রতীক রূপে সৃষ্ট শহীদ মিনারটি আজ জাতীয় শহীদ মিনারের মর্যাদায় ভূষিত। সে শহীদ মিনার আজ জাতীয় ঐক্য, মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের প্রধান সম্মিলন ক্ষেত্র রূপে পরিগণিত।

ঘ) ধর্ম নিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চা

ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালে প্রগতিশীল ও ধর্ম নিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড প্রাধান্য লাভ করে। গণসঙ্গীতের পাশাপাশি গণ নাটকের প্রসার লক্ষ্য করা যায়। এবং মুক্ত ও প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চা আরম্ভ হয়। মুসলিম লীগের পতন ত্বরান্বিত হবার ফলে ধর্ম নিরপেক্ষ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল বিকাশ লাভ করে এবং অদ্যাবধি সেই ধর্ম নিরপেক্ষ সংস্কৃতি বিদ্যমান রয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রভাব

ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই গড়ে ওঠা যুক্ত ফ্রন্টের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক তথা আঞ্চলিক সম উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমতা বিধানের দাবী ক্রমশঃ জোরদার হতে শুরু করে। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক ক্ষমতা ও

দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করণের প্রস্তাব একুশের চেতনার ফসল । পুর্ব পাকিস্তানের জনমতের চাপে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী কতিপয় ক্ষেত্রে সমতা আনয়নের আশ্বাস প্রদান করে ।

খ) শোষনের প্রতিবাদ ও ঐতিহাসিক ছয় দফা

আইউব আমলে পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠে । এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ মজহারুল হক, অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও অন্যান্যরা । তাঁরা বিভিন্ন ফোরামে লেখনী ও বক্তব্য দ্বারা শোষনের স্বরূপ উদঘাটনের প্রচেষ্টা চালান এবং পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থনীতি চালু করা দাবী তোলেন । এই দাবীর পটভূমিতেই গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক ছয় দফা ।

গ) সংবিধানের অন্যতম মুলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ ঃ

ভাষা আন্দোলন বাঙ্গালী জাতিকে সমস্ত প্রকার দুঃখ, গ্লানি , অন্যায় , শোষণ ও অসাম্য থেকে মুক্ত হবার প্রেরণা এনে দেয় । তারই ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক শোষণমুক্ত হবার জন্য বাঙ্গালী স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মুলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় । সংবিধানের পাতায় লেখা হয় ঃ "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত, ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে ।" 'উল্লেখ্য যে, সকল নাগরিকের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করা এবং সুষম উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব বলে স্হির করা হয় ।

উপসংহার

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে বাঙ্গালী তার মাতৃভাষা ও বাক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সুচনা করে । ক্রমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা দুরীভূত করণের আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যায় । ১৯৭১ সালে বাঙ্গালী স্বাধীনতা যুদ্ধ করে একুশের চেতনাকে আরেকবার সুসংহত করেছে । কিন্তু এখানেই শেষ নয় । প্রতি বছর একুশ এসে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ এখনও নিরক্ষর, শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে অবস্হান করছে, গণতন্ত্র বারংবার বিপর্যস্ত হচ্ছে । তাই, "শহীদের রক্তে বারবার ভিজে যাচ্ছে এদেশের মাটি , আমার আনুগত্য রাখি কোথায়, কোথায় রাখি আমি ? " আজকের দিনে আষা আন্দোলনের প্রভাব দেখি কতিপয় সুনাগরিকের বিবেকের দংশনে, ব্যর্থতার ব্যথায় ক্রমাগত যাদের নুয়ে আসে মাথা । আরেকটি একুশ এদেশে আবারও বড় প্রয়োজন ।

গ্রন্থপঞ্জী

১। আল হেলাল, বশীর (১৯৮৫) 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২। ইসলাম, রফিকুল (১৯৯৫) 'বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ ' (প্রবন্ধ), দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে ফেব্রুয়ারী, সংখ্যা ১৯৯৫, ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন, ঢাকা।

৩। উমর , বদরুদ্দিন (১৯৭০) 'পুর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, মওলা ব্রাদর্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৪। দে, তপন কুমার (১৯৯৫) 'আওয়ামী লীগের গোড়া পত্তন ও শামসুল হক ' (প্রবন্ধ), সাপ্তাহিক বর্তমান দিনকাল, ২৯শে সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ফ্লোরা প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা।

৫। মতিন, আব্দুল ও রফিক, আহমদ, (১৯৯১) 'ভাষা আন্দোলন ঃ ইতিহাস ও তাৎপর্য', জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

৬। মুজতবা আলী, সৈয়দ (১৯৫০) 'পুর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (প্রবন্ধ), মাসিক চতুরঙ্গ পত্রিকা, শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৫৬ , ঢাকা।

৭। রহমান, ওয়াহিদ (১৯৯৫) 'ভাষা আন্দোলনের ধারা ও আমাদের অস্তিত্ব' (প্রবন্ধ), দৈনিক ইনকিলাব, ১০ই মার্চ, ১৯৯৫ সংখ্যা, ইনকিলাব ভবন, ঢাকা ।

৮। হক, আব্দুল (১৯৭৬) ' ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৯। ....(১৯৭৯) 'রবীন্দ্র রচনাবলী (খন্ড ২৩)।

১০। ....(১৯৭৯) ' একুশের সংকলন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১১। ....(১৯৮০) একুশের সংকলন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১২। কামাল, মোস্তফা, (১৯৮৯), 'ভাষা আন্দোলন ঃ সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা।

বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ও সচলতা

নীলুফার বেগম
এমডিএস, বিপিএটিসি

যে দিন থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের শুভ-সুচনা ঘটেছে সে দিন থেকেই সমাজ বিজ্ঞানে 'সামাজিক কাঠামো' (Social Structure) একটি অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হিসেবে পরিগণিত। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা লাভের একটা পটভূমি আছে। 'Structure ' শব্দটি শুরুতে বাড়ি, ঘর, দালান কোঠা ইত্যাদি তৈরীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ষোড়শ শতক থেকে এটা যে কোন একটি সমগ্র সত্তার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীববিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়নকারী চার্লস ডারউইন এ শব্দটির উপর বিশেষ জোর দেন।

সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানী র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের জালই সমাজ কাঠামো। সমাজবিজ্ঞানী গীন্সবার্গের মতে সমাজকে গঠন করে এমন প্রধান প্রধান গোষ্ঠী ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের যৌগিক সমন্বয় হলো সমাজ কাঠামো। গার্থ এবং মিলস সমাজ কাঠামোকে এমন এক বিমূর্ত প্রত্যয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যার বাস্তব ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির ভূমিকা পালনের সম্পর্ক। তাঁরা বলেন যে, 'ভূমিকা' হচ্ছে কোন অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের চাবিকাঠি। ভূমিকা বা কাজ হচ্ছে একক যার ভিত্তিতে আমরা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা পাই। আবার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এমন একক যার দ্বারা সমাজ কাঠামো সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করি।

গীন্সবার্গের উল্লিখিত সংজ্ঞার গুরুত্ব দিয়ে কোহেন, লেভি এবং সুটনের সংগে একমত পোষণ করে বটোমর বলেন যে, কোন সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করে কয়েকটি ব্যবস্থাপনা বা প্রক্রিয়ার উপর যাকে সমাজের কার্য নির্বাহী শর্ত বলা যায়। নিম্মোক্ত শর্তগুলো হচ্ছে সমাজের অস্তিত্বের জন্য একান্ত অপরিহার্য। যথা-

১। যোগাযোগ ব্যবস্থা ২। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৩। সামাজিকীকরণ ব্যবস্থা ৪। ক্ষমতার বন্টন ব্যবস্থা এবং ৫। আচার অনুষ্ঠান ব্যবস্থা। এগুলো থেকে সামাজিক স্তরায়নের মত আরো কিছু বিষয় দেখা দিতে পারে, যা সমাজ কাঠামো বিশ্লেষণে বেশ সহায়ক।

বাংলাদেশের সমাজের মধ্যে একাধিক সমাজের বৈশিষ্ট্য ও কাঠামো রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো পর্যালোচনা করতে হলে বৃহদাকারে নয় বরং ক্ষুদ্রাকারে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি

ভেবে দেখতে হবে । অর্থাৎ বাংলাদশের বৃহদায়তন সমাজের মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষুদ্রাকৃতির সমাজ । এসব ক্ষুদ্রাকৃতির প্রতিটা সমাজের রয়েছে এক একটি কাঠামো ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যদিও বাংলাদেশের সমাজের কাঠামো বিশ্লেষণের ক্ষুদ্র পরিসরে অনেকগুলো সমাজের কথা ও সেগুলোর স্ব স্ব কাঠামোর কথা উঠবে তথাপি এটা অনস্বীকার্য যে, ক্ষুদ্র সমাজ ও তার কাঠামোগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় । বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ এবং বাংলাদেশ নামক সমাজ হলো বৃহৎ সমাজ জগৎ । বলা বাহুল্য যে, Micro Cosmos গুলো অবশ্যই Macro cosmos এর সঙ্গে প্রধানতঃ আর্থ -রাজনৈতিক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সর্ম্পকযুক্ত । আর এ কথাটি মনে রেখেই বাংলাদেশের সমাজের একটি কাঠামোগত রূপ দেয়া সম্ভব ।

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো আলোচনায় বাংলাদেশেকে গ্রামীন সমাজ, নগর সমাজ, উপজাতীয় সমাজ এবং পেশাদারী গোষ্ঠী সমাজ এই চার ভাগে বিভক্ত করা যায় । এ সব সমাজের কাঠামো পর্যালোচনার মাধ্যমে এবং ঐ সব কাঠামোগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেখা যাবে ।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ কাঠামো

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর বিশ্লেষণে গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ক্ষমতার বন্টন, নেতৃত্ব, সামাজিকীকরণ ব্যবস্থা, আচার অনুষ্ঠান, গ্রাম সমাজের স্তরবিণ্যাস এবং গ্রামের সংগে অন্যান্যদের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা যায় । কেননা এ সব বিষয়ে আলোচনা গ্রাম সমাজের কাঠামো অনুধাবনে সহায়ক ।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজ কাঠামোর মৌল ভিত্তি

গ্রামীণ বাংলাদেশে অদ্যাবধি জমিই যচ্ছে প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদ । জমির মালিকানা ও পরিমাণকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ সমাজের সদস্যদের মধ্যে এক ধরণের উৎপাদন সম্পর্ক এবং আর্থিক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে । কিছু ধনীকৃষক পরিবার আছে যারা জমি বর্গা দেয় । বিভিন্ন শর্তে ঐ জমি যারা বর্গাচাষ করে তাদের বলা হয় বর্গাচাষী বা ভাগচাষী । জমির মালিকানা, বর্গাচাষ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে কয়েক ধরণের আর্থ সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যা গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর অন্যতম মৌল অঙ্গ ।

বর্গাদার -বর্গাচাষী সম্পর্ক

কৃষি নির্ভর গ্রামীণ বাংলাদেশে বর্গাদার বর্গাচাষীর মধ্যে একটি অলিখিত চুক্তি বিদ্যমান । এই চুক্তি অনুযায়ী বর্গাচাষী অঞ্চল ভেদে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ ফসল লাভ করে । বাকীটা পায় বর্গাদার ।

বর্গাগার-বর্গাদার সম্পর্ক

বর্গাদার সাধারণতঃ আর্থিকভাবে বর্গাচাষীদের তুলনায় সচ্ছল । বার্গাদারের সঙ্গে বর্গাদারের বন্ধুত্বের সম্পর্ক যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে প্রতিযোগিতা ।

বর্গাচাষী -বর্গাচাষী সম্পর্ক

বর্গাদারদের তুলনায় বর্গাচাষীদের মধ্যে একতাবোধ বেশি । বর্গাচাষীরা একে অপরের সুখদুঃখের সাথী । তাদের পক্ষে নিজের বাড়িতে ঘটা করে তেমন কোন উৎসব আয়োজন করা সম্ভব হয়ে উঠেনা । তাই কৃষি কাজকর্ম , হাটবাজারে গ্রামীণ কোন সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং অন্য কোথাও বেড়াতে গিয়ে এরা প্রায়ই দলবদ্ধ হয় ।

প্রান্তিক জমির মালিক-চাষীর সঙ্গে অন্যান্যদের সম্পর্ক

প্রান্তিক জমির মালিক-চাষীরা বর্গাচাষী এবং ভূমিহীন দিন মজুরের সঙ্গে বেশি নিবিড় সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখে । কেননা, এদের মধ্যে আর্থিক ব্যবধানটা বেশি নয় । বর্গাদার শ্রেণী প্রান্তিক চাষীদের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখলেও আর্থিক সম্পর্ক তেমন বজায় রাখেনা । এর প্রধান কারণ হলো বর্গাদার প্রান্তিক চাষীর ক্রমোন্নতি সহ্য করতে পারে না । কেননা প্রান্তিক চাষী জমি ক্রয়ের মাধ্যমে ক্রমে বর্গাদারে পরিণত হতে এবং গ্রামীণ নেতৃত্বে অংশ নিতে চাইবে । পক্ষান্তরে, প্রান্তিক চাষী বর্গাদার ধনী কৃষককে এজন্য ভয় পায় যে ধনী কৃষকের সামনে থেকে জমি ক্রয় করা তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে ।

ভূমিহীন দিন মজুরের সঙ্গে সম্পর্ক

গ্রামীণ বাংলাদেশে ভূমিহীন দিন মজুরের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় । এরা বর্গাদার এবং প্রান্তিক জমির মালিকদের বাড়িতে মজুরির বিনিময়ে কাজ করে । ইদানিং

ভূমিহীন কৃষি দিন মজুরেরা কাজের সন্ধানে নিকটস্থ শিল্প কারখানা, শহর বন্দর ইত্যাদি জায়গায় ছুটেছে বলে অনেক গ্রামেই কৃষি মজুরের সংখ্যা কমেছে।

মহাজন -খাতক সম্পর্ক

বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামেই মহাজন রয়েছে যারা চড়া সুদে টাকা ঋণ দেয়। যারা ঋণ গ্রহণ করে তারাই খাতক। এসব মহাজনেরা মুলতঃ ধনী কৃষক বা স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রেণী। আগের দিনে হিন্দু মহাজনের সংখ্যা বেশি ছিল। মুসলিম মহাজনের সংখ্যা কম হলেও প্রায় এলাকায়ই এদের দেখতে পাওয়া যায়।

ক্ষমতা বন্টন ও নেতৃত্ব

অধিকাংশ গ্রামে এক বা একাধিক গ্রাম প্রধান (মোড়ল, মাতব্বর) থাকেন। এছাড়া থাকে নেতৃস্থানীয় 'বুঝবান' ব্যক্তিসমুহ যারা গ্রামীণ কমিটির সদস্য। সম্পদ (জমি বা টাকা) বংশ বা পারিবারিক ঐতিহ্য, বয়স, জনপ্রিয়তা ও শিক্ষা হচ্ছে গ্রামীণ ক্ষমতার উৎস। তবে এগুলোর মধ্যে সম্পদই ক্ষমতার প্রধান উৎস।

যেহেতু গ্রামে সম্পদ অসমভাবে বন্টিত সেহেতু ক্ষমতাও অসমভাবেই বন্টিত। তবে এমন পরিবারের অভাব নেই যারা অধিক জমির মালিক হওয়া সত্বেও ক্ষমতা ব্যবহার করেন না। কোন ব্যক্তি যদি একাধারে মাতব্বর এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বা চেয়ারম্যান হন তবে অন্যান্য সাধারণ মাতব্বরের তুলনায় ঐ ব্যক্তির ক্ষমতা হবে বেশী। কেননা, সে ক্ষেত্রে তার ক্ষমতার উৎস হচ্ছে সম্পদ, অফিসিয়াল মর্যাদা এবং জনপ্রিয়তা।

সামাজিকীকরণ ব্যবস্থা

গ্রামের পরিবার, বিদ্যালয়, মক্তব মসজিদ ইত্যাদি শিশুদের সামাজিকীকরণের কাজ করে থাকে। নগর জীবনে পরিবার ভেদে এবং স্কুল ভেদে সামাজিকীকরণের যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায় গ্রামে তেমনটি দেখা যায় না। গ্রামীণ বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলে মেয়েরা প্রায় একই ধরণের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান তথা সামাজিক-সাংস্কৃতি ও মুল্যবোধের মাধ্যমে সামাজিক সদস্যে পরিণত হয়। ফলে গ্রামের কিশোর, যুবক বৃদ্ধাদের আর্থিক মর্যাদা বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটি সামাজিক মানসিক ঐক্য বা সমজাতীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

আচার অনুষ্ঠান

সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের পারিবারিক সম্পর্ক এবং তাদের ভূমিকা ও কার্যাবলী ঐ সমাজের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠে।

বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের এমন কিছু সামাজিক আচার অনুষ্ঠান রয়েছে যেখানে সবাই কম বেশী অংশগ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে গ্রামবাসী তাদের সংহতি বজায় রাখে। যেমন, জন্মদিন, নামরাখা, অন্নপ্রাশন, খতনা, বিবাহ, মৃতের অন্তেষ্টিক্রিয়া, মরণোত্তর ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির সময় গ্রামবাসী সবাই নতুবা গ্রামের বিভিন্ন দল অংশ গ্রহণ করে। যদিও মাঝে মধ্যে কিছু কিছু অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে দলাদালির বা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, তথাপি দলের মধ্যে বা গ্রামের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করাও ঐ সব অনুষ্ঠানের অন্যতম কাজ।

গ্রাম সমাজের স্তরবিন্যাস

বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের কাঠামো মূর্ত হয়ে উঠে তার সামাজিক স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে গ্রাম ভেদে এই স্তরবিন্যাস বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। যেমন একটি হিন্দু গ্রাম বা হিন্দু প্রধান গ্রামের স্তর বিন্যাস জাতি বর্ণের একটি গুরুতপুর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। আবার মুসলিম গ্রামের জাতিবর্ণের ভূমিকাই নেই। মুসলিম গ্রামে অবশ্য বংশ মর্যাদার ভূমিকাকে খাটো করে দেখা যায় না। এছাড়া, গ্রামটি যদি শহরের ধারে কাছে হয় তবে তার স্তর বিন্যাস ও কাঠামো এক রকমের রূপ নেবে, এবং শহ র থেকে দুরে এমন গ্রামের স্তরবিন্যাস ও কাঠামো আবার ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হবে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের অনেক উপাদান রয়েছে। এর মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে জমি, শিক্ষা, ক্ষমতা এবং বংশ মর্যাদার গুরুত্বই সর্বাধিক। এগুলোর মধ্যে প্রথম তিনটিই অবশ্য বেশি গুরুত্বপুর্ণ।

জমির পরিমাণ ও মালিকানার ভিত্তিতে গ্রাম সমাজের স্তরায়ন

বাংলাদেশের যে কোন গ্রাম-সমাজের স্তরায়নে জমির পরিমাণ ও মালিকানার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপুর্ণ। জমির পরিমাণের ভিত্তিতে একটি গ্রামে নিম্মলিখিত শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায় ঃ

ক) ধনী কৃষক (এদের অনেকেই বর্গাদার অর্থাৎ জমির ভাগ চাষীকে দিয়ে চাষ করান)

খ) প্রান্তিক জমির মালিক

গ) বর্গাচাষী বা ভাগ চাষী

ঘ) ভূমিহীন কৃষক মজুর ।

শিক্ষা ও গ্রাম সমাজের স্তরায়ন ঃ গ্রামের সামাজিক স্তরবিন্যাসে শিক্ষাও একটি বিশেষ উপাদান বলে স্বীকৃত । শিক্ষার মান অনুযায়ী গ্রাম সমাজের স্তরায়নের একটি রূপরেখা হলো নিম্নরূপ ঃ

১. নাম দস্তখত পর্যন্ত শিক্ষা
২. প্রাইমারী স্কুল পাশ
৩. হাই স্কুল পাশ (এসএসসি বা মাদ্রাসায় দাখিল ক্লাশ পাশ)
৪. উচ্চ মাধ্যমিক পাশ (এইচ এস সি বা সমমানের মাদ্রাসা পাশ)
৫. স্নাতক ডিগ্রী পাশ (সমমানের অন্যান্য শিক্ষা যেমন ডিপ্লোমা, টেকনিক্যাল ইত্যাদি)
৬. মাষ্টার ডিগ্রী পাশ (সমমানের অন্যান্য ডিগ্রী পাশ, যেমন এম বি বি এস)

ক্ষমতা ও গ্রাম সমাজের সামাজিক স্তরায়ন

বর্তমানকালে শিক্ষার প্রসার ঘটায় এবং পেশায় বৈচিত্র্য আসায় বংশ মর্যাদা তার আগের গুরুত্ব হারাচ্ছে ।

যোগাযোগ ঃ গ্রামবাসীর সংগে গ্রামের বাইরে অন্যান্যদের সম্পর্ক

বাংলাদেশের গ্রাম সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন জনপদ নয় । গ্রামের সংগে গ্রামের বাইরের সম্পর্ক মুলতঃ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক , বাণিজ্যিক , রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ।

বাংলাদেশের নগর সমাজের কাঠামো

বাংলাদেশের নগর সমাজ কাঠামোর আলোচনায় নগরের অর্থনৈতিক অবস্থা, ক্ষমতার বন্টন ও নেতৃত্ব, উৎসব ও আচার অনুষ্ঠান, স্তরবিন্যাস এবং নগরের সংগে নগরের বাইরের অন্যান্য সমাজ ও সংস্থার সম্পর্ক আলোচনা করা যায় ।

নগর সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা

কৃষি জমিই হচ্ছে গ্রামীন সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি । নগরে অবশ্যই জমি ও বাড়ি ঘর অন্যতম সম্পত্তি । তবে সে সংগে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমুহ যেমন , শিল্প কারখানা, ব্যাংক, বীমা, ব্যবসায়ী ফার্ম, বৃহৎ দোকান, শপিং কমপ্লেক্স ক্লিনিক, হাসপাতাল , ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদিও অতি মুল্যবান সম্পত্তি ।

ঐ সব সম্পত্তির কিছু কিছু সামাজিক মালিকানায় থাকলেও অধিকাংশ সম্পত্তিই ব্যক্তি মালিকানায় । ফলে আমাদের নগর সমাজে সম্পদের অসম বন্টন ব্যবস্থা রয়েছে । আর সে কারণেই নগর সমাজে ঐ সব সম্পত্তির মালিকানা ভেদে বেশ কিছু আর্থিক শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষণীয় । সংক্ষেপে বলা চলে নগরজীবনে ঐ সব সম্পদের মালিক শ্রেণী উচ্চ বিত্তের অধিকারী এবং মালিক শ্রেণীসমুহের মধ্যকার আর্থিক অসমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের শ্রেণী প্রতিষ্ঠানের মালিকের সংগে শ্রমিক কর্মচারীর সম্পর্ক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ।

নগর সমাজের ক্ষমতা বন্টন ও নেতৃত্ব

তাত্ত্বিকভাবে বলা যায় যে, দেশের ভোটার জনগোষ্ঠীই হচ্ছে ক্ষমতার উৎস । নির্বাচনের পর মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় মুল বা প্রকৃত ক্ষমতা ভোটার জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সরকারের হাতে ন্যস্ত হয় । অতএব এদিক থেকে বিবেচনা করলে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন ভোটার জনতা কর্তৃক অর্পিত সকল ক্ষমতার মালিক তথা প্রতীক ।

ক্ষমতা বন্টিত হয় বেসামরিক আমলাদের মধ্যে । সেখানে সেক্রেটারী থেকে শুরু করে জয়েন্ট সেক্রেটারী , ডেপুটি সেক্রেটারী, এসিসটেন্ট সেক্রেটারী ইত্যাদির মধ্যে ক্ষমতা মাত্রানুয়ায়ী বন্টিত হয়ে থাকে । সারা দেশে বেসামরিক আমলারা সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে ক্ষমতা ব্যবহার করেন। সেক্রেটারিয়েট ভবনের উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, থানা নির্বাহী অফিসার ইত্যাদি পদাধিকারীগণ সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন ।

আমাদের নগর সমাজের ক্ষমতা তিনটি স্তরে বন্টিত । এগুলো হচ্ছে ঃ

১) শাসক এলিট

২) অশাসক এলিট

৩) সাধারণ চাপ সৃষ্টিকারী দল

শাসক এলিট বলতে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশেষ করে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের উর্ধ্বতন কর্মচারী শ্রেণীকে বুঝায় । মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ শাসন, বিচার ও আইন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ সমন্বয়ে শাসক এলিট শ্রেণী গঠিত হয় ।

অশাসক এলিট বলতে রাজনৈতিক দলের নেতা এবং উহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে বুঝায় যারা সরকারী নীতির গঠনমুলক সমালোচনা করেন এবং আগামীতে ক্ষমতা অর্জনের জন্য স্ব স্ব দলের পক্ষে জনমত গঠন করেন । এই শ্রেণীর এলিটগণ রাজনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তথা গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যান ।

সাধারণ চাপ সৃষ্টিকারী দল বলতে ঐ সব দলকে বুঝায় যে সব দল হয়ত আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতি করেনা, তবে এরা দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ সচেতন এবং মাঝে মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার বা মৌলিক অধিকারে বিশেষ বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে মতামত প্রকাশ করেন, বিবৃতি দান করেন । এদের বিবৃতি সরকার রাজনৈতিক দল, জনসাধারণ , এমনকি বিদেশী রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের উপর বিশেষ প্রভাব রাখে ।

নগর সমাজের উৎসব ও আচার অনুষ্ঠান

আমাদের নগর সমাজে পারিবারিক আচার অনুষ্ঠান যেমন জন্মদিন, নামরাখা, খাতনা, ধর্মীয় উৎসব, বিবাহ, বিবাহ বার্ষিকী, মৃত্যু ও মরণোত্তর অনুষ্ঠানে রক্ত সম্পর্কের এবং বৈবাহিক জ্ঞাতি ছাড়াও সহকর্মী এবং বন্ধু বান্ধবেরা অংশ গ্রহণ করে । অনুষ্ঠান ও উৎসবের আয়েজন নির্ভর করে আর্থিক সংগতি, শখ এবং আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধব সহকর্মীদের সাথে আন্তঃ সম্পর্কের জনপ্রিয়তার উপর । জাতীয় উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের কয়েকটি রূপ রয়েছে । এটি জনগণের জন্য উন্মুক্ত । যেমন ২১ ফেব্রুয়ারী, শহীদ দিবস , জাতীয় দিবস বা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান । এভাবে নানা উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধামে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয় । পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে । বস্তুতঃ নগর সমাজের কাঠামো রচনায় নগরবাসীর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষভাবে কাজ করে ।

নগর সমাজে ব্যক্তির সংগে গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান এবং গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পরে কার্যকারণ সুত্রে আবদ্ধ । বিভিন্ন ক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ই হলো নগর সমাজ কাঠামোর ভিত । এখানে উল্লেখ্য যে, নগর সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্ক গ্রাম সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের চেয়ে বেশি আনুষ্ঠানিক এবং অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রত্যক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিক ।

নগর সমাজের স্তর বিন্যাস

সম্পত্তির পরিমাণ ও মালিকানাভেদে নগর সমাজের স্তরায়ন ঃ সম্পত্তির পরিমাণ তথা আয়ভেদে নগর সমাজে যে সব শ্রেণী বর্তমান তাদেরকে একভাবে দেখানো যেতে পারে । যেমন -- ১) উচ্চবিত্ত ২) উচ্চমধ্যবিত্ত ৩) মধ্যবিত্ত ৪) নিম্ম-মধ্যবিত্ত ৫) নিম্মবিত্ত ।

ক্ষমতার ভিত্তিতে নগর সমাজের স্তরায়ন ঃ নগর সমাজ কাঠামোর ক্ষমতা তিনটি ক্ষেত্রে অসমভাবে বন্টিত । যেমন
১) শাসক এলিট ২) অশাসক এলিট এবং ৩) সাধার চাপ সৃষ্টিকারী দল সমুহ ।

শিক্ষার ভিত্তিতে নগর সমাজ স্তরায়ন

নগর সমাজ স্তরায়নে শিক্ষার ভূমিকা বেশ সুস্পষ্ট । শিক্ষার তারতম্যের ফলে বিভিন্ন ধরণের পেশাদার তথা চাকুরীজীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে ।

নগরের সঙ্গে অন্যান্য সমাজের সম্পর্ক

নগর সমাজ বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয় ঃ নগর সমাজের নানা পেশা ও শ্রেণীর মানুষ পেশাগত কাজকর্ম করতে গিয়ে এবং নানা উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধামে নগর পরিমন্ডলে পরস্পর এক যোগসূত্র স্থাপন করে । এছাড়া নগর সমাজের বাইরেও তারা নানা কাজ কর্মের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে ।

উপজাতীয় সমাজ কাঠামো

বাংলাদেশে উপজাতির সংখ্যা প্রায় ২৫/৩০ টির মত । প্রতিটি উপজাতিরই নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে । রয়েছে প্রতিটি উপজাতির নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা তথা সমাজ কাঠামো । উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, গারো উপজাতির মধ্যে মাতৃ প্রধান, মাতৃসুত্রীয় এবং মাতৃবাস প্রথা লক্ষ্য করা যায় । অথচ চাকমা উপজাতি ঠিক এর বিপরীত রীতি অনুসরণ করে । কোন কোন উপজাতি এখনও জুম চাষের উপর নির্ভরশীল, কোনটা আবার হাল চাষ এবং ফলমুল চাষের উপর নির্ভরশীল । তাই উপজাতীয় সমাজ সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা ছাড়া ঐ সমাজের কাঠামো বিশ্লেষণ সম্ভব নয় । এ জাতীয় নৃতাত্ত্বিক গবেষণামুলক কাজ অন্যান্য উপজাতি সম্পর্কেও হওয়া প্রয়োজন । কেননা, এক একটি উপজাতির সমাজ কাঠামো এক এক বৈশিষ্ট্যের । তবে উপজাতীয় সমাজের কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করতে হলে যে সব বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া যেতে পারে ।

জাতি বর্ণভিত্তিক পেশাদার গোষ্ঠী

বাংলাদেশে কামার,কুমার, তাঁতী, ছুতার, জেলে, তেলী, ঘোষ, গোয়ালা, ধোপা, নাপিত, মেথর, হাজাম, স্বর্ণকার, রৌপ্যকার ইত্যাদি অনেক জাতিবর্ণ ভিত্তিক গোষ্ঠী রয়েছে যারা বংশ পরম্পরায় পৈত্রিক পেশা অবলম্বন করে এখনও ক্ষয়িষ্ণু দশায় টিকে আছে । এসব পেশাদার গোষ্ঠির অধিকাংশই বাঙ্গালী হিন্দু । ফলে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির দিকে থেকে অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদের বেশ কিছুটা মিল পরিলক্ষিত হয় । তবে প্রতিটা পেশাদার গোষ্ঠিরই নিজস্ব পেশা ও সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে । রয়েছে প্রত্যেকের নিজস্ব সমাজ কাঠামো ।

প্রতিটি উপজাতির যেমন রয়েছে নিজস্ব সমাজ ও সমাজ কাঠামো তেমনি ঐসব পেশাদার গোষ্ঠির রয়েছে আলাদা সমাজব্যবস্হা ও সমাজ কাঠামো। পেশাদার গোষ্ঠি তাদের স্ব স্ব পেশা পালনের দ্বারা বৃহৎ বাংলাদেশের সমাজের সঙ্গে কার্যকারণ সুত্রে আবদ্ধ। ঐ সব পেশাদার গোষ্ঠির বেশি ভূসম্পত্তি প্রয়োজন হয় না। তারা তাদের স্ব স্ব পেশার কাজের কৌশলগুলো বংশ পরম্পরায় শিখে নেয় এবং দক্ষ হাতের কৌশল এবং সামান্য কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে। ঐ সব গোষ্ঠি বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর অপরিহার্য অঙ্গ। কেননা, ঐ গোষ্ঠিগুলো বৃহৎ সমাজের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। অর্থাৎ পেশাদার গোষ্ঠি হিসেবে তারা অন্যান্যদের সঙ্গে প্রধানতঃ আর্থ-সামাজিকভাবে সম্পর্কযুক্ত।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ কাঠামো, নগর সমাজ কাঠামো, উপজাতি সমাজ কাঠামো এবং জাতিবর্ণ ভিত্তিক পেশাদার গোষ্ঠির সমাজ কাঠামোর মধ্যে যোগসুত্রের যে বন্ধন রয়েছে তা গোটা বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো রূপায়নে সাহায্য করে। কেননা উপরোক্ত সব সমাজই অন্য সব সমাজের সঙ্গে একটা কার্যকরণ সুত্রে আবদ্ধ।

সামাজিক সচলতা

ব্যক্তিগতভাবে পারিবারিক ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাসের নিম্মতর স্তর হতে উচ্চতর স্তরে আরোহন অথবা এক বৃত্তি ছেড়ে অন্য বৃত্তি গ্রহণকে সামাজিক সচলতা বলে। মুক্ত সমাজে সচলতার হার বেশী, আবদ্ধ সমাজে তা একেবারে সীমিত। কতকগুলো বহির্ঘটনার উপরেও সচলতার হার নির্ভর করে। যুদ্ধের সময় অনেকের ভাগ্য ফিরে যায়। যেমন, যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতকারীদের, বিশেষ করে একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের। অনেকে আবার, যেমন নির্দিষ্ট আয়ভোগীরা, জীবন যাত্রা স্তরে শ্রেণীচ্যুত হয়ে নিম্মস্তরের অন্তর্ভুক্ত হন। হয়ত বা পাকা বাড়ী ত্যাগ করে কুটিরে আশ্রয় নেয়। সচলতার প্রশ্নটি শুধু যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সামাজিক স্তরে উঠানামার প্রশ্ন তা নন। অধ্যাপক টিউসিন এই বিষয়টিকে ছয়টি দিক দিয়ে আলোচনা করেছেন।

যথা- ১। উর্দ্ধগতি, অধোগতি এবং অনুভুমিক সচলতা। এই সচলতা জাতি সাপেক্ষ আর্থাৎ উর্দ্ধগতি, অধোগতি বা অনুভুমিক অবস্হিতির উপর নির্ভরশীল।

২। আর এক প্রকার সচলতা আছে তা হল কাল সাপেক্ষ যেমন - একপুরুষ হতে আর এক পুরুষের সচলতা কিংবা একই পুরুষের মধ্যে পেশা বা বৃত্তির পরিবর্তনের সচলতা কিংবা এক বা একাধিক পুরুষের মধ্যে সময় সাপেক্ষে যে সচলতা অনেকে বংশানুক্রমিক পেশা বা বৃত্তি ত্যাগ করে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করেন। অনেকে স্বাধীন ব্যবসা ত্যাগ করে বেতন ভোগী কর্মচারীর পদ গ্রহণ করতে পরেন।

৩। তৃতীয় প্রকার সচলতাকে প্রাতিষ্ঠানিক সচলতা বলা যায় । শিক্ষাজনিত সচলতা অর্জন করা যায় প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মনিয়োগ বা কর্মনৈতিক যে ব্যবস্থা হয় , নানাবিধ প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রশাসনিক কর্মবিন্যাসে অথবা নির্বাচনের মাধ্যমে নানাবিধ পদমর্যাদালাভের যে সকল সুযোগ ও সুবিধা হয় এইরূপ পরিবর্তনকে প্রাতিষ্ঠানিক সচলতার পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে ।

৪। আর এক অবস্থায় সচলতার প্রশ্নটি বিচার করা যেতে পারে । নানা উপায়ে মানুষ সমাজের এক স্তর হতে আর এক স্তরে উন্নীত বা অবনত হতে পারে । যেমন - উচ্চতর মর্যাদা আরোপিত বা অর্জিত হতে পারে । অনুরূপ কারণে মর্যাদার হ্রাস বা অবলুপ্তি হতে পারে । বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হলে উচ্চতর কর্মসংস্থানের সুবিধার অধিকারী হওয়া যায়

৫। সচলতার প্রশ্ন বিচারে ব্যক্তি, গোষ্ঠি, পরিবার, শ্রেণী বা গোষ্ঠি তথা সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করতে হবে ।

৬। পরিশেষে সচলতার আর একটি বাস্তব দিক আছে, যেমন, অনেক সময় দেখা যায় যে প্রার্থীর বর্তমান পদে বেতন কম হলেও সে জন্য এক পদের অধিকতর বেতনের লোভ পরিহার করেছে , কারণ অধিকতর বেতনের কর্মটি তার মনের মত নয় । কর্মটির স্বপক্ষে সম্মতি, জনমত কিম্বা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা প্রতিবেশী মহলের অনুমোদন আছে কি না তাও সচলতাকে প্রভাবিত করে । এসব স্থলে মানসিক শান্তি- অশান্তির প্রশ্ন বিবেচনা যোগ্য ।

এছাড়া সমাজের বৃহত্তর পরিসরের পরতে পরতে নানান ধরণের সামাজিক সচলতা রয়েছে । বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ছয় ধরণের সচলতাসহ অন্যান্য সচলতা কম বেশী বিদ্যমান ।

গ্রন্থপঞ্জী

১. Tom Botomore, Sociology: A Guide to Problem and Literature, 3rd Ed. London, Allen & Unwin, 1987.

২. সেন, রংগলাল, সামাজিক কাঠামোর তত্ত্ব ও তার প্রত্যয়গত সমস্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, দশম সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৬, ডিসেম্বর ১৯৭৯।

৩. সেন, শ্রী খগেন্দ্রনাথ, সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা, ১ম খন্ড (১ম ও ২য় ভাগ), বিদ্যা, এ ৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭।

Rural Power-Strcture : Short note

M. Salimullah Khan

Professor, Jahangirnagar University

Introduction :

Rural power-structure is a complex process. This is complex because of its pattern, method of operation and network of relations. In rural politico-ideological powers, these complexities are seen in both informal (hierarchical settings of the society) and formal organizations, i.e., Union Parishads, Co-operatives, government and non-government sponsored developement activities. All their apparatuses (formal and informal) are interlinked with the national power-structure. Thus any analysis of the rural power-structure must be considered in the widen Context of the interconnections between society/classes in the village and the social base of the state in Bangladesh.

Rural Power-Structure : an interesting area of research for political Scientists, sociologists and anthropologists, literature on theoretical perceptions and case-studies are available: Bertocci, 1970; Nicholas, 1973; wood, 1976, BKJ, 1982, and others , to name only a few.

Conceptual terms : Rural Power elite/rural conglouenats/rural tycoons/petty plutocrats.

Class characteristics and social formation : relationship between landholding, status and class: high status lineage; middle status low status lineage, kinship links-rich peasants with less status are incorporated into the traditional institutions of local power-structure.

Forms of social status:

- Traditioal high status (sector)- *Miah, Sarder, Gazi,* etc.
- Traditional high status (religious) - *Mullah, Moulana,* etc.
- Occupational titles (*Bepari, Sadagar,*) etc.
- Personal titles (*Fakir* etc.)

Social Processes :

- Tradiational lineage system
- Religious sanctions
- The syndrome of economic superiority and dependence (Patron- Client relationship)
- The social structure of formal education (teacher-pupil)
- The internal structure of *Bari* (Household) and *Paribar* (Family) (domination based on age, sex, education, earning power)
- Interactions among individuals for mutual benefits (leader, friends of equal status clients and brokers)

Indication of power and status : wealth (Landownership), income, occupation, education, reputation, social participation and various linkages. Access to formal authority who own these resources.

Forms and means of linkages:

- Social (relatives in urban areas)
- Political (national power-structure)
- Bureaucracy (development program)
- Urban education, elite professions, intermediary work and file in service.

Pattrns of rural leadership

- Union Parishad administration from historical perspective;

Village Panchayat; Permanent Settlement Act, 1973; Chawkideri Panchayat Act, 1870; Rural Self Government Act, 1885; Roual Commission on Decentralization, 1407; Village Self Government Act, 1919. Basic Democracies Ordinance 1959; Changes since 1971 (Bangladesh Period).

Process recruitment: Aspective and achieved criteria.

Demographic Charactaristics : Age, educations, occupation, landownership and income, structure of family, structure of the house, use of agricultural inputs experiences, election expenditure, socio-cultural affiliation.

-- Attitudes, beliefs and values, use of religion, and political and social affairs.

Traditional authoritarianism has been shattered in rural Bangladesh. A new middle class has emerged. A new-power-structure is emerging in the rural hierarchy. They are more enlightened than their predecessors. Occupational status is also changing from a traditional agrarian society to a business and professionalized one. Over the years there have been much changes in personal leadership but leadership from this emerging middle class as a whole has not been changed at all. This gives idea to a new conflict in the rural power hierarchy; conflict between tradition and mordernity; conflict between liberalism and terrorism.

The socio-economic relationship within the village is not conductive to the poor peasants. This is an usual phenomenon in the Underdeveloped areas. The existing system in South Asian Countries in most cases has been unable to circumvent the power of rather of farmer; rather it has provided on additional statutory framework within which they can consolidate their class superiority domination. In Bangladesh, as researcher indicate (Atiar,

1992; Ameerul, 1976), all regimes since indepedence have patronized, petty plutocrats who compose the wysials of rural power-structure. So the village cannot be democratized without democratizing property relations (Banington Moorr, 1969).

Rural Bangladesh, as we have noted earlier, is gradually changing from traditional to the process of modernization, new classes are emerging in the rural hierarchy. Such change in the patern of leadership over the years will be an indicator of what form of development will be realized in the case of Bangladesh in near future.

Suggested readings:

1. Burhanuddin Khan Jahangir, Rural Society, Power Structure and class practice, 1982.
2. M. Ameerul Huq(ed.), Exploitation and the Rural Poor, 1976.
3. M. Salimullah Khan, "Pattern of leadership in Bangladesh Villages", Jahangirnagar Review No.2, 1978.

গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন

ম, ইমামুল হক

বাংলাদেশ মুলত একটি গ্রামভিত্তিক দেশ। আটষট্টি হাজার গ্রাম নিয়েই এর পরিধি বিস্তৃত। মোট আয়তনের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ 'শহর এলাকা' (Urban Area) হিসেবে গণ্য হচ্ছে। বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের ক্রমধারায় আজ একটি বিষয় চরম সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়েছে - তা হচ্ছে, শস্য-শ্যামলিমায় ভরা সুবিস্তৃত গ্রামের হাতছানিকে পিছনে ফেলে মানুষ স্রোতের মতো গ্রাম থেকে শহরে ভিড় জমাচ্ছে।

দিনের পর দিন অপ্রতিহত গতিতে গ্রাম থেকে মানুষের এই স্থানান্তর বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর ভারসাম্যকে গভীরভাবে নাড়া দিচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে - গ্রাম থেকে করা আসছে ? কেন আসছে ? এবং পারিবারিক, গ্রামীণ, সামাজিক, ভৌগলিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া কি ?

গ্রামীণ সমাজের সহজ, সরল জীবনের হাতছানি, আত্মীয় স্বজনের সকরুণ দৃষ্টি আর চৌদ্দ পুরুষের ভিটে -মাটির মমতা তাদের ধরে রাখতে পারছে না। সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন মুখে তুলতে পারলেই যারা খুশী, বিলাস-বাসনের হাতছানি কোনদিন যাদের প্রলুব্ধ করেনি, তারা কিসের মোহে নিজেদের জন্মস্থান ছেড়ে শহরে চলে আসছে ? কারণ সুস্পষ্ট। গ্রামের মানুষ শহরে আসছে জীবিকার সন্ধানে। বিস্তির্ন ফসলের মাঠ ওদের জীবিকার সংস্থান করতে পারছে না। বছরের পর বছর দারিদ্রের সংগে তারা সংগ্রাম করছে। অর্ধাহারে -অনাহারে কাটছে তাদের জীবনের সুন্দরতম দিনগুলো। দারিদ্রকে বরণ করেও গ্রামের মানুষ নিজেদের ভিটে মাটি আকঁড়ে পড়ে থাকতে চায়। কিন্ত সর্বনাশা ক্ষুধার করালগ্রাসে দিনে দিনে ক্ষয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের রোগা পান্ডুর দেহের দিকে তাকিয়ে একদিন কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। পরাজিত ভীরু শশকের মতো রাতের অন্ধকারে তারা একদিন পাড়ি জমায় শহরের দিকে আজন্ম লালিত জীবনের ভিটে মাটি ছেড়ে।

গ্রাম থেকে শহরে আসার এই প্রবনতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। রাজধানী ঢাকার দিকে তাকালেই এর সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এখানে প্রতিনিয়ত যে বিব্রতকর দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে, তা হচ্ছে- রাস্তাঘাটে অজস্র লোকের ভিড়। সর্বত্র গিজ গিজ করছে অসংখ্য মানুষ, ফুটপাতে পায়ে পায়ে মানুষ, ফেরীওয়ালা, ভিক্ষুকের সারি, বিপনী কেন্দ্রে এবং বাজারে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা, বাসে ঠাসাঠাসি হয়ে বাদর ঝোলা ঝুলছে মানুষ। শহরাঞ্চলে দিনে দিনে তাই প্রকটভাবে দেখা দিচ্ছে আবাসিক সমস্যা, বাড়ি ভাড়া বেড়ে চলেছে জ্যামিতিক হারে। সুউচ্চ ইমারতের পাশে, রেল লাইন ও সড়কের ধারে খেয়াল

খুশীমতো গড়ে উঠছে 'বস্তী' । দিনে দিনে এই সীমানা শহর ছাড়িয়ে চলেছে শহরতলী পর্যন্ত । সবকিছুর কারণ একটাই । 'মাইগ্রেশন'- গ্রাম থেকে শহরে । ধরা যাক ঢাকা শহরের কথা, লোক সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে , আর বাড়তি জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ সহ্য করার ক্ষমতা এই ছোট রাজধানী শহরটির নেই । প্রতিদিন মানুষ বাড়ছে । বাধঁ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো পাহাড়ী ঝর্ণার বেশে যেন দুকুল ছাপিয়ে আসছে অবিরাম জনস্রোত । প্রতিদিন আসছে শত শত, হাজার হাজার। পাল্টে যাচ্ছে শহরের চেহারা, জীবনযাত্রা, পরিবেশ । বাস টার্মিনাল, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, কমলাপুর রেল ষ্টেশন এর নীরব সাক্ষী । শুধু ঢাকা কেন বাংলাদেশের প্রতিটি শহরের কমবেশী একই অবস্থা ।

এ ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশের জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং পাশাপাশি একই সময়ে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান তুলে ধরতে পারি ।

চিত্র-ক

সময়কাল	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (প্রতি হাজারে)	
	জাতীয় বৃদ্ধির হার	শহর এলাকায় বৃদ্ধির হার
১৯০১-১৯১১	০.৮৭	১.৩৯
১৯১১-১৯২১	০.৫৩	০.৮৪
১৯২১-১৯৩১	০.৬৮	২.০০
১৯৩১-১৯৪১	১.৬৫	৩.৫৯
১৯৪১-১৯৫১	০.০০	১.৬৮
১৯৫১-১৯৬১	১.৯২	৩.৭২
১৯৬১-১৯৭৪	২.৬৫	৬.৭০
১৯৭৪-৮১	২.৩৬	১১.০০

এই পরিসংখ্যান থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বাংলাদেশ গ্রাম থেকে শহরে মানুষের মাইগ্রেশন কত বেশী হয়েছে । ১৯০১ সালে জাতীয়ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৮৭% ভাগ এবং ১৯৮১ সালে এই বৃদ্ধির হার ছিল ২.৩৬% ভাগ । অর্থাৎ প্রায় দেড় গুণ মাত্র । অপরদিকে ১৯০১ সালে শহর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৩৯% এবং ১৯৮১ সালে এই বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১১.০% ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৯ গুণ । তাছাড়া সামগ্রিক জনসংখ্যার পরিমাণকে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে দেখতে পাবো ১৯০১-১৯৮১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ গুণ । অন্যদিকে ১৯০১ সালে শহর এলাকায় লোক সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ, ১৯৮১ সালে এই সংখ্যা দাড়াঁয় ১ কোটি ৩০ লক্ষ অর্থাৎ ২০ গুণ ।

সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, গ্রাম থেকে যারা আসছে তারা কোন স্তরের ? কোন পেশার ? সমীক্ষা চালিয়ে দেখাগেছে এদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ হচ্ছে তারা যারা চাকুরী উপলক্ষে, ব্যবসায়িক প্রয়োজন , অথবা অনুরূপ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে শহরে আসেন । এদের একটা

অংশ পরিবার -পরিজন নিয়ে শহরে বাস করেন । আবার এমনও দেখা যায়, তাদের বৃহৎ পরিবারের আবশিষ্ট অংশ গ্রামেই থাকেন । শহরে তাদের অবস্থান মুলতঃ অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে , এবং সেই লক্ষ্যও হচ্ছে পরিবারের গ্রামীন বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করা । গ্রামের সাথেই এদের সম্পর্ক মূখ্য । শহরে এরা প্রবাসী । আবার এমন বিত্তবান পরিবারও রয়েছে, যারা মুলতঃ গ্রাম থেকে আগত এবং যারা দিনে দিনে গ্রামের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে স্থায়ীভাবে শহরবাসী হয়ে গেছেন । তাছাড়া ব্যবসায়িক প্রয়োজন, অফিস সংক্রান্ত কাজ ও অন্যান্য প্রয়োজনে প্রতিদিন শহরে আসা ও সামগ্রিক ভাবে অবস্থানকারী ভাসমান লোকের সংখ্যাও নেহাত কম নয় ।

তবে অধুনা শহরের উপর জনসংখ্যার যে ক্রমবর্ধহান চাপ অনুভূত হচ্ছে, সেই জনগোষ্ঠির একটি বিপুল অংশ হচ্ছে গ্রাম থেকে শহরে আসা বিত্তহীন পরিবার । এদের অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক । এদের কেউবা পিতৃপুরুষের ভিটে-মাটি বিক্রি করে পরিবারের শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে শহরে আসে জীবিকার সন্ধানে ।

আর একটি সত্য যে, শহরমুখী জনস্রোতের এক বিরাট অংশ আসে নদী ভাঙ্গনের অসহায় শিকার হয়ে । নদীর করাল গ্রাসে জমি জমা এমনকি বসত ভিটে পর্যন্ত হারিয়ে - প্রাণে বেঁচে থাকার কঠিন তাগিদে নিঃস্ব অবস্থায় স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে তারা শহরে আসে । এসব বিত্তহীন লোকদের অবস্থার দিক থেকে প্রধানতঃ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে । এদের একটি অংশ হচ্ছে যাদের গ্রামে কোন জমি জমা নেই, শুধুমাত্র বাস্তুভিটা ও কুড়েঁ ঘরখানা টিকে আছে । এদের অনেকেই গ্রামে নিকট আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে বাড়িটি রেখে জীবিকার সন্ধানে শহরে এসেছে । এসব লোক মাঝে মধ্যে গ্রামের বাড়ীতে চলে যায় এবং কয়েকদিন বা কয়েকমাস অবস্থান করে পুনরায় শহরে ফিরে আসে । গ্রামের সাথে তাদের যোগাযোগ মোটেও বিচ্ছিন্ন নয় । দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে ঐসব বিত্তহীন শ্রমজীবী পরিবার, গ্রামে যাদের রয়েছে শুন্য বাস্তুভিটা । পিতৃপুরুষের প্রতি মমতাবোধের কারণে শেষ পর্যন্তও তারা তা বিক্রি করতে পারিনি । গ্রামের সাথে এদের সম্পর্ক গৌণ হলেও বিচ্ছিন্ন নয় । বছরে দু'একবার তারা গ্রামের বাড়ীতে যায়, আত্মীয়দের বা প্রতিবেশীদের বাড়ীতে উঠে । বাল্যকালের স্মৃতি রোমন্থন করে আর শুন্য ভিটেতে ফিরে আসার সামর্থ্য খুঁজে ফেরে । তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে ঐ সব বিত্তহীন মানুষ-যাদের কিছুই নেই - শুধু দু'টি কর্মঠ হাত আর পা ছাড়া । শ্রমের নিশ্চয়তা না পেয়ে শুধু কাজ করার একটু নিশ্চয়তার প্রত্যাশায় এরা আজ শহরমুখী ।

প্রতিক্রিয়া ঃ গ্রামে - কর্মসংস্থান ও জীবিকার সন্ধানে যে সব বিত্তহীন মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে, তারা শুধু যে গ্রামে তাদের ব্যর্থতার স্মৃতিচিহ্ন রেখে আসে তাই নয়, গ্রামীণ জীবনের অখন্ডতায় তারা বপন করে দেয় অস্থিরতার বীজ । শহরে তাদের কর্মসংস্থান ও স্বাচ্ছন্দের সংবাদ সাময়িকভাবে অস্থির করে তোলে গ্রামের ঐসব বিত্তহীন পরিবারকে যারা বছরের পর বছর দারিদ্রের

সঙ্গে সংগ্রাম করে পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটে ছেড়ে জীবিকার কারণে শহরে আসার কথা কোনদিন চিন্তাও করেনি। এই ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা দিনে দিনে গ্রামের মানুষকে শহরমুখী করে তুলেছে।

গ্রামে কর্মসংস্থানের অভাবে বিত্তহীন শ্রমজীবী মানুষ শহরে পাড়ি জমালেও এ কথা বলা যায় না যে, গ্রামে তাদের প্রয়োজন একেবারেই ছিল না বা ফুরিয়ে গেছে। কৃষিকাজ এবং অন্যান্য উৎপাদমুখী অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্মে গ্রামের শ্রমজীবি মানুষের প্রয়োজন রয়েছে সত্যি কিন্তু এই প্রয়োজন সারা বছর ধরে একই রকম নয়, যেমনটি রয়েছে শহরে। গ্রাম সারা বছর একনাগারে তাদের কর্মের নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ বলেই- তারা শহরমুখী হচ্ছে। অধিকন্তু যে পরিমান কাজ গ্রামে রয়েছে তাতে মজুরী শ্রমের তুলনায় কম এবং তাদের পারিবারিক প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রতুল। একদিকে বছরের প্রায় অর্ধেক সময় কর্মহীনতা এবং অপরদিকে কর্মের মজুরীর হ্রাসকৃত হার তাদের শহরমুখী হতে বাধ্য করছে। এই সব শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক হারে শহরে চলে আসার ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ড দিনে দিনে স্তিমিত হয়ে আসছে। চাষাবাদের মৌসুমে বরাবরই কৃষি শ্রমিকের অভাবে কৃষিকাজ বিঘ্নিত হতে দেখা যায়। তাছাড়া কৃষি শ্রমিকের অভাবহেতু অনেক সময় শ্রমিকের মজুরী অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি শ্রমিকের অভাবহেতু শ্রম মজুরী বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষুদ্র কৃষকগণ প্রয়োজন মোতাবেক শ্রমিক নিয়োগ করতে ব্যর্থ হন, যারফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর কুফল ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে।

এটাও হয় যে চাষাবাদের মৌসুমে কিছু কিছু লোক সাময়িকভাবে শহর থেকে গ্রামে এসে কৃষি কাজে শ্রম দেয় বলেই শহরমুখী জনস্রোতের প্রতিক্রিয়া অনেক সময় খুব সুস্পষ্ট উপলব্ধিতে আসছে না। তবে গ্রামে শ্রমজীবী মানুষের অভাবজনিত ক্ষতিটি কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতিতে দিনে দিনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলেছে। এই ক্রম অবক্ষয় প্রতিদিনই আঘাত করে চলেছে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তিমুলে আর সেই আঘাত গোটা দেশের অর্থনীতিকেই পংগু করে দিচ্ছে। পাশাপাশি সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটছে।

প্রতিক্রিয়া ঃ শহরে ঃ শহরমুখী এই জনস্রোতের ফলে শহরের উপর জনসংখ্যার অস্বাভাবিক চাপের যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, সেটা হলো শহরে খাদ্য দ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে নিয়ন্ত্রণহীন অসংগতি, ফলে ঘটছে লাগামহীন মুল্যবৃদ্ধি। দ্বিতীয় সমস্যাটি হচ্ছে - আবাসিক। চাকুরী ও ব্যবসা উপলক্ষ্যে যারা শহরে আসছে- তারা দিনে দিনে প্রকট করে তুলেছে মধ্যবিত্তের আবাসিক সমস্যা। বাসস্থানের অভাবে বেড়ে চলেছে বাড়ি ভাড়া। বিত্তহীন শ্রমজীবি মানুষের অধিকাংশ বস্তীতে ঠাঁই নিলেও - তাদের একটি অংশ অন্ততঃ শহরে নিম্ম মধ্যবিত্তদের আবাসিক সমস্যা ঘটাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বস্তীর চেয়ে এক ধাপ বা দু'ধাপ উচ্চ পর্যায়ের বাড়ীর ভাড়া গত কয়েক বছরে ৫/৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তৃতীয় সমস্যাটি হচ্ছে - 'পরিবেশগত' । মুল শহরের বস্তী এলাকার পুরো চেহারাটাই প্রতিনিধিত্ব করছে নোংরা আবর্জনাপুর্ণ রোগ জীবাণুর উৎসের । পরিবেশ দুষণের যতরকম উপকরণ আছে, তার সবগুলোই সেখানে উপস্থিত । পরবর্তী সমস্যাটি হচ্ছে - সামাজিক, শহরে বস্তি এলাকাগুলো ক্রমাগতই নানাবিধ অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের চারণভূমিতে পরিণত হচ্ছে । শহরে দিনে দিনে যে অপরাধ বেড়ে চলেছে তার একটা অংশ জন্ম নিচ্ছে এই বস্তিগুলোকে কেন্দ্র করে । বস্তির উঠতি বয়সের তরুণ ছেলেরা শহরে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকলেও এদের একটা বিরাট অংশ শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাবে দিনে দিনে অপরাধমুলক কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে । শহরে ছিচঁকে চুরি, পকেট কাটা, রেলওয়াগন থেকে মাল চুরি, ম্যানহোলের ঢাকনা, রাস্তার বাঁশ, তার চুরি ষ্টেশন যাত্রীদের মালপত্র চুরি, এমনকিছু অপরাধের সঙ্গে এরাই বেশীরভাগ জড়িত । এদের একটা অংশ রীতিমত পেশাদার পকেটমার রূপেও নিয়োজিত ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাপত্রে প্রকাশিত এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তরফ থেকে প্রাপ্ত অপরাধ পরিসংখ্যান থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, শহরে বিভিন্ন বাড়ীতে সংঘটিত চুরি, প্রতারণা, ছেলে ধরা, খুন, জখম এবং বহুবিধ অঘটনজনিত অপরাধের সঙ্গে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জড়িত রয়েছে বাসা বাড়ির ঝি-চাকর,বাকর, যাদের অধিকাংশ গ্রাম থেকে শহরে এসেছে জীবিকার সন্ধানে বেঁচে থাকার তাগিদে ।

শুধু তাই নয় , এ সব বস্তি এলাকায় সংঘটিত হচ্ছে নানাবিধ অনাচার-পাপাচার ও অসামাজিক ক্রিয়াকান্ড । এগুলোতে রাতে আনাগোনা হয় চরিত্রহীন লম্পট লোকদের, জুয়া ও মদ-তাড়ির আড্ডা জমে, সংঘটিত হয় মেয়ে ঘটিত কেলেংকারি ও যৌনাচার । গ্রাম থেকে উঠে আসা নিম্ম পরিবারের শুচিশুভ্র গৃহবধু ও তরুণীরা এই পরিবেশের প্রভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিপথগামিনী হয় । বস্তিগুলোকে কেন্দ্র করে মেয়ে যোগানদার দালালরা ব্যবসা ফাঁদে ।

সমাধান ঃ অন্যান্য জাতীয় সমস্যার মতো শহরমুখী এই জনস্রোতকেও একটি জাতীয় সমস্যারূপে চিহ্নিত করে এর বাস্তব ও কার্যকর সমাধানে এগিয়ে আসা উচিত । তবে এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এই সমস্যা সমাধানের কোন সর্টকাট বা সংক্ষিপ্ত পথ নেই ।

যদি সমস্যার গভীরে না গিয়ে জোর করে এই শহরমুখী জনস্রোতকে ঠেকানোর প্রয়াস চালানো হয় , তা হলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য । আপাতঃ দৃ ষ্টিতে এই সমস্যা সমাধানের দু'টো পন্থা চিন্তা করা যেতে পারে - (এক) শহরে আগত এই জনগোষ্ঠির পুনর্বাসিনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ও আবাসস্থলের সম্প্রসারণ, যদিও কাজটি দুরহ ও সময়সাপেক্ষ । তদুপরি শহরে কর্মসংস্থান, আবাসিক সুবিধা যতো বাড়তে থাকবে গ্রাম ছেড়ে শহরে মানুষের অনুপ্রবেশ ও দিন দিন ততই বাড়বে । কাজেই এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণে সমস্যাটির সাময়িক সমাধান হয়তো হতে পারে , কিন্তু পরিনামে সমস্যা বাড়বেবৈ কমবে না । (দুই) **শহরমুখী এই জনস্রোতকে ফেরানো** । অর্থাৎ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাতে মানুষ গ্রাম ছেড়ে

শহরে আসার প্রয়োজনীয়তা বোধ করবে না, এবং অন্য দিকে যারাজীবিকার সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে- তারা নতুন করে চিন্তা করবে শহরে ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ার। আপাতঃ দৃষ্টিতে কাজটি দুরুহ মনে হলেও -- এটাই বাস্তব ও স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতে পারে।

এ ব্যাপারে আমাদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে দুটো কেন্দ্রবিন্দুর দিকে -- প্রথমতঃ শহরমুখী জনস্রোতকে প্রতিহত করা, এবং দ্বিতীয়তঃ শহরে আগত ও অবস্থানরত বিত্তহীন শ্রমজীবী মানুষকে গ্রামে ফিরিয়ে দেয়া।

অতএব, উপরোক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে হলে গ্রামে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি এবং সেখানে গ্রামের মানুষের জীবিকার্জনের পরিপুর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক। নিম্নোক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে এ- কাজটি সম্পন্ন করা যেতে পারে ঃ

১. আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চাষাবাদের ব্যবস্থা , কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করণ, সহজ শর্তে কৃষি ঋণ প্রদান, সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষির উন্নতি সাধন করে গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদ সুদৃঢ় করা ;

২. পল্লী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গবাদি পশু ও হাসঁ-মুরগি পালন ও মৎস্য চাষের ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টি ;

৩. গ্রাম্য হাট বাজার উন্নয়ন, বৃহৎ গঞ্জ প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, গ্রামের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যাংক ঋণের সুবিধা সম্প্রসারণ -প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্রিয়কান্ড বৃদ্ধি ;

৪. পল্লী অঞ্চলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপকভাবে কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন করা ;

৫. প্রশাসনিক কাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রাম পর্যায়ে স্বনির্ভর প্রশাসনিক ইউনিট গড়ে তোলা;

৬. গ্রাম শিল্পায়নের লক্ষ্যে বেসরকারী খাতে ক্ষুদ্র, মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শহরতলী এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ সংকুচিত করে পল্লী এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য সকল প্রকার সুযোগ সম্প্রসারিত করা;

পরবর্তী দায়িত্ব অর্থাৎ শহরে আগত ও অবস্থানরত লোকদের দৃষ্টি গ্রামের দিকে ফেরানোর কাজটি অনেকখানি সহজ হয়ে যাবে প্রথম দায়িত্বটি যথাযথভাবে পালনের মধ্য দিয়ে। গ্রামে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ড বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শহরে আগত শ্রমজীবি মানুষের দৃষ্টি নিঃসন্দেহে গ্রামের প্রতি ফিরবে। তাছাড়া বিত্তহীন লোকদের গ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত

করার লক্ষ্যে সরকার ভূমিহীন এইসব শ্রমিকদের মধ্যে খাসজমি-বিশেষত নতুন জেগে উঠা চরাঞ্চল ভূমিহীন পরিবার সমুহকে পরিবারের সদস্য সংখ্যার আনুপাতিক হারে বন্দোবস্ত দিতে পারেন । এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে বিত্তহীন শ্রমজীবী মানুষকে পুনর্বাসন বা গ্রামে ফিরিয়ে দেয়ার কাজটি অতি সহজেই সম্পন্ন করা যেতে পারে ।

তবে একটি কথা- সবকিছুর সফলতার মুলে সরকারের সদিচ্ছা, প্রশাসনের সততা, জনসাধারণের সচেতনতা ও সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে , নতুবা সব পরিকল্পনাই ব্যর্থতার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য ।

শেষকথা- একদিন গ্রামের যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ তাদের সহজ সরল জীবন যাত্রার একটি স্বনির্ভর পরিমন্ডল গড়ে তুলেছিল যারা- করুণার দৃষ্টি মেলে ধরতো শহরের মাস মাহিনায় দিন গোনা মানুষগুলোর প্রতি তারাই আজ শহরকে বেছে নিচ্ছে নিরাপত্তা সুখী জীবন যাপনের আশ্রয়স্থল হিসেবে । বাংলাদেশের মতো একটি গ্রাম প্রধাণ দেশের জন্য এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না । আটষট্রি হাজার গ্রামের এককালের শক্তহাতে লাঙ্গলধরা মানব সন্তানরা জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের মতো পালিয়ে যাচ্ছে - শহরের বস্তিতে । এটা জাতির জন্য কাম্য হতে পারে না । তাই এই মুহূর্তে সর্বাগ্রে করণীয় হচ্ছে , গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন তথা গ্রামে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ড বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির দ্বারা শহরমুখী বিত্তহীন শ্রমজীবি মানুষের দৃষ্টি গ্রামের দিকে ফেরানো - শহরের বস্তির ছিন্নমুল মানুষগুলোকে ফিরিয়ে আনা- তাদের ফেলে আসা গ্রামের স্মৃতি বিজড়িত সাজানো সংসারে - সুখের গভীরে ।

মডিউল-২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কৌশল

শেখ মুস্তাফিজুর রহমান
সহকারী পরিচালক, বিপিএটিসি

ভোজন তালিকায় যে অপরিহার্যটি না থাকলে ভোজন রসিক মাত্রই মনক্ষুন্ন হন, তা হলো একটি শীতল রক্ত বিশিষ্ট মেরুদন্ডী জলজ প্রাণী - 'মাছ' । সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের আর্হার্য্যের সংগে মাছ ওতপ্রোতভাবে জড়িত । মাছকে নিয়ে রচিত হয়েছে হাজারো বচন আর প্রবাদ (মাছে ভাতে বাঙ্গালী,)'ধরিব মৎস্য খাইব সুখে', 'গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ' ইত্যাদি থেকে 'ধরি মাছ না ছুই পানি, কিংবা গভীর জলের মাছ' মাছ আর্হায্য হিসেবে যেমন প্রাচীন, মাছ ধরা পেশা হিসেবেও অত্যন্ত প্রাচীন । মেসোপটেমিয়া, নীলনদ উপত্যকা, সিন্ধু উপত্যকা সমুহের সভ্যতা ছিলো পানি ভিত্তিক এবং মৎস্য ও পশু শিকার ছিলো তখন মুল পেশা । বাংলাদেশেরও কৃষি কাজের পুর্বেই মানুষের পেশা ছিলো মৎস্য আহরণ এবং সে কারণেই "মাছে ভাতে বাঙ্গালী" প্রবাদটিতে তার সমর্থন পাওয়া যায় । কিন্তু প্রাচীন এই সুলভ সম্পদটি বর্তমানে বেশ মহার্য এবং প্রাপ্তির হারও দ্রুত কমে আসছে । যথোচিত গুরুত্ব সহকারে এই সম্পদ উন্নয়নের চেষ্টা না করলে, এমন দিন আসবে যখন মাছ দেখার জন্য গবেষণাগার কিংবা জাদুঘরে যেতে হবে ।

গরুত্ব ঃ

বর্তমানে আগের মতো মাছ পাওয়া না গেলেও অর্থনৈতিক এবং পুষ্টির ক্ষেত্রে মাছ এক গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিগত ১৯৯৫-৯৬ সনে মোট দেশজ আয়ের শতকরা ৪.৭ ভাগের অধিক এবং মোট কৃষিজ আয়ের ১৪ ভাগেরও অধিক এসেছে মৎস্য উপখাত থেকে । দেশের সমগ্র রপ্তানী আয়ের শতকরা ১০.০০ ভাগ এসেছে মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী করে । পেশাভিত্তিক বিভাজনেও দেখা যায় মৎস্য চাষ ও আহরণ এক গুরুত্বপুর্ণ স্থান দখল করে আছে । এই উপখাতে প্রায় ১২.৪ মিলিয়ন পুর্ণ ও খন্ডকালীন মৎস্যজীবি নিযুক্ত রয়েছেন (পুর্ণকালীন ১.৪ মিঃ এবং খন্ডকালীন ১১মিঃ পেশাজীবী) ।

পুষ্টির দিকে থেকে মাছ এক তাৎপর্যপুর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে । যদিও মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ক্রমশঃই কমছে, তবুও প্রাণীজ আমিষের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ এখনো আসছে মাছ থেকে । মাছে রয়েছে অতি উন্নতমানের আমিষ, শরীরের পক্ষে উপকারী স্নেহজাতীয় পদার্থ । বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় খনিজ (ক্যালসিয়াম, ফসফেট, আয়রণ) ইত্যাদি ।

বিভিন্ন মাছে ১০০ গ্রামে বিভিন্ন হারে আমিষ , স্নেহপদার্থ , লৌহ, ক্যালশিয়াম, ফসফরাশ পাওয়া যায় । নীচের সারণীতে তার পরিমাণ দেখা যেতে পারে ঃ

মাছের নাম	প্রোটিন (গ্রাম)	ফ্যাট (গ্রাম)	লৌহ (গ্রাম)	ক্যালশিয়াম (মিলিগ্রাম)	ফসফরাস (মিলিগ্রাম)
ইলিশ	২১.৮	১৯.৪	২.১	১৮০.০	২৮০.০
কই	১৪.৮	৮.৮	১.৪	৪১০.০	৩৯০.০
কাতলা	১৯.৫	২.৪	০.৭	৫১০.০	২১০.০
চিতল	১৮.৬	২.৩	০.৫	১৮০.০	২৫০.০
ট্যাংরা	১৯.২	৬.৫	০.৩	২৭০.০	১৭০.০
পাবদা	১৯.২	২.১	০.৪	৩১০.০	২১০.০
বোয়াল	১৫.৪	২.৭	০.৬	১৬০.০	৪১০.০
মাগুর	১৫.০	১.০	০.৭	২১০.০	২৯০.০
মৃগেল	১৯.৫	০.৮	১.১	৩৫০.০	২৮০.০
রুই	২৬.৪	৬.০	৫.৬	৬৮০.০	২২৩.০

সারণী-১ প্রতি ১০০ গ্রামে বিভিন্ন মাছের পুষ্টি উপাদান

মৎস্য সম্পদ এলাকা ঃ

নদীমাতৃক এবং লক্ষ লক্ষ পুকুর , হাওর-বাওর সমৃদ্ধ বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদ এলাকাকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে ।

১) অভ্যন্তরীণ ঃ মিষ্টি পানির এলাকা

২) সামুদ্রিক ঃ লবনাক্ত পানির এলাকা

১) অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্র দু'রকম ঃ

ক) মুক্ত জলাশয় ঃ কোন না কোন দিকে নদী/সাগরের দিকে উন্মুক্ত জলাশয় ।

সারণী-১(ক)

উৎস	আয়তন (হেক্টর)
নদী, খাল, খাঁড়ি , মোহনা	১০৩১৫৬৩
বিল, হাওড়	১১৪১৬১
কাপ্তাই হ্রদ	৬৮৮০০
প্লাবন ভূমি	২৮৩৪০০৮
মোট মুক্ত জলাশয়	৪০৪৮৫৩২

খ) বদ্ধ জলাশয় ঃ চর্তুদিকে ভূমিদ্বারা বেষ্টিত জলাশয় ঃ

সারণী-১(খ)

উৎস	আয়তন (হেক্টর)
দীঘি, পুকুর(১২,৮৮,২২২)টি	১৫১৯১৬
বাওড়	৫৪৮৮
উপকূলীয় চিংড়ী খামার	১৪০০০০
মোট জলাশয়	২৯৭৪০৪
সর্বমোট ক+খ	৪৩৪৫৯৩৬

২। সামদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র ঃ বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র সুবিস্তৃত । সুন্দরবন থেকে শুরু করে টেকনাফ পর্যন্ত প্রায় ৪৮০ কিলোমিটার তটরেখাস্থ নিজস্ব জলসীমা ১২নটিক্যাল মাইল ছাড়াও ২০০ নটিক্যাল মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত অর্থনৈতিক জলসীমা (এক্সক্লুসিভ ইকোনমি জোন) যেখান থেকে আমরা মাছ আহরণ করে থাকি । এই বিশাল জলক্ষেত্র পুরো এলাকায় উল্লেখযোগ্য ৪টি মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক) দক্ষিণ মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র

খ) দক্ষিণ -পশ্চিম মৎস্য বিচরণ ক্ষেত্র

গ) নিমগ্ন মহাগহ্বর

ঘ) নিমগ্ন মহাগহ্বরের পুর্বদিক

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসম্পদ পৃথিবীর মধ্যে একটি অন্যতম সম্ভাবনাপুর্ণ জলসম্পদ । মাছের পরিকল্পিত আহরণের মাধ্যমে প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণ মাছ সমুদ্র থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও এখনও প্রাপ্তির হার এখানে অত্যন্ত কম ।

প্রজাতি

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির দেশীয় ও ১২ প্রজাতির বিদেশী মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। সমুদ্রে (বঙ্গোপসাগরে) ৪৭৫ প্রজাতির মাছ ও ৩৬ প্রজাতির চিংড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে।

রপ্তানী

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য সামগ্রীর রপ্তানীর পরিমাণ এবং তা হতে অর্জিত রপ্তানী আয়ের উর্দ্ধমুখী গতিধারা অব্যাহত রয়েছে। এ উপখাতের রপ্তানী আয়ের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগই হল চিংড়ির অবদান। দেশের মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার এবং মৎস্যপণ্য রপ্তানী কারকের সংখ্যা যথাক্রমে ১১০টি এবং প্রায় ২০০ জন। গত পাঁচটি অর্থ বছরে রপ্তানীকৃত পণ্যের পরিমাণ ও অর্জিত রপ্তানী আয় ছিল নিম্নরূপ।

(পরিমান = মেঃ টন, আয় মিলিয়ন টাকা)

সারণী-২ গত পাঁচ বছরের রপ্তানীকৃত পণ্যের পরিমাণ ও অর্জিত রপ্তানী আয়।

	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬
ক) পরিমান ঃ					
চিংড়ী	১৬৭৩০	১৯২২৪	২২০৫৪	২৬২৭৭	পাওয়া যায়নি
মাছ ও অন্যান্য	৫৩৫০	৭৩৮৩	৯৭৮১	১৫৪০৯	
মোট	২২০৮০	২৬৬০৭	৩১৮৩৫	৪১৬৮৬	
খ) রপ্তানী আয় ঃ					
চিংড়ী	৪৫৫.৭৩	৬০৪.০৩	৭৮৭.৭৩	১০৪৫.৭৬	পাওয়া যায় নি
মাছ ও অন্যান্য	৬৮.৬২	৯৬.২৬	১৩৩.২৩	২৬১.২৭	
মোট	৫২৪.৩৫	৭০০.২৯	৯২০.২৬	১৩০৬.২৬	
(দেশের মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা)	(৬.৯১)	(৭.৫৭)	(৯.১২)	(৯.৩৮)	(প্রায় ১০)

উৎপাদন ঃ ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরের বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে মৎস্য উৎপাদনের তথ্য নীচের সারণীতে দেয়া হলো ঃ

সারণী -৩ ক্ষেত্র ভিত্তিক মাছের উৎপাদন (১৯৯০-৯১ ও ১৯৯৫-৯৬)

উৎস	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬
১। অভ্যন্তরীণঃ						
ক) মুক্ত	৪.৩১	৪.৭৯	৫.৩৩	৫.৫২	৫.৭০	৫.৫৯
খ) বদ্ধ	২.২৩	২.২৭	২.৪৩	২.৭৫	৩.৩০	৩.৯০
২। সামুদ্রিক	২.৩৯	২.৪৬	২.৫০	২.৬০	২.৭০	২.৭৯
মোট	৮.৯৩	৯.৫২	১০.২৬	১০.৮৭	১১.৭০	১২.৬৪

নীচের সারণীতে বিগত বৎসরসমূহের উৎপাদনের সাথে বর্তমান উৎপাদন দেখানো হলো ।

সারণী -৪ ঃ বিভিন্ন অর্থ বৎসরে মাছ আহরণের পরিমাণ ।

(লক্ষ টন)

বৎসর	অভ্যন্তরীণ	শতকরা%	সামুদ্রিক	শতকরা%	মোট
১৯৬৫-৬৬	৭.২০	৮৯.৮৯	০.৮১	১০.১১	৮.০১
১৯৭০-৭১	৭.২৯	৮৯.৫৬	০.৮৩	১০.৫৪	৮.১৪
১৯৭৫-৭৬	৫.৪৫	৮৫.১১	০.৯৫	১৪.৮৪	৬.৪০
১৯৮০-৮১	৫.২৫	৮০.৭৭	১.২৫	১৯.২৩	৬.৫০
১৯৮৫-৮৬	৫.৮৭	৭৩.১২	২.০৭	২৬.০৭	৭.৯৪
১৯৯০-৯১	৬.৫৪	৭৩.২৩	২.৩৯	২৬.৭৭	৮.৯৩
১৯৯১-৯২	৭.০৬	৭৭.৭৩	২.৪৬	২২.২৭	৯.৫২
১৯৯২-৯৩	৭.৭৬	৭৫.৬০	২.৫০	২৪.৩৭	১০.২৬
১৯৯৩-৯৪	৮.২৭	৭৬.০৮	২.৬০	২৩.৯২	১০.৮৭
১৯৯৪-৯৫	৯.০০	৭৬.৯২	২.৭০	২৩.০৮	১১.৭০
১৯৯৫-৯৬	৯.৮৫	৭৭.৭৩	২.৭৯	২২.২৭	১২.৬৪

দেশের মোট জনসংখ্যা (১২.৫ কোটি) অনুযায়ী বর্তমানে মাথাপিছু দৈনিক ২৭.৭০ গ্রাম মাছ পাওয়া যাচ্ছে। তবে, যেহেতু বর্তমানে প্রচুর পরিমাণ মাছ ও মৎস্য জাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে, সেহেতু মাথাপিছু প্রকৃত মাছ গ্রহণের পরিমাণ অনেক কম এবং তা দৈনিক ২০.৫ গ্রাম প্রায়। জাতীয় পুষ্টি বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের সুপারিশকৃত জনপ্রতি দৈনিক ৩৮ গ্রাম পেতে হলে মৎস্য উৎপাদন বাৎসরিক ১৭.৩৪ লক্ষ টন হওয়া উচিত। সে লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখেই আমাদের এগুতে হবে।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা

মুক্ত জলাশয়

পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ ৪০.৪৮ লক্ষ হেকটর। এই বিপুল জলভূমি থেকে গত অর্থ বৎসরে মাত্র ৫.৭০ লক্ষ টন মাছ আহরণ করা হয়েছে। বর্তমানে হেক্টর প্রতি মৎস্য উৎপাদনের হার হলো ১১১ কেজি। অথচ পরিকল্পিত উপায়ে মুক্ত জলাশয়সমূহে মৎস্য চাষ করছে প্রতি হেক্টরে ২৫০ কেজি মৎস্যউৎপাদন করা সম্ভব। এতে বর্তমানের উৎপাদনের তুলনায় ২ থেকে ২.৫ গুণ মৎস্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

বদ্ধ জলাশয়

ক) **দীঘি পুকুর ও হাওর ঃ** এতে রয়েছে ২.৯৭ লক্ষ হেক্টর জলাশয়। এ সব বদ্ধ জলাশয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও মৎস্য চাষের বাইরে। প্রাকৃতিক উপায়ে এসব জলাশয়ে যতটুকু মাছ এসব জলাশয়ে যুক্ত হয়, ততটুকুতেই মোট মজুদের সাথে যুক্ত হয়; অথচ বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করলে হেক্টর প্রতি মাছ উৎপাদন অনেক বাড়ানো সম্ভব হতো যা বদ্ধ জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যকর প্রভাব ফেলতো।

খ) **চিংড়ি চাষ ঃ** চিংড়ি চাষের মাধ্যমে বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের অতি উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের বিস্তৃত উপকূল ভাগের অতি সামান্য অংশে বর্তমানে চিংড়ি চাষ হচ্ছে এবং সেটাও হচ্ছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সনাতন পন্থায়। অর্থাৎ জোয়ারের পানিতে যেটুকু চিংড়ি পোনা খামারে প্রবেশ করে তাই প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে উঠে। এতে করে হেক্টর প্রতি বর্তমান উৎপাদন হচ্ছে ২০০ থেকে ৪০০ কেজি মাত্র। অথচ মালয়েশিয়া, হাওয়াই, থাইল্যান্ড, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে বর্তমানে প্রতি হেক্টরে ৪০০০ থেকে ১০০০০ কেজি ক্ষেত্র বিশেষে ২০০০০ কেজি পর্যন্ত চিংড়ি উৎপাদন করছে। বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি উৎপাদন মাত্র ১০০০ কেজি পর্যন্ত উন্নীত করা সম্ভব হলেও চিংড়ি থেকে বছরে ২০০০-২৫০০ কোটি টাকা পর্যন্ত রপ্তানী আয় পাওয়া সম্ভব।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিরাজমান সমস্যা ও গ্রহণযোগ্য কলাকৌশল

অন্যান্য উৎপাদন খাতগুলোর মতো মৎস্য খাতও দেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট হুমকির সম্মুখীন। প্রথমতঃ জন সংখ্যার বৃদ্ধির হার মৎস্য উৎপাদন হারের চাইতে বেশী। দ্বিতীয়ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেশের জলাশয়সমুহ কৃষি জমি ও আবাসস্থল হিসাবে ব্যবহারের জন্য ভরাট করে ফেলা হচ্ছে যা মৎস্য সেক্টরে অত্যন্ত বিরুপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়াও মৎস্য সম্পদ উৎপাদনে রয়েছে নানা সমস্যা । নিম্নে মুক্ত ও সামুদ্রিক জলাশয়সমুহের মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের সমস্যা সমুহ পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো ঃ

মুক্ত জলাশয়

উৎপাদন বৃদ্ধিতে সমস্যা সমুহ ঃ প্রতি বৎসর পলিভরাট জনিত কারণে মুক্ত জলাশয়ের আয়তন হ্রাস, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের বাঁধ নির্মাণের ফলে মৎস্য বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্রের সংকোচন, কৃষি সেচের জন্য জলাশয় শুকিয়ে ফেলা, কলকারখানার দুষিত ও বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ নদ-নদীতে নিক্ষেপ , অতিমাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার, নির্বিচারে পোনা মাছ নিধন, সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রায় মৎস্য আহরণ সম্পর্কে ধারণার অভাব, মৎস্য আইনসমুহ প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা, জলমহল সমুহে সুষ্ঠ নীতিমালার অভাব, মৎস্য চাষে জনসাধারণের সুষ্ঠ ধারণার অভাব , সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, আন্তমন্ত্রণালয় সহযোগিতার অভাব ইত্যাদি মুক্ত জলাশয় মৎস্য উৎপাদনে বাস্তব সমস্যা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে । এসব সমস্যার কারণে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মুক্ত জলাশয় থেকে উৎপাদন ৪৫,০০০ টন হ্রাস পেয়েছে । মুক্ত জলাশয় অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের প্রায় ৭০-৮০% । সুতরাং এক্ষেত্রে উৎপাদন কমলে স্বাভাবিক ভাবেই তা মোট উৎপাদনে প্রভাব ফেলে ।

খ) বিরাজমান সমস্যাসমুহ নিরসনে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি নেয়া যেতে পারে ঃ

১। মুক্ত জলাশয় থেকে মাছ/পোনা আহরণ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে । কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে । মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি বাড়াতে হবে ।

২। মাছের অবাধ বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্রসমুখ নিরুপদ্রব রাখতে হবে । এ জন্য আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের সমঝোতা প্রয়োজন ।

৩। কলকারখানার বর্জ মুক্ত জলাশয়ে নিক্ষেপের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

৪। কীটনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । ফসলের পোকামাকড় দমনে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ (biological control) ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে ।

৫। সুষ্ঠ মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহনশীল পরিমাণ (maximum sustainable yield) মৎস্য আহরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

৬। পুকুর উন্নয়ন আইন ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে ।

৭। জলমহলসমুহ ইজারা প্রদানের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে। সম্ভব ক্ষেত্রে জলমহলসমুহে যথেষ্ঠ সংখ্যক মৎস্য অভয়াশ্রমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

চিংড়ি খামারসহ বদ্ধ শলাশয়

মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বদ্ধ জলাশয় অপরিসীম ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে রয়েছে ১.৫১ লক্ষ হেক্টর আয়তনের ১৩ লক্ষাধিক পুকুর দীঘি; ৫.৫ হাজার হেক্টর বাওড় এবং ১ লক্ষ হেক্টর চিংড়ি খামার। এসবের মধ্যে ৬০% চাষাধীন , ২৫% চাষযোগ্য এবং ১৫% হাজামজা। বদ্ধ জলাশয়ে যেহেতু মাছচাষ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, সেহেতু এই বিপুল জলসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে লাভজনক বিধায় বেসরকারী পর্যায়ে মৎস্য চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পুকুরে মাছের উৎপাদন ১৯৮৩-৮৪ সালে ১.০৮ লক্ষ থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালে ৩.৯০ লক্ষ টনে উন্নীত হয়েছে। এর মধ্যে চিংড়ী উৎপাদন বৃদ্ধির হার অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। ১৯৮৪-৮৫ সানে ১১,২৮০ টন থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ২৭,৮৭০ টনে। এবং তা রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে প্রায় ১১০৯.১০ কোটি টাকা। বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষের সমস্যাসমুহ মুক্ত জলাশয়ের প্রায় অনুরূপ। বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষ বৃদ্ধিতে নিম্নরূপ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে ঃ

১. দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতির মাছের চাষে আগ্রহ বাড়াতে হবে
২. বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষের বিষয়ে পুকুর মালিকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে
৩. সমন্বিত মৎস্যচাষ চালু করতে হবে
৪. সেচখা।ল, নদী, বাওড় , প্লাবন ভূমি ইত্যাদিতে পরিকল্পিত উপায়ে মাছ চাষ করতে হবে
৫. চিংড়ী উৎপাদন ক্ষেত্র সমুহের মালিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে
৬. প্রজনন মৌসুমে বাগদা চিংড়ি ধরা নিষিদ্ধ করতে হবে
৭. চিংড়ির মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘন ফাঁসের জালের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে
৮. প্রাকৃতিক পোনার উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রচুর চিংড়ি পোনা উৎপাদন খামার তৈরী করতে হবে
৯. ধান চাষের সাথে চিংড়ি চাষের সমন্বয় ঘটানোর জন্য লবনাক্ততা সমনশীল ধানের জাত উৎপাদন করতে হবে
১০. সমুদ্র থেকে চিংড়ি পোনা আহরণে পরিকল্পিত পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে অন্যান্য মাছের পোনা মারা না যায়।

সামুদ্রিক মৎস্য

দেশের সমুদ্র সম্পদের খুব সামান্য ব্যবহার করে আমরা বর্তমানে মোট মৎস্য উৎপাদনের মাত্র ২৭% পাচ্ছি এখান থেকে । অথচ সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এখান থেকে প্রচুর মাছ আহরণ করা সম্ভব । সমুদ্র থেকে আহরিত মাছের ৯৫% আসে আর্টিসেনাল ফিসারীজ এবং ৫% আসে বাণিজ্যিক ট্রলার থেকে । সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও রয়েছে বিভিন্ন সমস্যা । এ সমস্যা নিরসনকল্পে নিম্নরূপ ব্যবস্থা নেয়া যায় ঃ

১. বিদেশের সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সম্পর্ক উন্নত করতে হবে, চুক্তি দেশের স্বার্থে সংরক্ষণ করতে হবে
২. সামুদ্রিক মাছ আহরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে, যাতে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ডিমওয়ালা মাছ এবং পোনা মাছ নির্বিচারে নিধন করা না যায়
৩. সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ পদ্ধতি আধুনিকায়ন করতে হবে । এর জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল, চেকপোষ্ট ইত্যাদি তৈরী করতে হবে এবং প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ট্রলার ও যান্ত্রিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে
৪. দেশী নৌকা/যান্ত্রিক নৌকার উপর মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে
৫. মৎস্য সংরক্ষণ, অবতরণ এবং বাজারজাতকরণের সুবিধাদি বাড়াতে হবে
৬. সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আহরণ সীমা (maximum sustainable yield) নির্ধারিণ করে সে পরিমাণ মাছ আহরণ করতে হবে

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমুহ ও তাদের কার্যাবলী

১৯০৮ সান মৎস্য অধিদপ্তর, ১৯৪৬ সনে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং ১৯৮৪ সনে মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদ এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তৃত ।

মৎস্য বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে আসছে । তদুপরি , চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিবশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং গাজীপুর ইপসা থেকেও মৎস্য বিষয়ক উচ্চতর ডিগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে ।

তা ছাড়া, বাংলাদেশের মৎস্য ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনের বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, এফ এ ও, ইউ এন ডি পি, ইউএসএআই ডি, ইকলার্ম, ব্রাক, সিডা, কেয়ার, প্রশিকা, আরডি আর এস, গ্রামীন ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল ।

কার্যাবলী

ক) **মৎস্য অধিদপ্তর ঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকান্ডের মুল উদ্দেশ্যাবলী হলো দেশের মৎস্য সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ, সুষ্ঠ ব্যবস্হাপনা এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের প্রয়োজনীয় আমিষের চাহিদা মিটানো, মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের আর্থ- সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন, বেকার ও ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যসামগ্রী রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম করা । বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তর এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ।

খ) **বাংলাদেশের মৎস্য উন্নয়ন সংস্হা ঃ** মৎস্য সম্পর্কিত শিল্প প্রতিষ্ঠান অবকাঠামো স্হাপন ও উন্নয়ন, মৎস্য আহরণ ও বিপনন কর্মকান্ড পরিচালনা, সমবায় গঠনে মৎস্যজীবিগণকে উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন গুলির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে ।

গ) **মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ঃ** মৎস্য গবেষণা উনষ্টিটিউট এর উদ্দেশ্য হল মৎস্য বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন, প্রযুক্তি নিরীক্ষণ ও প্রমিতকরণ এবং রপ্তানীযোগ্য পণ্যের মনোনয়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন । ৬টি অঙ্গ প্রতিষ্যানের মাধামে মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্মকান্ড পরিচালনা করছে ।

স্হাপনা/অবকাঠামো

মৎস্য অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিভাগীয় , জেলা ও থানা (থাঞ্চি, রামু, বরকল ও বিলাইছড়ি থানা ব্যতীত) পর্যায়ে দপ্তর রয়েছে । এ ছাড়াও প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান এবং পোনামাছ সহজলভ্য করার জন্য সারাদেশে ৮টি মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১০টি গ্রামীণ মৎস্য খামার, ১৬টি মিনি হ্যাচারী, ৩টি চিংড়ি হ্যাচারী, ২টি ব্যাকইয়ার্ড চিংড়ি হ্যাচারী, ৪টি চিংড়ি চাষ প্রদর্শনী খামার এবং ৩টি মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার রয়েছে ।

বাংলদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতায় ফিস হারবার, মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও ফিসমিল প্ল্যান্ট , মান নিয়ন্ত্রণ ও পণ্যসামগ্রী উন্নয়ন কেন্দ্র, মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র, জাল কারখানা, মেরিন ফিসারীজ একাডেমী রয়েছে ।

মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ময়মনসিংহে স্বাদুপানি কেন্দ্র, চাঁদপুরে নদী কেন্দ্র সাতক্ষীরায় লোনাপানি কেন্দ্র এবং কক্সবাজারে সামুদ্রিক মৎস্য প্রযুক্তি কেন্দ্র রয়েছে । তা ছাড়াও রাঙ্গামাটি এবং সান্তাহারে ২টি উপ-কেন্দ্র রয়েছে ।

এ ছাড়াও বেসরকারী পর্যায়ে ২৫৬টি কার্প হ্যাচারী , ২০টি চিংড়ি হ্যাচারী (তন্মধ্যে ১২টি নির্মাণাধীন) ও ১১৪টি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা রয়েছে।

জনবল সম্পর্কিত বিবরণ

সংস্থা	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	২৯	৮০	১০৯
মৎস্য অধিদপ্তর	১৫৩৭	২৯৮০	৩৮৫৯
মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট	১৮৪	৩৩১	৫১৫

মৎস্য ঋণ

বাংলাদেশে কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্র সমুহে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) ছাড়াও সোনালী ব্যাংক , অগ্রণী ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে কৃষির অন্যান্য ক্ষেত্রের চাইতে মৎস্য চাষের জন্য দেয় ঋণের পরিমাণ অনেক কম । পরের সারণী থেকে সেটা স্পষ্ট হতে পারে ঃ

সারণী-৫ ঃ বিভিন্ন খাতে বিতরণকৃত কৃষি ঋণের মধ্যে পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণের শতকরা হার ।

বৎসর	ফসল ঋণ(%)	অন্যান্য ঋণ (%)	পুকুরে মৎস্য ঋণ (%)
১৯৮৯-৯০	৩৭.৪৪	৬১.৮৮	০.৬৮
১৯৯০-৯১	৩৬.৯৩	৬২.২৬	০.৮১
১৯৯১-৯২	৪৬.২১	৫২.৪৫	১.৩৪

উৎস্য ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানী রিপোর্ট ।

এ অবস্থা নিরসন অত্যন্ত জরুরী ; এ জন্য

১. ছোট ছোট মৎস্য শিল্প, উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদিতে ঋণ বিতরণে জামানত প্রথা বাধ্যতামুলক না করে তদারকী প্রথা চালু করতে হবে
২. মৎস্য সেক্টরে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকসমুহে মৎস্য বিশেষজ্ঞ ষ্টাফ অথবা উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে
৩. মৎস্য ঋণ দান প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে এবং সুদের হার কমাতে হবে
৪. মৎস্য সেক্টরে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

মৎস্য উন্নয়নে সরকারী নীতিমালা

১। মৎস্য সম্পদ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সরকারের নিম্নলিখিত নীতি ঃ

ক) ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচির অধিনে মৎস্য বিভাগের আওতায় ২১টি মুল এবং ৫টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এতে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৮০৬১.৪০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পসমুহের মধ্যে বিল বাওড় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প, দ্বিতীয় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, সমন্বিত মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, বাওড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং তৃতীয় মৎস্য চাষ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মৎস্য উন্নয়ন কার্যকর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

খ) **মৎস্য সংরক্ষণ আইন ৫০ জোরদারকরণ ঃ** এই আইন বলে ৯ইঞ্চির নীচে নলা মাছ ধরা, মাছের প্রজনন মৌসুমে ডিমপুর্ণ মাছ ধরা, ঝাটকা (ইলিশ মাছের পোনা) মাছ ধরা, প্রবাহমান নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ ধরা ইত্যাদি আইনতঃ নিষিদ্ধ। আইন অমান্যকারীদের শাস্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে। এসব আইন বিরোধী কাজ যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য জেলা এবং থানা পর্যায়ে মৎস্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এই আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্হা নেয়া হচ্ছে। তবে, এই আইনের সফল প্রয়োগের জন্য সামাজিক সচেতনতা বেশী দরকার। আইন ভঙ্গকারীদের প্রথম অপরাধীদের ক্ষেত্রে শাস্তি কমপক্ষে ১ মাস এবং সবোর্চ্চ ৬ মাস কারাদন্ড এবং জরিমানা ১০০০ টাকা। পরবর্তী অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি দ্বিগুণ। আইন ভঙ্গকারীকে বিনা অয়ারেন্টে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ গ্রেপ্তার করতে পারেন। এ আইনের আওতায় ১৯৯৫ সালে ৩৩৪৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গ) পুকুর উন্নয়ন আইন '৩৯ প্রয়োগ ঃ পুকুর যাতে পতিত অবস্হায় পড়ে না থেকে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এই আইন রয়েছে। যে সকল পুকুর মালিকগণ মাছ চাষ না করে পুকুর পতিত রাখবেন তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে ঐ পুকুরে মাছ চাষ করার জন্য লিখিতভাবে জেলা প্রশাসক নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন। এই নির্দ্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পুকুর মালিক পুকুরটিকে মাছ চাষের আওতায় আনতে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক এই আইনের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পুকুরটিকে নিজ নিয়ন্ত্রণে এনে মাছ চাষ করতে পারবেন, অথবা কোন স্হানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি কিংবা কোন উৎসাহী ব্যক্তিকে মাছ চাষের জন্য ঐ পুকুরের স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য লিজ হিসেবে হস্তান্তর করতে পারবেন। এই আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করবার জন্য বর্তমানে জেলা প্রশাসকসহ থানা পর্যায়ে জোর প্রচার চালানো হচ্ছে।

ঘ) বিবিধ ঃ কাজের বিনিময়ে খাদ্য, বন্যা নিয়ন্ত্রণ , নিষ্কাশন ও সেচ এলাকায় মৎস্য চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে।

২। **জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন নীতিমালা**

ক) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সামগ্রিক নীতিমালা সম্প্রতি প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য উন্নয়ন নীতি জাতীয় পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। চূড়ান্ত নীতি মালা সরকার কৃর্তক গৃহীত হবার জন্য পেশ করা হবে বলে আশা করা যায়।

খ) গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে জনসাধারণ বিশেষ করে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের সংগঠিত করে মাছ ও চিংড়ি চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। নিমগাছি মৎস্য চাষ প্রকল্পটিসহ ২০টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের ব্যবস্থাপনা ইতোমধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং চকোরিয়া এলাকায় চিংড়ি চাষের ঋণ সুবিধা প্রদান গ্রমীণ ব্যাংককে জড়িত করা হয়েছে।

উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

বর্তমানে বাৎসরিক ১২.৬৪ লক্ষ টন থেকে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে মৎস্য উৎপাদন ১২.৯৫ লক্ষ টনে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ১০.২৫ লক্ষ টন এবং সামুদ্রিক ২.৭০ লক্ষ টন। উল্লেখ্য, ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে সরকারী খামার হতে ২৫০০ কেজি রেনু উৎপাদিত হয়েছিল। আগামী অর্থ বছরে এই লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৬০০ কেজি।

বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন কৌশল

সৈয়দ শামসুল আলম
উপ-পরিচালক,বিপিএটিসি

ভূমিকা

পানির অপর নাম জীবন। জীবন ধারণের জন্য বাতাসের পরেই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে পানি। মানুষসহ পৃথিবীতে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবন ধারণের জন্য পানির উপর নির্ভরশীল এই সত্যটি আধুনিক জীব বিজ্ঞানে গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য স্থান কাল নির্বিশেষে বর্তমান বিশ্বে পানি শুধু একটি পদার্থ নয় একটি মহা মূল্যবান সম্পদ। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই সম্পদের উপর আলোকপাত করা হবে।

পানির পরিমাণ

পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে পানি। মহাসাগরের লবনাক্ত পানি ও মেরু অঞ্চলের বরফ পুঞ্জের বিশাল পরিমাণ পানি ছাড়াও পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ নদী-নালা, খাল-বিল এবং ভূগর্ভে প্রায় আধ মাইলের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন অবস্থায় ছড়িয়ে রয়েছে এই পানি। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ব্যালান্স কর্তৃক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, পৃথিবীতে মোট পানির পরিমাণ ১.৪×১০ ^{৯} কিউবিক কিলোমিটার, যা দিয়ে এই পৃথিবীকে ৩০০০ মিটার নীচে ডুবিয়ে রাখা সম্ভব। এই পানির শতকরা ৯৭.৩০ ভাগই রয়েছে সমুদ্রে। বাকি ২.৭০ ভাগ মিঠা পানির শতকরা ৭৭.২০ ভাগ রয়েছে মেরু অঞ্চলের বরফ ও হিমবাহ আকারে। ২২.৪০ ভাগ রয়েছে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে, ০.৩৫ ভাগ হ্রদ ও খাল-বিলে, ০.০৪ ভাগ বায়ু মন্ডলে এবং মাত্র ০.০১ ভাগ নদ-নদীতে (অজিত বিশ্বাস, ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট ১৯৮৮)।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন পৃথিবীতে চাহিদার তুলনায় প্রাপ্ত মোট পানির পরিমাণ অনেক বেশী। তবে যখন যেখানে যে পরিমাণ পানির সরবরাহ দরকার ঠিক তখন সেখানে সেই পরিমাণ পানি পাওয়া যায় না বলেই যুগে যুগে মানুষের নিকট পানি একটি প্রধান সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। এজন্য মানব ইতিহাসে পানি নিয়ে ঘটেছে মানুষে মানুষে এবং জাতিতে-জাতিতে মনোমালিন্য ও যুদ্ধ বিগ্রহ।

বাংলাদেশেও সারা বৎসর পানি সরবরাহ এক নয়। এজন্য বর্ষা ঋতুতে পানির আধিক্য বন্যা, প্লাবন, জলোচ্ছাস দেখা যায়। অপর দিকে শীত ও খরা মৌসুমে পানির স্বল্পতা ও সরবরাহের অনিশ্চয়তা দেখা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা এবং পানি ব্যবহারের ব্যবস্থাপনাই আসল সমস্যা। বাংলাদেশের প্রাপ্ত পানির পরিমাণ হিসেব করলে দেখা যায় যে, চাহিদার তুলনায় পানি আমাদের থাকা সত্ত্বেও সুষ্ঠু পরিকল্পনা, কারিগরী জ্ঞানের অভাব, চাষাবাদে পানি ব্যবহারে ভুল প্রক্রিয়া এবং সঠিক প্রযুক্তির অভাবে বাংলাদেশে পানি সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী কোন সমাধান এখনও হয়নি।

পানি সম্পদের গুরুত্ব

বাংলাদেশে পানি একটি অনন্য একক এবং বিশিষ্ট সম্পদ হিসেবে স্থান দখল করে আছে। পানির গুরুত্ব ও প্রভাব বাংলাদেশের উপর এমন যে, পৃথিবীর অপর কোন দেশ পানি দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় বলে দেখা যায় না। পানি শুধু আমাদের কৃষিকেই নিয়ন্ত্রণ করে না। পানি নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের অর্থনীতিকে। পানি নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের সামাজিক জীবনকে। পানি প্রভাবিত করে আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শকে। পানি নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে।

আমাদের অর্থনীতি মুলতঃ কৃষি নির্ভর। এই কৃষি কাজে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ লোক নিয়োজিত রয়েছে। কৃষিজাত ফসলাদি উৎপাদনের শতকরা ১০০ ভাগই নির্ভর করে প্রয়োজনীয় পানির উপর। এছাড়া পানি যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। পানি পথেই বাংলাদেশে সস্তায় তুলনামুলকভাবে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ মালামাল এক স্থান থেকে অন্যত্র বহন করা হয়। পানি সম্পদ থেকে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি। এই বিদ্যুৎ থেকে উপকৃত হচ্ছে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক। বর্ষার মৌসুমে এই পানি দেশের সর্বত্র নিয়ে আসছে প্রতি বৎসর উর্বর পলি মাটি। এই পানি এবং পলিবাহিত মাটি একাধারে দেশকে উর্বর ভূমিতে পরিণত করছে। অপরদিকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য অন্যতম এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। দৈনন্দিন গার্হস্থ্য কাজে পানি ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের খাদ্যে প্রধান আমিষের উৎস মাছও পাচ্ছি এই পানি থেকে। সর্বোপরি দৈনিক আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করছি এর মধ্যে সিংহ ভাগই রয়েছে পানি। এমনকি মানব দেহটি পর্যন্ত গঠিত হয়েছে শতকরা ৭০ ভাগ পানি দ্বারা। পরিশেষে এটা বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে আমাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, খাদ্যাভ্যাস এবং আমাদের কৃষ্টি যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে পানির উপর ভিত্তি করে।

পক্ষান্তরে জাতীয় অর্থনীতিতে পানির গুরুত্ব অনুধাবন করতে যদি জি ডি পি'র গঠনকে ইংগিত বাহক হিসেবে ধরা যায়, তবে দেখা যায় জি ডি পি'র ৫০ শতাংশ আসে কৃষি খাত থেকে। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, অনেক সময় পরিকল্পনা প্রণয়নকারীগণ বলেন আগামীতে কৃষির উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা হচ্ছে, দ্রুত শিল্পায়ন হচ্ছে এবং শিগগীর অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু পরিকল্পনার মেয়াদান্তে আবার দেখি সেই কৃষিই পুরাতন ভৃত্যের মত অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রতিবেদনে পরিকল্পনা কমিশন দেখিয়েছেন যে,

কৃষি খাতের অংশকে ১৯৭৯-৮০ সালের ৫০% থেকে কমিয়ে ২০০০ সালে ৩৬.৯% আনা হবে এবং শিল্পখাতের অংশকে ৮% থেকে বাড়িয়ে ২১% পর্যন্ত বর্ধিত করতে হবে। কিন্তু কার্যতঃ কৃষির অংশ কখনই ৫০% এর নীচে নামেনি এবং কৃষি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আগামী ১০০ বৎসরেও বাংলাদেশের অর্থনীতি মুলতঃ এবং প্রধাণতঃ কৃষি নির্ভরই থাকবে।

এখানে আর একটা কথা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যের চাহিদাও উর্ধমুখী। কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ পুর্বের চেয়ে বেশী হলেও জনসংখ্যার বৃদ্ধির তুলনায় অপ্রতুল। বর্তমানের চাহিদার তুলনায় সনাতন পদ্ধতির কৃষি ব্যবস্থা নিতান্তই অপ্রতুল। তাই উচ্চ ফলনশীল ফসলের আবাদের সাথে সাথে পানির চাহিদাও বেড়ে চলেছে। অথচ খরার মৌসুমে পানি প্রাপ্যতা কমেছে বৈ বাড়েনি, বিশেষতঃ ১৯৭৬ সালে ফারাক্কা প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে। এই সব সমস্যায় পড়ে অবশেষে আমরা বুঝতে শিখেছি যে বাংলাদেশের জন্যে পানি সীমাহীন পরিমাণে আল্লাহর দান নয় বরং এটা অত্যন্ত সীমিত একটি সম্পদ।

ভৌগলিক অবস্থান এবং পানির উৎস

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ২০ ডিগ্রী ৩০ মিনিট থেকে ২৬ ডিগ্রী ৪৫ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮ ডিগ্রী ৩০ মিনিট থেকে ৯২ ডিগ্রী ৫৬ মিনিট পুর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। এই অবস্থানগত নৈসর্গিক কারণ যেমন মৌসুমী বায়ু, পুর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর দিকে অবস্থিত পাহাড় সমুহ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এই সব মিলে বাংলাদেশ এক অনন্য পানি সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ। ভৌগলিক দিকে এর অবস্থানকে বিশেষজ্ঞগণ একটি বেসিনের সহিত তুলনা করে বাংলাদেশকে বেঙ্গল বেসিন বা বেঙ্গল ডেল্টা অর্থাৎ বদ্বীপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলাদেশের পানির উৎস প্রধানতঃ তিন প্রকার যথা ঃ ১) ভূ-পৃষ্ঠ পানি, ২) বৃষ্টির পানি এবং ৩) ভূ-নিম্নস্থ পানি।

ভুপৃষ্ঠের পানি বলতে আমরা সকল প্রকার পানি বহন ও ধারণকারী এলাকাসমূহ বুঝিয়ে থাকি। এর মধ্যে, নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি, হাওর-বাওর ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত। বরফ গলা পানি এবং বৃষ্টিপাতই ভুপৃষ্ঠের পানির একমাত্র উৎস।

বাংলাদেশের অসংখ্য শাখা নদী, উপ-নদীসহ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা প্রভৃতি নদীমালার সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ১৩,৭৭০ মাইল (২২,১৫৫ কিঃ মিঃ)। এই সকল নদীসমূহ কতটুকু পানি ধারণ করতে পারে এমন সঠিক তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে এই নদী সমুহের মধ্য দিয়ে প্রতি বৎসর ১,২০০ মিঃ একর ফিট (এম এ এফ) পানি প্রবাহিত হয়ে বঙ্গপোসাগরে পতিত হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় প্রতি বৎসর ১০০ মিঃ একর ফুট স্থানীয় বৃষ্টিপাত থেকে পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় শতকরা ৯০ ভাগের অধিক পানি আসছে বাংলাদেশের বাইরে থেকে। এই পানির ব্যাপকতা উপলব্ধির জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে রায়মঙ্গল পর্যন্ত একটি বাঁধ দিয়ে এই পানি প্রবাহ ধরে রাখতে

পারলে বাংলাদেশকে ৩৪ ফিট পানির নিচে তলিয়ে দেওয়া যায় । এই পানির সাথে উজান থেকে প্রতিবৎসর ১.৫ থেকে ২ বিলিয়ন টন পলি পানি প্রবাহের মাধ্যমে এই বাংলাদেশের নদী সমুহের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসছে ।

এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে মুক্ত জলাশয়, খাল-বিল, হাওর, দীঘি, পুকুর , বাওর , কাপ্তাই হ্রদ প্লাবন ভূমি মিলে ৩২,৮৮,৫৭৮ হেক্টর এলাকা জুড়ে প্রায় সারা বৎসর পানি থাকছে । দেশের দক্ষিণাংশে রয়েছে ৭১৫ কিঃ মিঃ দীর্ঘ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা । এই উপকুলীয় এলাকার ২০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র সীমাব্যাপী রয়েছে আমাদের পানি সম্পদের সীমানা ।

পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী সমুহের উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত ১৫,০০,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ (প্রায় ৬,০০,০০০ বর্গ মাইল) এলাকার পানি প্রবাহিত হয়ে বঙ্গপোসাগরে নিস্কাশিত করছে । এই এলাকার মাত্র সাড়ে সাত ভাগ বাংলাদেশের অন্তর্গত । এই তিনটি নদী শুষ্ক মৌসুমে সম্মিলিত মাসিক প্রবাহের পরিমাণ (ফেব্রুয়ারী/মার্চ) প্রায় ৭,০০০ কিউসেক (২.৫ লক্ষ কিউসেক) এবং জুলাই/আগষ্ট মাসে ১,০৫,০০০ কিউসেক (৫০,০০,০০০ লক্ষ কিউসেক) অর্থাৎ বর্ষা মৌসুমের পানি প্রবাহ খরা মৌসুমের প্রায় ২০ গুণ বেশী (এম, আই চৌধুরী ঃ ষ্টাডিজ ইন বাংলাদেশ জিওগ্রাফী ১৯৮৫)

প্রতি বৎসর বর্ষা ঋতুতে দেশের প্রায় ২০ শতাংশ এলাকা (২৬,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ) প্লাবিত হয় । এবং কোন কোন বৎসর তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দেশের এক তৃতীয়াংশ এলাকা বন্যা কবলিত হয়ে থাকে, যেমনটি ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালে হয়েছিল ।

ভূনিম্নস্হ পানি

বাংলাদেশে প্রচুর ভূগর্ভস্হ পানি বিদ্যমান রয়েছে । একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, ভূগর্ভস্হ পানি দ্বারা বাংলাদেশের ১৩.৮৫ মিঃ একর এলাকা প্রতি বৎসর পানি সেচ করা সম্ভব । নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ৯ মিঃ একর ফুট পানি সেচের মাধ্যমে উত্তোলন করা সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন (মুনিরুজ্জামান সম্পাদিত ঃ রিভার বেসিন ডেভেলপমেন্ট ১৯৮১) ।

পানির প্রাপ্যতা ও মোট চাহিদা

বাংলাদেশ সরকারের মাষ্টার প্লান অর্গানাইজেশন (এমপিও) ইউ এন ডিপি এবং বিশ্ব ব্যাংক এর সহায়তায় ১৯৮৪ সালে প্রণীত ‘‘জাতীয় পানি পরিকল্পনা ’’ (National Water Plan) শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে প্রাপ্য দেশের মোট পানির পরিমাণ (বঙ্গপোসাগরের পানি ব্যতীত) চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল নয় । উল্লেখিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুমে (মার্চ-

থেকে মে মাস) বিভিন্ন খাতে পানির চাহিদা ও প্রাপ্যতার একটি তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে যে, বর্তমানে মোট ২৫,৬৯৭ মিলিঃ কিউবিক মিঃ পানির চাহিদা রয়েছে এবং ২৫,১০১ মিলিঃ কিউবিক মিঃ পানির প্রাপ্যতা রয়েছে ।

আসলে উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের অভাবে বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুমে তথাকথিত পানির অভাব দেখা দেয় । যে দেশ পৃথিবীর মানচিত্রে একটি বেসিন নামে পরিচিত, যে দেশের উপর দিয়ে তিনটি আর্ন্তজাতিক নদী সহ মোট ২৫০ টির অধিক নদ-নদী প্রবাহিত যে দেশে অসংখ্য খাল, বিল, পুকুর , দীঘি , হাওর, বাওর এবং ৭১৫ কিঃমিঃ উপকূলীয় এলাকা বিদ্যমান ও বৎসরে প্রায় গড়ে ৬০'' ইঞ্চি স্থানীয় ভাবে বৃষ্টিপাতের ফলে ১০ মিঃ একর ফুট পানি পাওয়া যায়, সেই দেশের শুষ্ক মৌসুমে মাত্র ৮ সপ্তাহ থেকে ৯২ সপ্তাহের খাতওয়ারী প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের প্রযুক্তি ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা দীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরেও আমরা গ্রহণ করতে পারিনি । এজন্য আমরা দায়ী-নাকি বিদেশীরা দায়ী ? বিষয়টি এমনভাবে দেখবার সময় এসেছে ।

পানি সম্পদ উন্নয়নে পদক্ষেপসমূহ

উপরোক্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কৃষি, শিল্প, মৎস্য, নৌ-চলাচল গার্হস্থ্য ও লবনাক্ততা দমন ইত্যাদি খাতে সারা বৎসর বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে যে পরিমাণ পানির প্রয়োজন, তার প্রায় সবটুকু পানি বাংলাদেশে বিদ্যমান । কিন্তু স্বাধীনতা পুর্ব এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে এই পানি সম্পদ উন্নয়নে এ পর্যন্ত যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা দেশের সামগ্রীক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হতে পারেনি ।

পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অতীতকাল থেকে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে সকল উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. ক্রুস মিশন রিপোর্ট ১৯৫৭
২. উপিওয়াপদা মহাপরিকল্পনা, ১৯৬৪
৩. মহা-পরিকল্পনা পুণঃ পরীক্ষা এবং বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন ১৯৬৬
৪. ভারত বাংলাদেশ পানি বটণ চুক্তি ১৯৭২ এবং ১৯৭৭
৫. জাতীয় পানি পরিকল্পনা ১৯৮৬
৬. ফ্রান্স কনসোরটিয়াম রিপোর্ট ১৯৮৯
৭. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসুচি বন্যা নীতিমালা সমীক্ষা ১৯৮৯
৮. বন্যা কার্য পরিকল্পনা ১৯৮৯

৯. বাংলাদেশর পনি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশল ১৯৯৫ এবং

১০.ভারত বাংলাদেশ পানি বন্টন চুক্তি ১৯৯৭

এ সকল রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ক্রুস মিশন রিপোর্ট ১৯৫৭ঃ

- বাঁধ নির্মাণ
- বন্যা অঞ্চল বিভক্তি করণ
- বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ
- নদী খাত উন্নয়ন এবং পানি একখাত থেকে অন্য খাতে সরানো
- নৌচলাচল ও বন্যার জল নির্গমনের জন্য ড্রেজিং

এছাড়াও কয়েকটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হয় ঃ

- তিস্তা নদীর উপর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসহ ব্যারেজ নির্মাণ
- গঙ্গা -কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প
- কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প
- পানি সম্পদ উন্নয়নের পক্ষে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নকে অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা
- পানি সম্পদ উন্নয়নের সার্থে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে ভারতের সাথে আলোচনার উপর গুরুত্বারোপ করা
- পানি সম্পদ ও বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্য একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা
- এই সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৯ সালে তৎকালীন পুর্ব-পাকিস্তান পানি বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়।

ইউপিওয়াপদা মহাপরিকল্পনা, ১৯৬৪

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ইনিজ্ঞনিয়ারিং কোম্পানী (আই ই সি ও) এই মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন ঃ

- এই মহা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় ২০-২৫ বৎসর ধরা হয়
- কৃষি খাতের তথা সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়

- কৃষি খাতে লক্ষ্য অর্জনের জন্য মোট ৬৩ টি প্রকল্প ১৯৮৫ সনের মধ্যে বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়
- ৮.৭৫ মিঃ চাষাবাদযোগ্য জমির মধ্যে ৪.৯০ মিঃ হেক্টর জমিকে বন্যামুক্ত করার এবং ৩.১০ মিঃ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়
- গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ব্যারেজ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত পাম্পের সাহায্যে পানি উত্তোলনের সুপারিশ করা হয়
- ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মহা-পরিকল্পনা পুণঃ পরীক্ষা এবং বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন ১৯৬৬

- বড় বড় বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিবর্তে সমীক্ষা ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং
- কৃষি উপকরণ সরবরাহ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়

ভারত বাংলাদেশ পানি বন্টণ চুক্তি ১৯৭২ এবং ১৯৭৭

- প্রাপ্য-পানি ও জমির ভিত্তিতে নতুন কৃষি কৌশল প্রয়োগ
- অতীত সফলতার/ব্যর্থতার আলোকে প্রকল্প বাস্তবায়নের নীতিমালার সীমাবদ্ধতা মুল্যায়ন এবং
- কোন বিকল্প ছাড়া খুব দ্রুত উৎপাদন সক্ষম প্রকল্প বাস্তবায়নের তাগিদ

জাতীয় পানি পরিকল্পনা ১৯৮৬ (এমপিও)

- কৃষি
- মৎস্য সম্পদ
- নৌচলাচল
- শিল্প কারখানা ও গৃহস্থালীতে পানি সরবরাহ
- সারা দেশকে ৬০টি পরিকল্পনা এলাকায় ভাগ করা হয়
- মূলতঃ জাতীয় পানি পরিকল্পনায় একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ৭২ সালের বিশ্বব্যাংকের ভূমি ও পানিখাত রিপোর্ট এর সুপারিশমালা একটু বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করা হয়েছিল

ফ্রান্স কনসোর্টিয়াম রিপোর্ট ১৯৮৯

- প্রধান নদীগুলির পাড় বাঁধ দেবার প্রস্তাব করা হয়
- বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে চারটি বিকল্প চিন্তা করা হয়

ক. নদীর তীর ঘেসে শ্রমঘন বাঁধ নির্মাণ

খ. নদীর তীর ঘেসে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণ

গ. দুরবর্তী শ্রম ঘন বাঁধ

ঘ. দুরবর্তী যান্ত্রিক নির্মাণ পদ্ধতি অনুসারে বাঁধ নির্মাণ।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসুচি/ বন্যা নীতিমালা সমীক্ষা ১৯৮৯

পাঁচটি প্রধান লক্ষ্য সামনে রেখে সমীক্ষা পরিচালিত হয় ঃ

- বন্যার কারণ ও প্রতিক্রিয়া সমীক্ষা
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ কৌশল পরীক্ষা
- প্রতিকার ব্যবস্থা সুপারিশ করা
- সুদুর প্রসারী বন্যা নীতিমালা প্রণয়ন এবং
- পর্যায়ক্রমিক কার্য পরিকল্পনা প্রণয়ন।

সমীক্ষা ১১টি পথ নির্দেশনা সুচক নীতিমালা প্রণয়ন করে। নীতিমালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১. পর্যায়ক্রমিক বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হবে ঃ

- শহর, বন্দর, গ্রাম ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কের প্রতিরক্ষা
- নিয়ন্ত্রিত বন্যা

২. কার্যকর ভূমি ও পানি ব্যবস্হাপনা

৩. দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্হাকে শক্তিশালী করণ

৪. বন্যা পুবার্ভাস ব্যবস্হার উন্নতি করণ

৫. নদীর দুই পাড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সাহায্যে ক্রস বাউন্ডারী প্রবাহকে বঙ্গোপসাগরে নিরাপদে প্রবাহিত করণ

৬. বাঁধের প্রতিরক্ষার জন্য কার্যকর নদী শাসন ব্যবস্হা গড়ে তোলা

৭. শাখা নদীগুলো দিয়ে বন্যার পানি প্রবাহিত করে প্রধান নদীগুলোর উপর চাপ কমালো

৮. নদীখাত উন্নয়নের মাধ্যমে নদীর পানি পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

৯. বাঁধ প্রান্তর অঞ্চলী করণ

১০. জলাবদ্ধতা মুক্ত রাখার ব্যবস্হা করণ

১১. বন্যার সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণে জনসাধারণের অংশগ্রহনে উৎসাহিত করণ

বাংলাদেশের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশল ১৯৯৫

গত ২৪শে আগষ্ট ১৯৯৫ তারিখে বন্যা কার্য পরিকল্পনা রিপোর্টে বর্ণিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য নতুন আংগিকে বাংলাদেশ পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল ১৯৯৫ শীর্ষক প্রতিবেদনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় ৫ বৎসর মেয়াদী ৪,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছেন।

এই উন্নয়ন প্রকল্পে নিম্মোক্ত চারটি প্রধান বিষয় বিবেচনা করা হবে ঃ

- জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন
- পাইলট প্রকল্প এবং চলমান সমীক্ষা সমাপ্ত করণ
- পানি সম্পদ সম্পৃক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং
- অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে চিহ্নিত ষ্ট্রাকচারাল ও ইনফ্রা-ষ্ট্রাকচারাল প্রকল্প বাস্তবায়ন

বন্যা

বেসিন সদৃশ্য এই বাংলাদেশে প্রতি বৎসর বন্যার আগমন একটি অতি স্বাভাবিক বিষয়। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান, জলবায়ু, নদী-পদ্ধতি, ভূমিরূপ এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ভূমির গড় উচ্চতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে প্রতি বৎসর বন্যার আগমন ঘটবেই। পরিমিত বন্যা আমাদের সবার কাম্য, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত বন্যা প্রতিরোধ আমাদের লক্ষ্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বন্যার সাথে বাংলাদেশ তথা বাঙ্গালী বসবাস করে আসছে। এই বন্যাই বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যতম শস্য ভান্ডারের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অনুরুপভাবে এই বন্যাই বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশে পরিণত করেছে। তাই বন্যাই বাংলাদেশের আর্শীবাদ এবং বন্যাই বাংলাদেশের অভিশাপ। বন্যার মধ্যে আমাদের পুর্ব পুরুষ বেঁচেছিল। আমাদের আগামী প্রজন্মকেও এই বন্যা নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে হবে। এজন্য টেকসই প্রযুক্তির মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, অতীত কাল থেকে অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ উত্তরোত্তর জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য একাধারে বাংলাদেশের প্রয়োজন পর্যাপ্ত অর্থ ও কারিগরী জ্ঞান, অপর দিকে আর্ন্তজাতিক বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত সরকারের সহযোগিতা।

বন্যা প্রতিকারের পদক্ষেপ সমূহ

ক. কাঠামোগত দিক ঃ

- নদীর উৎস সমুহে পাহাড়ী অঞ্চলে বর্ষায় পানি সংরক্ষণ
- অববাহিকা অঞ্চলে বনসংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ
- পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদীতে পর্যায়ক্রমে ব্যারেজ নির্মাণ
- পরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ (বিশেষ করে বৃহৎ নদীসমুহের দু'ধার দিয়ে)
- নদীর পানি প্রবাহের জন্য সুনির্দিষ্ট ভূমি সংস্কার আইন
- উন্নয়নের নামে নির্মিত বাঁধ, কাঁচা সড়ক ইত্যাদির মধ্যে পানি প্রবাহের পাকা পথ প্রস্তুত করণ

প্রশাসনিক দিক

- বন্যার পুর্বাভাস, সতর্কীকরণ এবং বন্যা প্রতিরোধ প্রশিক্ষণ প্রদান
- বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবার আবাসস্হল নির্মাণ
- ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতি ও ধরণ পরিবর্তনের প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ
- বন্যা প্রতিরোধ ও ত্রাণ সামগ্রী মজুত করণ
- বন্যাত্তোর পুর্ণবাসন ব্যবস্হা গ্রহণ
- বন্যা কবলিত এলাকার জনগণের জন্য বন্যা বীমা ব্যবস্হার প্রবর্তন ।

উপসংহার

পৃথিবী পৃষ্ঠের অবস্হানগত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া । পৃথিবীর অপরাপর দেশে গৃহীত প্রচলিত পদ্ধতির অনুরুপ পদ্ধতি বা প্রযুক্তি কোনটিই বাংলাদেশে অনুসরণ এবং গ্রহণ সম্ভব নয় । এজন্য ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় দাতা সংস্হা কর্তৃক প্রদত্ত চাপিয়ে দেয়া প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে পানি সম্পদ উন্নয়ন অতীতে যেমন যথার্থ হয়নি আগামীতেও হবে না বলে দেশের পানি বিশেষজ্ঞগণ মতামত দিয়ে থাকেন ।

দেশের খরা মৌসুমে মাত্র ৮ থেকে ১০ সপ্তাহ সময়ের জন্য পর্যাপ্ত পানির অভাবে আগামীতে পানির দেশ বাংলাদেশে, বন্যার দেশ বাংলাদেশে -- আর যেনফসল হানি না ঘটে, ধ্বংস হয়ে না যায় -- এজন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং সরকার কর্তৃক সুষ্ঠ পরিকল্পনা প্রণয়নএবং বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এই সমস্যার স্হায়ী সমাধান সম্ভব ।

বাংলাদেশের পশু সম্পদ উন্নয়ন কৌশল

মোঃ আনিছুর রহমান
উপ-পরিচালক,বিপিএটিসি

কৃষি ভিত্তিক বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পশু সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম । মানুষের পুষ্টিতে প্রাণীজ প্রোটিনের চাহিদা মিটানোয় মৎস্য সম্পদের পাশাপাশি পশু সম্পদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে । মুলতঃ অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তার আহার্য্য সংগ্রহে পশু পাখির উপর নীর্ভরশীল । অথচ প্রকৃতিতে মানুষের খাদ্য ও পরিধেয় সমস্যা মেটানোর জন্য প্রচুর পশু পাখিও পাওয়া যেত । বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিচরণ ক্ষেত্র সংকোচন, পরিবেশ দুষণ, অবাধ পশু পাখি নিধন ইত্যাদির কারণে গবাদি পশু পাখির সংখ্যা কমে আসছে এবং সে কারণে মানুষের আহার্য্য তালিকায় প্রাণীজ প্রোটিনের পরিমাণও কমে আসছে । অথচ মানুষের মেধাবৃদ্ধির জন্য প্রাণীজ প্রোটিনের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক ।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

পশু সম্পদ বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মোট উৎপাদনের ৭% অবদান রাখে এবং মোট কৃষিজ সম্পদের প্রায় ১৩% এই উপখাত থেকে আসে । দেশের প্রায় ২০% জনসাধারণ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই সম্পদের উপর নির্ভরশীল । দুধ , মাংশ, ডিম ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাণীজ প্রোটিন সরবরাহ ছাড়াও পশুসম্পদ থেকে কৃষি উৎপাদনের জন্য হালচাষ, গাড়ীটানা, শস্য মাড়াই ইত্যাদি করা হয়ে থাকে । এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ৯৫ ভাগ জমি গবাদি পশুর মাধ্যমে চাষ করা হয়ে থাকে ।

রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রেও এই উপখা ত অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ স্হানে রয়েছে । শুধুমাত্র গবাদি পশুর চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানী করে মোট রপ্তানী আয়ের ৬.৫ ভাগ অর্জিত হয়ে থাকে ।

দেশের গবাদি পশু পাখির সংখ্যা ও উৎপাদন

দেশের বিভিন্ন প্রজাতির গবাদি পশু পাখির সংখ্যা এবং তা থেকে উৎপাদিত দ্রব্যাদির পরিমাণ নীচের সারণীতে দেখা যেতে পারে ঃ

ক) গবাদি পশু পাখি

সংখ্যা লক্ষ-এ

	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৪-৯৫
গরু	২২৬.৫২	২২৮.৩৩	২৩০.৬১	২৩৯.৭৭
মহিষ	৭.০৭	৭.৩০	৭.৫৩	
ছাগল	২৩৮.৮৪	২৫৪.০৯	২৭৪.৯৩	৩০৭.৯১
ভেড়া	৯.১২	৯.৫৪	৯.৯৮	
মোরগ মুরগী	৯৫৮.৮২	১০২৩.০৬	১০৯১.৬১	১৪৩৪.২৩
হাঁস	১৩১.৯৫	১৩২.৮৭	১৩৩.৮০	

খ) উৎপাদিত দ্রব্য

ডিম (কোটি)	২০৪.৬৫	২১৫.৮২	২২৭৬.২৯	১৪০.৪৪
দুধ (লক্ষ মেঃটন)	১৩.৩৮	১৩.৫২	১৩.৭০	১৩.৯২
মাংশ (লক্ষ মেঃটন)	৪.৪৭	৪.৬০	৪.৪৭	৪.৮৯
চামড়া (হাজার সংখ্যা)	১৯১৪২	২০২৬৬	২১৪৭৮	-

পশু সম্পদ সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য ঃ

স্থাপনা সমুহ ঃ

১. কেন্দ্রীয় পশু হাসপাতাল	১
২. পশু চিকিৎসালয় ও থানা পশু সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	৪৬০
৩. কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান কেন্দ্র	১
৪. আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান কেন্দ্র	৭
৫. কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র	২২
৬. কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট	৮৪৭
৭. হাঁস মুরগী খামার	৩৫
৮. হাঁস প্রজনন খামার	২
৯. গবাদি পশুর উন্নয়ন প্রজনন খামার	৯
১০.পাঠাঁ পালন কেন্দ্র	৫
১১.হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র/উপকেন্দ্র/পয়েন্ট	১৩১
১২.টিকা বীজ উৎপাদন কেন্দ্র	২

অন্যান্য ঃ

১. চাষাবাদের ব্যবহৃত পশু শক্তি ৯৫%

২. গ্রামীণ পরিবহন ৫০%

৩. গোবর ৮০ মিলিয়ন টন (তাজা) অথবা ২২ মিলিয়ন টন (শুকনা) = ২ লক্ষ টন জৈব সার = ৬ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য অথবা ৪৫০ - ৬০০ কোটি টাকার জ্বালানী কাঠ বা ১৫ লক্ষ টন জ্বালানী তৈল।

৪. সার ঃ বর্তমানে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের প্রায় ১০%

৫. জ্বালানী ঃ প্রচলিত জ্বালানীর ২০%

৬. মোট জনবলঃ ৪,০৮৪

৭. ১৯৯৫-৯৬ সালের রাজস্ব বাজেট ঃ ৭৮.২৮ কোটি টাকা

৮. প্রতিদিন মাথাপিছু দুধের চাহিদা ২৫০ গ্রাম ; আমরা পাচ্ছি ২০-৩০ গ্রাম।

৯. বার্ষিক দুধ উৎপাদন প্রায় ৭ লক্ষ টন

১০. বার্ষিক দুধের ঘাটতি প্রায় ৭৮ লক্ষ টন

১১. চামড়া ও অন্যান্য পশুজাত দ্রব্য রপ্তানী করে প্রতি বছর আয় ৬৭২ কোটি টাকা। (১৯৯৩-৯৪)

১২. গুড়ো দুধ আমদানী ব্যয় ঃ ১৯৯০-৯১ সালে ২৫৫ কোটি টাকা
১৯৯৩-৯৪ সালে ১৪৮ কোটি টাকা

১৩. Avitaminosis 'A' (Nyctalopia) ⟶ affected ⟶ 40,000 Children /year.

১৪. ন্যুনতম চাহিদাতূল্যে দেশীয় উৎপাদন
১) দুধ ১৩.৫৮%
২) মাংস ১০.৫০%
৩) ডিম ২২.৭৮%

১৫. গাভী প্রতি বাৎসরিক দুধ প্রাপ্তি ঃ

	দেশী	২২১ কেজি
	ডেনমার্ক	৪৯২০ কেজি
	ইউ এস স	৫৩৭৭ কেজি

১৬. মুরগী প্রতি বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ক্ষমতা

	দেশী	৪০-৫০ টি
	বিদেশী	২৫০-৩০০টি

(White Leghorn)

উৎস ঃ উন্নয়ন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী (১৯৯৫-৯৬) মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, অক্টোবর, ১৯৯৫ এবং অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৯৩-৯৪, Perspective plan 1996-2010 (Livestock) পশুসম্পদ অধিদপ্তর এবং জাতীয় পত্রিকা সমূহ।

গবাদি পশু পাখির উন্নয়ন

উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গবাদি পশু পাখির উন্নয়ন অত্যন্ত সাম্প্রতিক একটি ধারণা। আশির দশকের আগ পর্যন্ত পশু পাখির উন্নয়ন কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র চিকিৎসা ও প্রতিরোধ কার্যক্রমে। উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে গবাদি পশু পাখির উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপের দিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমানে দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মসুচিতে পশু সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমকে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও সমুহও এই উপখাত উন্নয়নে এখন তৎপর। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এখাতে যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পশু সম্পদ উন্নয়নে বর্তমানে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ বিশেষ অগ্রাধিকার লাভ করেছে।

উদ্দেশ্যসমূহ

১. উন্নত জাতের গবাদি পশু পাখি যথা, গরু, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস মুরগী প্রতিপালনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের আত্ম কর্মসংস্থান ও আর্থিক আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করতঃ দারিদ্র বিমোচন।

২. উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের ডিম, দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ বিদ্যমান বিরাট ঘাটতি মেটানো।

৩. কৃষি কার্যক্রমে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনে হাল-চাষ, জৈব সার, গ্রামীণ পরিবহন ইত্যাদি কার্যক্রমে যথাযথ ভূমিকা পালন।

৪. জৈবসার, জ্বালানী তৈরী।

৫. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কর্মসুচি

১. গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর ব্যাধি দমনে টিকা উৎপাদন ও টিকা প্রদান

২. রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কার্যক্রম

৩. গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর জাত উন্নয়নের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম

৪. গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর সুষম খাদ্য উৎপাদন

৫. উন্নত ঘাস চাষ সম্প্রসারণ

৬. জনশক্তি উন্নয়ন ও কৃষক প্রশিক্ষণ

৭. চিড়িয়াখানা উন্নয়ন কার্যক্রম

৮. গবাদি পশু পাখি উন্নয়নে ও সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকল বিধি ও আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

গবাদি পশু পাখির ব্যাধির প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধের দিকে বর্তমানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইতোপুর্বে গবাদি পশুর ক্ষেত্রে গো-বসন্ত এবং পাখির ক্ষেত্রে রাণীক্ষেত রোগে বহু পশুপাখির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হতো। দ্বিতীয় গবাদি পশু উন্নয়ন প্রকল্পের দুঃস্থ মহিলাদের টিকা প্রদানে সম্পৃক্ত করায় মারাত্মক ব্যাধিসমুহ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এতে করে পুর্বে যে ক্ষেত্রে গবাদি পশুর মৃত্যুর হার ছিল ১৫-২০%, সেক্ষেত্রে বর্তমানে তা ১০% এর নীচে। হাসঁ মুরগীর মৃত্যুর হার ৩০-৪০% এর স্হলে বর্তমানে তা ১০-১৫% এর মধ্যে নেমে এসেছে বলা যায়।

গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর জাত উন্নয়ন

গবাদি পশু পাখির উন্নয়ন বৃদ্ধির জন্য এর জাত উন্নয়ন অপরিহার্য। আমরা যে সমস্ত উপায়ে পশু পাখির জাত উন্নয়ন করে থাকি তার মধ্যে বর্তমানে কৃত্রিম প্রজনন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জেনেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমেও জাত উন্নয়ন সম্ভব।

সরকার পশু পাখির জাত উন্নয়নের জন্য প্রতি বিভাগে একটি করে গো-প্রজনন খামার এবং একটি পশু প্রতিপালন ইউনিট স্হাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে ঢাকা বিভাগের সাভারে একটি কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন খামার ও ফরিদপুরে একটি পশু প্রতিপালন ইউনিট স্হাপন করা হয়েছে। রাজশাহী বিভাগের রাজবাড়ী হাটে একটি গো-প্রজনন ইউনিট স্হাপন করা হয়েছ এবং বগুড়া জেলার শেরপুরে একটি গবাদি পশু প্রতিপালন ইউনিটের কাজ অতিশীঘ্র শুরু হবে। সিলেট বিভাগের সিলেটে একটি গবাদি পশু প্রতিপালন ইউনিট স্হাপন করা হয়েছে এবং চট্রগ্রামে একটি গো-প্রজনন খামার স্হাপন করা হয়েছে। বরিশাল বিভাগের বরিশালে একটি গো-প্রজনন খামার স্হাপনের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।

গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৩টি বৃহত্তর জেলায় একটি করে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র (যেখান থেকে সিমেন উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণের ব্যবস্হা করা হয়) এবং থানা পর্যায়ে ৮৪৭টি উপকেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে সারাদেশে ব্যাপক গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চালু আছে। এ ব্যবস্হা গ্রহণের ফলে বর্তমানে দেশে প্রায় দশ লক্ষের অধিক শংকর জাতের গবাদি পশু উৎপাদিত হয়েছে। উল্লেখ্য, শংকর জাতের গাভী কমপক্ষে ৭লিটার ও দেশে বর্তমানের রেকর্ড অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৩৫ লিটার পরিমাণ দুধ দিচ্ছে। তাছাড়া, অধিক দুগ্ধ উৎপানশীল শংকর জাতেরগাভী উৎপাদন হওয়ায় বেসরকারী পর্যায়ে আট হাজারের উর্ধ্বে খামার (প্রতিটিতে পাঁচ বা ততোধিক গাভী আছে) স্হাপনাসহ জনসাধারণের মধ্যে খামার স্হাপনে যথেষ্ট উৎসাহী ও উদ্দীপনার

সৃষ্টি হয়েছে। ফলে একদিকে স্থানীয় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক এবং অন্যদিকে দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বিপুল সংখ্যক বেকার জনসাধারণের আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উন্নত জাতের হাঁস মুরগী প্রতিপালন গ্রামীণ এলাকায় ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী, বেকার যুবক ও দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আর্থিক উপার্জনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন হয়েছে। দেশে সরকারী পর্যায়ে ৩৩টি মোরগ মুরগী খামার ও ২টি হাঁস প্রজনন খামারে উন্নত জাতের হাসঁ মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন ও প্রতিপালন কর্মসূচি গ্রহণ করতঃ তা পরিকল্পিতভাবে গ্রামীণ এলাকায় সরবরাহ কার্যক্রম নিশ্চিত করার ফলে দেশে সরকারী পর্যায়ে উন্নত জাতের এক দিনের বাচ্চা প্রতিপালন, বাড়ন্ত হাঁস মুরগী প্রতিপালন ইত্যাদি দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

সুষম খাদ্য উৎপাদন করে বিক্রয় করার জন্য প্রতিটি কারখানায় ১০ লক্ষ টাকার আবর্তক তহবিল রয়েছে। সরকারী পর্যায়ের সাথে সাথে ব্যক্তিমালিকানা খামারেও নিজস্ব উদ্যোগে পশু খাদ্য উৎপাদন করা হচ্ছে।

উন্নত মানের গবাদিপশু ও মোরগমুরগী

ক) **গবাদি পশু**

১. Shahiwal	Australia
২. Frisian	Denmark
৩. Shahiwal X Frisian	German
	Newzeland
৪. Frisian X local	Dairy farm
৫. Hariana	India (Pabna)
6. Red Shindi	Pakistan (Chittagong)
Indigenous	-

খ) **মোরগ মুরগী**

1. RIR (Rhode Island Red) --- American Class
2. RIW (Rhode Island White) -- American Class
3. White Leghorn --------Mediterranean

Australorps------- English Class

উন্নত ঘাস চাষ সম্প্রসারণ

কালের বিবর্তনে প্রায় শুন্যের কোঠায় নেমে আসা উন্নত ঘাস চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে । এ অবস্থায় বর্তমানে ২৩টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রকে 'বেস ফডার নার্সারী '' হিসেবে তৈরী করা হয়েছে । তাছাড়া পশু সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রতিটি থানা চিকিৎসালয় , জেলা অফিস সাধারণ ফডার নার্সারী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে । একটি পশু পুষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্রসহ সকল গো-প্রজনন খামার এবং মহিষ প্রজনন খামার ঘাস চাষের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে । এই সমস্ত খামার নার্সারী ও অন্যান্য ফডার নার্সারী হতে প্রয়োজনীয় ঘাসের বীজ, কাটিং ইত্যাদি আগ্রহী জনসাধারণের নিকট ন্যায্যমুল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে ।

জনশক্তি উন্নয়ন ও কৃষক প্রশিক্ষণ

গ্রামীণ এলাকায় পশু সম্পদ উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি সঠিকভাবে হস্তান্তরের জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম । এই জন্য গবাদি পশু উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে) জনশক্তি ও কৃষক প্রশিক্ষণের সংস্থাপন অনুযায়ী পশু সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব স্ব ক্ষেত্রে উপযোগী করা হয়েছে । বিভাগীয় কর্মকর্তা/মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে উপযোগী করা হয়েছে । বিভাগীয় কর্মকর্তা/মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য পশু সম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে একটি অফিসার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং ৪টি মাঠকর্মী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে । এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/মাঠকর্মী প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিভিন্ন কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । ফলে, উন্নত পশু সম্পদ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ জনসাধারণের অবহিত হওয়ার কারণে বেসরকারী পর্যায়ে উন্নত গবাদি পশু ও হাঁসমুরগী প্রতিপালন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

পশু সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিবিধ সমস্যা

রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

ঔষধ সংক্রান্ত আইন ঃ যেখানে মানুষের রোগ ব্যাধির চিকিৎসার জন্য প্রায় ৩৮০০ টি ঔষধ রেজিষ্ট্রেশন করা আছে, সেখানে পশু স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মাত্র ২৫০টি ঔষধ এখন পর্যন্ত রেজিষ্ট্রেশন হয়েছে । ফলে একদিকে দেশে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের দুস্প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে , অন্যদিকে প্রয়োজনীয় ঔষধ না পাওয়ায় দেশের পশু সম্পদের প্রকৃত ক্ষতি হচ্ছে । রেজিষ্ট্রেশন জটিলতার নিরসনের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কীটনাশক ও ঔষধের ন্যায় পশু পাখির চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রের রেজিষ্ট্রেশন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা অপরিহার্য ।

গবাদি পশু ও উহার উৎপাদিত দ্রব্য বাহিত রোগ মানুষের মধ্যে সংক্রমন দমনের জন্য এবং কসাই খানার উপজাত দ্রব্য পশু খাদ্য হিসাবে সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য পশু জবাই আইন (Animal Slaughter and Meat control Act) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন (Milk andf milk products control Act) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্ত করা অপরিহার্য ।

পশু চিকিৎসার অভাব দুরীকরণ

জেলা ও বিভাগীয় হাসপাতাল ও পশু চিকিৎসকের অভাব

বর্তমানে থানা পর্যায়ে প্রতিটি থানায় একটি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় হাসপাতাল রয়েছে । ফলে থানা পর্যায় হতে পশু চিকিৎসকগণ যখন পদোন্নতি প্রাপ্ত হন তখন তাঁরা চিকিৎসা কার্যক্রম হতে সম্পৃক্ততা হারিয়ে ফেলেন যা দক্ষ পশু চিকিৎসক সৃষ্টির অন্তরায় । উন্নয়নের বর্তমান পর্যায়ে জনসাধারণের উন্নত পশু চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা মিটানোর জন্য জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে জেলা ও বিভাগীয় হাসপাতাল তৈরী করা বিশেষ প্রয়োজন ।

বর্তিমানে দেশে রাজস্ব বাজেট ভুক্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পশু চিকিৎসকের পদ খালি আছে । অন্যদিকে উন্নয়ন প্রকল্পেও ৪০০ টির উপর পশু চিকিৎসকের পদ পুরণের অপেক্ষায় আছে । এ শুন্যপদগুলো পুরণ করা জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন ।

পশু সম্পদ উন্নয়নের নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রচলিত ডিগ্রীর পরিবর্তে পাশ্ববর্তী দেশসমুহের ন্যায় একটি সমন্বিত ডিগ্রী প্রদান করা হলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পশুপালক কাম-চিকিৎসক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে তৈরী করা সম্ভব হবে । এ বিষয়েও আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য ।

গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর জাত উন্নয়ন ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার স্থাপনে সমস্যা ঃ

ক) গাভীর হিমায়িত সিমেনের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমকে জোরদার করা এবং এমব্রয়ো ট্রান্সফার প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া জনিত জটিলতা দুর করার জন্য স্থানীয় অর্থে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ।

খ) দুঃস্থ মহিলা, ভূমিহীন প্রান্তিক চাষী ও শিক্ষিত বেকার যুবকদের গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর খামার স্থাপনে উদবুদ্ধ করার নিমিত্তেঃ

- বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকের হার কমানোসহ সংশ্লিষ্ট খামারকে বন্ধকী হিসেবে গণ্য করতঃ ঋণ গ্রহণে
- জটিলতা নিরসনের প্রয়োজন
- দুগ্ধ ও হাঁস মুরগী খামারকে শিল্প হিসেবে গণ্য করে শিল্পখাতে দেয়া সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন
- গবাদি পশু ও হাসঁ মুরগীর খামার স্থাপনে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যুৎ বিলের হার কমানো প্রয়োজন
- গবাদি পশু ও হাসঁ মুরগী খামারগুলো সাধারণতঃ শহর এবং শহরের আশে পাশেরএলাকায় অবস্থিত বিধায় উক্ত খামারের জন্য ভুমি কর কমানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা প্রয়োজন
- বর্তমানে স্থাপিত শহররগুালে দুগ্ধ ও হাসঁ মুরগীর খামার পরিবেশ দুষণ করছে বলে পৌর সভা কর্তৃপক্ষ খামার মালিক গণ হয়রানির শিকার হচ্ছে । এ সমস্যা সমাধানের জন্য শহরের দুরে দুগ্ধ ও হাঁস মুরগীর খামার নগরী স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন
- বিদেশ থেকে বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় ২০০ কোটি টাকার গুড়ো দুধ আমদানী করা হচ্ছে । ফলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দুগ্ধ অসম প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হওয়ার কারণে দেশে উন্নত জাতের গবাদি পশু উৎপাদন ও প্রতিপালনে নিরুৎসাহিত হচ্ছে । সুতরাং বিদেশ থেকে গুড়ো দুধ আমদানীর নির্ভরশীলতা ক্রমাগত কমানোর জন্য শতকরা ১০০ ভাগ আমদানী শুল্ক ধার্য করতে হবে
- দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত উন্নতমানের গাভী/বকনার সংখ্যা চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয় । এই চাহিদা মেটানোর জন্য পাশ্ববর্তী দেশ ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া হতে উন্নত জাতের বকনা আমদানী করে ভতূর্কী মুল্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- দেশীয় উৎপাদিত দুধের কোন সুষ্ঠ বিপনন ব্যবস্হাপনা না থাকায় বিভিন্ন এলাকায় একদিকে দুগ্ধ উৎপাদনকারীগণ ন্যায্য মুল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । অন্যদিকে শহরের অধিবাসীগণ অধিকমুল্যে দুধ ক্রয়ে বাধ্য হচ্ছেন । এই অবস্থা নিরসনের জন্য ভারতসহ অন্যান্য দক্ষিণ এশিয় দেশের মত সারা দেশে দুগ্ধ বিপনন নেট ওয়ার্ক তৈরীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে
- উল্লেখ্য , উন্নতজাতের হাসঁ মুরগী প্রতিপালনের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার ভূমিহীন প্রান্তিক বেকার ও দুঃস্থ মহিলাদের আর্থিক আয় ও ব্যাপক কর্মসংস্থান উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিদেশ হতে ডিম আমদানী ইতোমধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ।

গবাদি পশু ও হাসঁ মুরগীর সুষম খাদ্য উৎপাদন সমস্যা

ক) বেসরকারী পর্যায়ে গবাদি পশু ও হাসঁ মুরগীর খামার স্থাপন উৎসাহিত করার জন্য সুষম খাদ্য ন্যূনপক্ষে ২০-৩০% ভতূর্কী মুল্যে প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে । ভতূর্কী সুষম খাদ্য প্রদান সুবিধা উন্নত ও উন্নয়নশীল সমস্ত দেশেই বিদ্যমান ।

খ) সুষম খাদ্য তৈরীর জন্য যে সমস্ত সামগ্রী ও উপজাতসহ ভিটামিন ও মিনারেল দ্রব্যাদি প্রয়োজন , তা বিদেশ হতে আমদানী শুল্ক মুক্ত রাখতে হবে ।

গ) চাষযোগ্য জমির সীমাবদ্ধতার জন্য বড় রাস্তা, রেল লাইন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের দুই ধারে উন্নত ঘাস চাষ ও ফডার জাতীয় গাছ লাগানো জাতীয় বনায়ন কর্মসুচির অন্তর্ভূক্ত রাখতে হবে ।

ঘ) উন্নত ঘাস চাষের জন্য এবং আন্তঃ ফসল ঘাস এবং বনভূমির উপযোগী ঘাষ চাষ উৎসাহিত করার জন্য কৃষি ও বন বিভাগের সাথে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণে জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

বিবিধ সমস্যা ও প্রস্তাব

ক) পশু চিকিৎসা কার্যক্রমে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরী ও পোলট্রি ইকুইপমেন্ট, ঔষধ ইত্যাদি আমদানীর ক্ষেত্রে বর্তমান আমদানী শুল্ক নিম্নতম পর্যায়ে নির্ধারণ করতে হবে। তাছাড়া, উৎসাহী খামার মালিকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঔষধ আমদানীর সুযোগ নেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।

খ) পশু সম্পদ খাতকে শিল্প অথবা কৃষি কোন খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে শিল্প এবং কৃষি খাতকে ঋণ প্রদান, সুদ মওকুফ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে সুবিধা দেয়া হয়, পশু সম্পদ খাত সে সমস্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ) বেসরকারী পর্যায়ে যে সমস্ত উন্নতজাতের গবাদি পশু ও হাসঁ মুরগী খামার গড়ে উঠেছে তা সরকার ঘোষিত নিয়ম অনুযায়ী আয়করমুক্ত রাখতে হবে।

ঘ) দেশে যত্রতত্র গরুমহিষ ও ছাগল-ভেড়া জবাই হওয়ার ফলে ইহার উপজাতসমূহ সঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। তাছাড়া, চামড়া ছাড়ানো সঠিক পদ্ধতিতে না হওয়ায় প্রচুর চামড়া নষ্ট হওয়ায় রপ্তানী আয় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এই ব্যাপারে কার্যকরপদক্ষেপ গ্রহণ করার লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড় বড় শহরে আধুনিক কসাইখানা তৈরী করতে হবে এবং সেই সংগে মাংস ও বিভিন্ন মাংস জাত তৈরী কারখানা উপজাত ব্যবহার, চামড়া ছাড়ানো ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আমরা একটি সম্পদ উন্নয়ন করতে গিয়ে অন্যান্য সম্পদ ধ্বংশ করছি কি না সেটি পর্যালোচনা করার পর বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া উচিত। বর্তমানে বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্ণতা অর্জনের জন্য শুধুমাত্র কৃষির উপরে জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র শস্য উৎপাদনই খাদ্যে স্বয়ং সম্পুর্ণতার জন্য যথেষ্ট নয়। শস্যের পাশাপাশি গবাদি পশু ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের দিকেও আমাদের কার্যকর দৃষ্টি দিতে হবে।

দেশের পশু সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে আমরা সবাই আন্তরিক হবো। এ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের পুষ্টি ঘাটতি মেটাতে এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে যত্নবান হবো।

বাংলাদেশের বনসম্পদ উন্নয়ন কৌশল

* কাজী হাসান ইমাম

১.০ ভূমিকা

বর্তমানে স্থানিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বনসম্পদের উন্নয়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ প্রয়োজনটি অধিকতর গভীরভাবে অনুভূত। পৃথিবীর সবচেয়ে জন-অধ্যুষিত দেশের একটি হলেও ন্যূনতম প্রয়োজনের তুলনায় বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ অনেক কম। অঞ্চলভেদে বিদ্যমান বনভূমির বন্টনও খুবই অসম। অপরিমিত বনাবস্থা ও বনভূমির অসম বন্টনের কারণে দেশের অর্থনীতি ও জনপদে সৃষ্ট সমস্যা বহুবিধ এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত মারাত্মক। এ সকল সঙ্কট উত্তোরণের প্রয়োজনে বনসম্পদের উন্নয়ন অত্যাবশ্যক।

দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতি অবকাঠামোয় যে কোন সম্পদের উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশ্নটি সম্পদের গুরুত্বের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। সাধারণত গুরুত্ব বিবেচনায় সম্পদের যথার্থ উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের বিষয়টি নিরীক্ষিত হয়ে থাকে। সুনির্দিষ্টভাবে দেশের বনসম্পদ উন্নয়নের আলোচনায় নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় বিশেষভাবে পর্যালোচিত হওয়া আবশ্যক ঃ

ক. দেশের উন্নয়ন নীতিমালা, আর্থ-পরিবেশ ও সামজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বনসম্পদের গুরুত্ব কতখানি ? অর্থাৎ বনসম্পদের বিদ্যমান ও স্থৈতিক সম্ভাবনাময়তা কতখানি ?

খ. দেশের বনসম্পদের বর্তমান অবস্থা কী এবং তার আর্থ-সামজিক ও পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া কী ?

গ. বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে দেশের বনসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গৃহীত ও গৃহীতব্য কৌশলসমুহ কী কী এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এ সকল কৌশল প্রয়োগের ফলাফল কী ?

বনসম্পদ উন্নয়নের কৌশলগত দিকসমুহ আলোচনার সাথে আরো কতগুলো বিষয় নিবিড়ভাবে জড়িত। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. বিদ্যমান বনসম্পদের প্রকৃতি কী ?

খ. কালিক প্রেক্ষাপটে বনসম্পদের গুরুত্ব কতখানি ?

---

* উপ-পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

গ. বন ব্যবস্থাপনার ধরন কিরূপ ?

ঘ. বিদ্যমান জ্বালানী ব্যবস্থার সাথে বনসম্পদের সম্পর্ক।

আলোচ্য প্রবন্ধে এ বিষয়গুলোও খতিয়ে দেখা হয়েছে।

২.০ বনসম্পদের গুরুত্ব

জীবন প্রতিপালন পদ্ধতির (*Life Support System*) অংশ হিসেবে বনসম্পদ একটি স্বকীয় উৎপাদক হিসেবে বিবেচিত। আবার অনেক উৎপাদকের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বনসম্পদ অণুঘটকের ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ ছাড়াও সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে বনসম্পদের নান্দনিক দিকগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিম্নে বনসম্পদের গুরুত্বের দিকগুলো সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো ঃ

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বনসম্পদের একক অবদান উল্লেখযোগ্য।

খ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ,[১] ভূমিক্ষয় রোধ,[২] ইত্যাদিতে বনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গ. ভূমিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা রক্ষায় এবং পানিসম্পদ উন্নয়নে বনের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে[৩]।

ঘ. আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কাঠ ও জ্বালানী হিসেবে বনসম্পদের ব্যবহার প্রাধ্যন্য পেয়ে থাকে।

ঙ. এ ছাড়াও বনসম্পদ কাঠভিত্তিক শিল্প যেমন, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, হার্ডবোর্ড, ম্যাচ ইত্যাদির প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চ. পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বনসম্পদের প্রয়োজন অনিবার্য।

---

১ Government of the People's Republic of Bangladesh : The Fourth Five Year Plan 1990-95, Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1990, পৃ. ঠ.উ ১।

২ সিদ্দিকী, গিয়াস ঃ সবুজ স্বর্ণ ঃ বনদস্যুদের তৎপরতা; পরিবেশ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা ১৯৯৪, পৃ. ৭।

৩ Barner, J. : Experimentelle Landschaftsoekologie. : Lehrbuch der Uuweltforschung. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1983, pp.31-34.

ছ. বনভূমি থেকে সংগৃহীত বাঁশ, বেত, মধু, মোম, জীবজন্তু, জীবজন্তুর চামড়া, শিং, দাঁত, ভেজষ দ্রব্যাদি ইত্যাদি একদিকে যেমন দেশের অভ্যন্তরে ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অন্যদিকে এগুলোর অনেক কিছু রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

ঝ. দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ক্ষেত্রে বনসম্পদের অবদান প্রায় তিন শতাংশ[৪]।

ঞ. শ্রমশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে বনভিত্তিক শিল্পের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে[৫]।

৩.০ বনসম্পদের বর্তমান অবস্থা এবং তার আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব

সুদূর অতীতকাল থেকেই বঙ্গদেশ নামক এ ভু-খণ্ডটি ছিল ঘন অরণ্যে পরিপূর্ণ। ক্রান্তীয় জলবায়ু ও উর্বর মাটির কারণেই এখানে সৃষ্টি হয়েছিল একটি চিরহরিৎ অরণ্যের ঘন আচ্ছাদন[৬]। মুলত বৃটিশ ঔপনিবেশিককাল থেকেই এদেশে শুরু হয় ব্যাপক অরণ্য নিধনযজ্ঞ। এ সময়ে খুব সীমিত পরিসরে বৃক্ষায়নের মাধ্যমে নতুন বন সৃষ্টির প্রক্রিয়া চালু থাকার চিত্র পাওয়া গেলেও ধীরে ধীরে বন কেটে কৃষির পত্তন ঘটানো হয়; গড়ে ওঠে জীবন সংগ্রামী বসতি এবং নির্বিচারে উজাড় হতে থাকে এদেশের বনসম্পদ। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং পরবর্তীতে বনের এই নিধনযজ্ঞ, বিশেষত গ্রামীণ বনোজাড় বেড়ে চলে আরো দ্রুততাগতিতে। দ্রুত গ্রামীণ বনোজাড়ের সংগত কারণ হিসেবে এখানে ১৯৭১ সালের বন্যা, যুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতি ও ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষকে দায়ী করা হয়। এ সময়ে মানুষ নির্বিচারে বাড়ীর আশে-পাশের গাছ-পালা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে বেছে নেয়। দারিদ্রের চরম নিপীড়নে গ্রাম-বাংলায় এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত।

কিন্তু "....... একটি এলাকার সুস্থিত উদ্ভিজ্জ বা *'কলাইম্যাক্স ভেজিটেশন'* বিনষ্ট হওয়ার অর্থ কতগুলো গাছপালা নির্মূল হওয়া নয়--- সেই সংগে প্রাণিকুল, কীটপতঙ্গ প্রভৃতিও নির্মূল হয়ে যাওয়া, ' ট্রাফিক লেভেল' বা অস্তিত্ব স্তরসমূহের অবলুপ্তি হওয়া, *'ইকোসিস্টেম'* বা বাস্তব্যরীতিতে বিপর্যয় আসা[৭]....." --- সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে এখনই এ চেতনাবোধের উৎসারণ ঘটানো না গেলে বাংলাদেশ নামক এ ভুখণ্ডটি ক্রমাগত আরো বনহীন হয়ে পড়বে এবং অদুর ভবিষ্যতে অপ্রতিরোধ্য আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

---

৪ Government of the People's Republic of Bangladesh. : Participatory Perspective Plan for Bangladesh 1995-2010. Document 4 : Sectoral Plan, Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, p.18.

৫ Ibid.

৬ Rashid, Harun Er. : Geography of Bangladesh. University Press Ltd., Dhaka, 1977, p. 129.

৭ চৌধুরী, সিরাজুল ইসলমম. ঃ আর্থনীতিক ভূগোল ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্ব. দি সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২২।

একটি দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে ঐ দেশের মোট আয়তনের ন্যূনপক্ষে ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা আবশ্যক[৮]। কিন্তু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জিতে ১৯৮৫-৮৬ সালে দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ১৩.৪১ শতাংশ দেখানো হয়েছে। একই সময়ে পরিচালিত অর্থনৈতিক জরীপে বনাঞ্চলের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৯.৩ শতাংশ; দি টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট, ১৯৯১-তে বনের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে ৯.৮৭ শতাংশ (সারণি-১)। অনেকের মতে, এর প্রকৃত পরিমাণ আরো কম। অবশ্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রিপোর্ট ও বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত উপাত্ত অনুসারে বর্তমানে দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৭ শতাংশ। অন্যদিকে একই জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বার্মা, নেপাল প্রভৃতি দেশের বনভূমির পরিমাণ অনেক বেশি। ইন্দোনেশিয়ার বনভূমির পরিমাণ প্রায় ৭৫ শতাংশ, যা ইউরোপের তুলনায় ২.৫ গুণ বেশী[৯]।

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বনভূমির পরিমাণ সংক্রান্ত উপাত্তের ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞসহ সকল মহল এব্যাপারে একমত যে, বর্তমানে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সীমারেখারও অনেক নীচে। সমস্যার গভীরতা আরো বেশী অন্যখানে। দেশের বনসম্পদের পরিমাণ যা-ই থাকুক না কেন, তা' সুষম বন্টিত নয় (সারণি-১ ও ২)। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বনভূমির ৯০ শতাংশেরও বেশি দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় মাত্র ১২টি জেলায় পুঞ্জীভূত; ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৮টিতে কোন রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই[১০]। মোট বনভূমির মাত্র ৯ শতাংশ রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত। অথচ এ দু'টি বিভাগে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৪ শতাংশ বসবাস করে (সারণি-২)। জেলাভিত্তিকভাবে কেবলমাত্র খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও রাংগামাটি এ ৬টি জেলায় পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করার মত প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণ বনভূমি আছে; বিভাগভিত্তিকভাবে কোন বিভাগেই প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণ বনভূমি নেই (সারণি-১)।

দেশের বনাঞ্চলের এই অপ্রতুলতার কারণে উদ্ভূত আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া বহুবিধ। সমস্যার উত্তোরণে এগুলোকে ব্যাষ্টিক ও সমষ্টিগত দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সমষ্টিগত প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার একটি দিক হচ্ছে অর্থনৈতিক। ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) বনসম্পদের অবদান ছিল ৫

---

৮ ibid, p. 61.

৯ The World Bank. : Indonesia : Sustainable Development of Forests, Land and Water, a World Bank Country Study, Washington D.C, 1990, pp. xix-xx.

১০ Government of the People's Republic of Bangladesh. : The Fourth Five Year Plan, 1990-95. Planning Commission, Minisstry of Planning, Dhaka, 1990, p. V.E. 1; and Participatory Perspective Plan for Bangladesh 1995-2010. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1990; Document 4 : Sectoral Plan, p.19.

শতাংশ[১১]। বর্তমানে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ৩ শতাংশে। বৃক্ষরোপণ, গাছকাটা এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কাজে বনাঞ্চলে যেমন বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, তেমনি বহুসংখ্যক শ্রমিকের দরকার হয় বনসম্পদ নির্ভর শিল্পগুলোতে। দু'এক দশক আগেও দেশের মোট শিল্প সংক্রান্ত

সারণি-১ ঃ অঞ্চলভিত্তিক বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ, ১৯৯১

অঞ্চল	বনভূমির পরিমাণ একর	বর্গ কিঃমিঃ	মোট আয়তনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ (%)*
ঢাকা	২০২১.২৩	৮.১৮	০.৫৮
গাজীপুর	৬২৯৬৫.৫০	২৫৪.৮১	১৪.৪৫
ময়মনসিংহ	৩৮৮২৮.৬৬	১৫৭.১৩	৩.৭৪
টাঙ্গাইল	১২২৭৭৬.০৬	৪৯৬.৮৬	১৪.৬৬
জামালপুর	১০৩৬৪.৩৮	৪১.৯৪	২.০৭
শেরপুর	১৯৪৬৯.১২	৭৮.৭৯	৫.৭০
নেত্রকোনা	২০৭৯.৯৯	৮.৪২	০.২৮
ঢাকা বিভাগ	**২৫৮৫০৪.৯৪**	**১০৪৬.০৮**	**৩.৩৬**
চট্টগ্রাম	৩১৫৬১০.০৮	১২৭৭.২৩	২৫.৮৬
কক্সবাজার	২৪৭৪৮০.৫৩	১০০১.৫২	৪৩.৯৯
বান্দরবন	২৫১৯৭৯.৮৮	১০১৯.৭৩	২২.৩৬
রাঙ্গামাটি	৬৩৮০১২.৫১	২৫৮১.৯৫	৫৮.৪৭
খাগড়াছড়ি	৮৮৪৮৮.৬৫	৩৫৮.১০	১২.৬৫
কুমিল্লা	১৭২০.৯৩	৬.৯৬	০.২৩
নোয়াখালী	৬০১১১.৯৭	২৪৩.২৬	৯.০৪
ফেনী	১৯১.৮৩	০.৭৮	০.০৪
লক্ষ্মীপুর	৪৭৩৫.০০	১৯.১৬	১.১৬
সিলেট	৫১৯০৯.৪৪	২১০.০৭	৬.২৪
হবিগঞ্জ	৩৭৬৪৯.৬৭	১৫২.৩৬	৫.৯১
মৌলভীবাজার	৭০৬৮৩.১৭	২৮৬.০৫	১০.৫৯
সুনামগঞ্জ	২৬৪৭১.৪৪	১০৭.১৩	২.৮৬
চট্টগ্রাম বিভাগ	**১৭৯৫০৪৫.১০**	**৭২৬৪.৩০**	**১৫.৪৫**
খুলনা	৩৫৭৩৯৯.৮৬	১৪৪৬.৩৫	৩৩.১৬
সাতক্ষীরা	৪০০৯৬৪.৮৩	১৬২২.৬৫	৩৩.১৬
বাগেরহাট	৬৬৮৪৩০.০০	২৭০৫.২৫	৬৯.৬৭
পটুয়াখালী	২৬৭৯০.৭৯	১০৮.৪২	২.৫০
বরগুনা	২৮৭৮০.৯৪	১০৮.৪২	১০.৫৭
ভোলা	৪১৪৯৫.৪৬	১৪৭.৯৩	৫.৬৩
পিরোজপুর	১৩১২.০০	৫.৩১	০.৩৮
খুলনা বিভাগ	**১৮৯৮৬৭৪৬.১০**	**৭৬৮৩.৬৮**	**২১.৫০**
দিনাজপুর	১৮৬৯১.০১	৭৫.৬৪	২.১৩
ঠাকুরগাঁও	১৯৬৮.৭৪	৭.৯৭	০.৪৪
পঞ্চগড়	৪৬৯৫.৮৬	১৯.০০	১.৩৫
নওগাঁ	৭০১০.৬৪	২৮.৩৭	০.৮৩

১১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জরীপ 1981-82, c,,. 19; I 1983-84, c,,. 31; The First Two Year Plan, 1978, c,,. 105; The Second Five year Plan 1983, c,,. 143.

অঞ্চল	বনভূমির পরিমাণ একর	বর্গ কিঃমিঃ	মোট আয়তনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ (%)*
রংপুর	৩৪১৯.৬৯	১৩.৮৪	০.৬০
নীলফামারী	২৭১৮.৭৭	১১.০০	০.৬৭
কুড়িগ্রাম	৫৩.০৩	০.২১	০.০১
লালমনিরহাট	৮৪.৬৩	০.৩৪	০.০৩
গাইবান্ধা	১.৮৫	০.০১	০.০০
রাজশাহী বিভাগ	**৩৮৬৪৪.২২**	**১৫৬.৩৯**	**০.৪৫**
বাংলাদেশ	**৩৬১৭৩৬.৪৮**	**১৪৬৩৮.৯৯**	**৯.৮৭**

উৎস ঃ *The Task Forces Report, Vol. Four, ১৯৯১.*

* *পরিসংখ্যান মোতাবেক হিসাবকৃত।*

শ্রমিকের শতকরা ১৫ ভাগ নিয়োগ করত শুধুমাত্র অরণ্য সম্পদ নির্ভর শিল্পগুলো[১২]। কিন্তু বনসম্পদের পরিমাণ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে এ উপ-খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে। বর্তমানে এর পরিমাণ দেশের মোট শ্রমিকের মাত্র ২ শতাংশ[১৩]।

বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনাঞ্চলের মাত্র ৬১ শতাংশ এলাকা উৎপাদনশীল বনভূমি হিসেবে বিবেচিত; বাকী এলাকা ঝোপ-ঝাড়, লতাগুল্ম বা তৃণ আচ্ছাদিত অথবা সম্পূর্ণ বিরানভূমি। প্রকৃতি ও অবস্থানভেদে বনভূমির বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ ৩০ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ। গুণগত মান বিচারে এ সমস্ত এলাকার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের বনভূমি খুবই নিম্নমানের। বিগত কয়েক দশক ধরে অতিমাত্রায় বনসম্পদ আহরণ এর মূল কারণ। বৃক্ষাচ্ছাদিত বনাঞ্চলের পরিমাণ হ্রাসের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতার তীব্রতা[১৪]। বিগত এক দশকের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পললায়ন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও ভূমিক্ষয়ের তীব্রতা বেড়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। তুলনামূলক উচ্চভূমিতে অবস্থিত হলেও উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলো প্রায়শই ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে; জন-জীবন হয়ে উঠছে অতিষ্ট। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে কৃষিকার্য ব্যাহত হচ্ছে দারুণভাবে। বনভূমি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কারণে উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে ভয়াবহ মরুকরণ প্রক্রিয়া দেখা দিচ্ছে; দেশের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কিছু জেলাতেও (যেমন-যশোর, চুয়াডাংগা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি) মরুকরণের

১২ চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম. ঃ আর্থনীতিক ভূগোল ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্ব. দি সিটি প্রেস. ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৬৭।

১৩ Government of the People's Republic of Bangladesh. : The Fourth Five Year Plan, 1990-95. Planning Commission, Minisstry of Planning, Dhaka, 1990, p. V.E. 1; and Participatory Perspective Plan for Bangladesh 1995-2010. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1990; Document 4 : Sectoral Plan, p.19.

১৪ ibid.

প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বনসম্পদ ধ্বংসের কারণে বন্যপ্রাণির আবাসস্থল কমে যাচ্ছে। পরিবেশ ও জৈব-বৈচিত্রে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হচ্ছে[১৫]। এ পর্যন্ত এ দেশ থেকে ২৩টি প্রজাতির বন্যপ্রাণি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; ২৭টি প্রজাতি বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে আছে এবং ৩৯টি প্রজাতির জীবন হুমকির সম্মুখীন[১৬]। বাংলাদেশের যে সমস্ত এলাকাকে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা "মারাত্মকভাবে পরিবেশ অবক্ষিত" বলে চিহ্নিত করেছেন, তার ব্যাপক অংশের পরিবেশ অবক্ষয়ের মূল কারণ হচ্ছে বনোজাড় ও বনসম্পদের অপ্রতুলতা[১৭]। এছাড়া প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অন্যান্য জেলাগুলোতেও নিতান্ত কম নয়। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির পঙ্গুত্ব এ সমস্ত কারণে বহুলাংশে প্রভাবিত।

সারণি-২ ঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও বনভূমির আঞ্চলিক বন্টন (শতাংশে), ১৯৮৮

অঞ্চল	জনসংখ্যা (%)	বনভূমির পরিমাণ (%)
রাজশাহী বিভাগ	২৪	২
ঢাকা বিভাগ	৩০	৭
খুলনা বিভাগ	২০	৪২
চট্টগ্রাম বিভাগ	২৬	৪৯
মোট	১০০	১০০

উৎস ঃ *হোসেন, এম, মোজাম্মেল ঃ বাংলাদেশের বনসম্পদ, জ্বালানী শক্তির চাহিদা ও সম্ভাবনা, একটি গবেষণা (মিমিও), ১৯৯০, পৃ. ৫।*

ব্যাষ্টিক দৃষ্টিকোণ বিচারে প্রকৃতি ও অবস্থানভেদে বনভূমির বিচিত্রধর্মী সমস্যা বিদ্যমান। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে নিম্নে প্রকৃতি অনুসারে বনের শ্রেণীবিন্যাস (সারণি-৩) এবং বনের প্রকৃতি অবস্থানভিত্তিক সমস্যাবলী সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা হলো ঃ

---

১৫ ibid.

১৬ Nisshat, Ainun. : Key Issues of Environmental Concern for Baangladesh. Seminar Paper, BPATC, Savar, Dhaka, 1993. p.4.

১৭ ibid, p. 13-14 and Rashid, Harun Er. : Geography of Banagladesh. University Press Ltd., Dhaka, 1991.

সারণি-৩ ঃ প্রকৃতি অনুসারে বনের শ্রেণীবিন্যাস, অবস্থান ও সম্পদের পরিমাণ, ১৯৯০

বনের শ্রেণী	অবস্থান	প্রধান জাতসমূহ	এলাকার পরিমাণ (মিঃ একর)	সম্পদের পরিমাণ (মিঃ ঘনফুট)
১। পাহাড়ী বন	বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলা	গরান, চাপালিকা, সিভিট, চম্পা, তেলসুর, গামার, তুন, ঢেকিজাম, কড়ই, টিক, প্রভৃতি	১.৬৫	১,১৬৫.২০
২ক। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন	বৃহত্তর খুলনা ও পটুয়াখালী জেলা	সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, বিন, গরান, পশুর, গোলপাতা প্রভৃতি	১.৪৬	৪৮৯.৬১
২খ। উপকুলীয় বন	বৃহত্তর পটুয়াখালী, এবং চট্টগ্রাম জেলার উপকুলীয় অঞ্চল	কেওড়া ও বিন	০.৩০	
৩। সমতুল ভুমির শালবন	বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর জেলা	শাল, কড়ই, হলদী, ভাদী, বহেড়া, আমলকী প্রভৃতি	০.৩০	৫১.৮৯
৪। গ্রামীণ বন	সমগ্র বাংলাদেশ	বিভিন্ন ধরনের গাছ-পালা ফলের গাছ ও বাঁশ প্রভৃতি	০.৬৭	১,৯৩১.৮০
মোট			৪.৩৮	৩,৬৩৮.৫০

উৎস ঃ *Ali, Omar M. : Bangladesh Forests with Special Reference to Demand and Supply of Fuelwood; a research mimio, BARC, Dhaka, 1990.*

৩.১ পাহাড়ী বন

পাহাড়ী বনভুমির মোট আয়তনের ৭০ শতাংশ মাত্র বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং এরও বেশ কিছুটা নিম্নমানের। প্রজাতিগত দিক থেকে এগুলো দীর্ঘমেয়াদী আবর্তক জাতের এবং কৃত্রিম পুনর্জন্ম অনুসরণের মাধ্যমে "ক্লিয়ার ফেলিং" প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপিত হয়। অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভুমি পার্বত্য জেলাগুলোতে অবস্থিত। স্মরণাতীতকাল থেকে অনিয়ন্ত্রিত ঝুমচাষের

ফলে এতদাঞ্চলের বনভূমি সম্পূর্ণ বৃক্ষবিহীন হয়ে পড়েছে;[১৮] ভূমিক্ষয়ের হারকে বাড়িয়ে দিয়েছে তীব্রভাবে। ফলত সম্পূর্ণ এলাকাটি পরিণত হয়েছে একটি অনুৎপাদনশীল ভূমিতে; ক্রমাগত ভূমিক্ষয়ের কারণে এলাকার নদীগুলোর নাব্যতা কমে যাচ্ছে; প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে বনসম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে এবং দেশের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন উৎস কাপ্তাই হ্রদের আয়ুস্কাল সীমিত হয়ে আসছে[১৯]।

৩.২ প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় বন

আর্থিক দিক থেকে প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন বাংলাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অরণ্য। এই বনাঞ্চলের প্রধান প্রধান প্রজাতিসমূহ যেমন, সুন্দরীবৃক্ষ তারবার্তা, বিদ্যুৎবাহী তার ও ঘরের খুঁটি এবং নৌকা তৈরির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট; শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে গেওয়া, পেন্সিল তৈরির জন্য ধুন্দল এবং চামড়া পাকা করার জন্য গরান বৃক্ষের বাকলজাত কষ বা ট্যানিন ব্যবহৃত হয়। প্রজাতিভেদে এসকল বৃক্ষের বিচিত্রধর্মী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুন্দরীবৃক্ষ মৃত্তিকার শুষ্কতা ও লবণাক্ততা সহ্য করতে পারেনা;[২০] গেওয়া বৃক্ষ শুষ্কতার প্রতি অপেক্ষাকৃত সহনশীল। "ফাংগাস আক্রমণ"[২১] এবং " মাথা মরা "[২২] সুন্দরীবৃক্ষের জন্য একটি ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি করছে। এতে প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে দারুণভাবে। শতাব্দিকাল থেকেই ব্যাপক এলাকা জুড়ে বছরের পর বছর অনাবৃত এলাকায় বনসৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না[২৩]। বিগত ২৪ বছরে সুন্দরী ও গেওয়া প্রজাতির সম্পদের পরিমাণ কমেছে যথাক্রমে ৪০ ও ৪৫ শতাংশ; সামগ্রিকভাবে এই বনাঞ্চল উজাড় হয়েছে ২৩ শতাংশ। সাম্প্রতিক এক জরীপে দেখা গেছে যে, সুন্দরবন এলাকার ৬৫ শতাংশ বনভূমির ৭০ শতাংশ বৃক্ষাচ্ছাদিত; ৩০ শতাংশ এলাকার বনভূমি ৩০ থেকে ৭০ শতাংশের কম বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং ৫ শতাংশ এলাকার বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ ৩০ শতাংশের কম[২৪]। ম্যানগ্রোভ বনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু চকোরিয়া সুন্দরবন

---

১৮ Ali, Omar M. : Bangladesh Forests with Special Reference to Demand and Supply of Fuelwood, a research mimio, BARC, Dhaka, 1990, p. 4.

১৯ হোসেন, এম. মোজাম্মেল. ঃ বাংলাদেশের বনসম্পদ; জ্বালানী শক্তির চাহিদা ও সম্ভাবনা. একটি গবেষণা মিমিও, ১৯৯০, পৃ. ৩।

২০ Ahmed, Nafis and Fazle Karim Khan. : The Sundarban Forests of East Pakisstan : A Resource Appraisal, Oriental Geographer, Dhaka, July, 1959, pp. 17-18.

২১ ibid, p. 20.

২২ Government of the People's Republic of Bangladesh. : The Fourth Five Year Plan 1990-95, Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka p. V.E. 9.

২৩ ibid, and Curtis, S. J. : Working Plan for Forests of the Sundarban Division. Vol. I, Part I, Calcutta, 1933, p. 18.

২৪ Ali, Omar M. : Bangladesh Forests with Special Reference to Demand and Supply of Fuelwood, a research mimio, BARC, Dhaka, 1990, p. 4.

বা উপকূলীয় বনাঞ্চল। বিগত ২৫ বছরে এর ৪৩ শতাংশ বনাঞ্চল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, অতিরিক্ত বনাহরণ, চিংড়ি চাষ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অন্যান্য নানা কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জোয়ারের স্তর হ্রাস, ঘন ঘন প্লাবন ইত্যাদি এই বনোজাড়ের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত। উপকূলীয় অঞ্চলে বনোজাড়ের কারণে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসজনিত ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ অঞ্চলে ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে সামুদ্রিক ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন[২৫]।

৩.৩ সমতল এলাকার শালবন

সমতল এলাকার শালবনের অবস্থা আরো করুণ ও নিম্নমানের। এ এলাকার বনভূমির মাত্র ৩২ শতাংশ বৃক্ষাচ্ছাদিত[২৬]। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ব্যাপক আকারে অসদুপায়ে বনোৎসাদন চলে। ইতোমধ্যে এই বনের ৯৫ হাজার ৫ শত ৫৬ একর এলাকা বেদখল হয়ে গেছে। এ অবস্থা নিরসনে সরকার ১৯৭২ সালে সকল প্রকার সরকারী বনভূমি থেকে বনোৎসাদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু বাস্তবে এ জাতীয় ঘোষণা কোন কাজে আসেনি[২৭]। স্থানীয় ক্ষমতাশীল ও লোভী লোকের হাতে এর পরেও চলেছে বনের অননুমোদিত নিধনযজ্ঞ। বর্তমানে সমতল এলাকার শালবনের মাত্র ৩০ শতাংশ বৃক্ষাচ্ছাদিত[২৮]।

৩.৪ গ্রামীণ ব কুটির শিল্প ও ছোট ছোট কাঠভিত্তিক শিল্পের কাঁচামালের যোগান দিতে গিয়ে গ্রামীণ বন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। দেশের সামগ্রিক জ্বালানী সংকটের কারণে ব্যাপকভাবে গ্রামীণ বনোজাড় চলছে। ফলে ভূমি ও প্রকৃতির মধ্যে মারাত্মক প্রতিবেশ সমস্যার সৃষ্টি করছে[২৯]।

৪.০ বনসম্পদ উন্নয়নের কৌশলসমূহ

সামষ্টিক অবকাঠামোয় বনসম্পদ উন্নয়নের কৌশল হিসেবে নিম্নোক্ত তিনটি দিক বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

ক. বিদ্যমান বনভূমি সংরক্ষণ,

---

২৫ মাসুদ, আলম ঃ বাংলাদেশের বিপর্যস্তকর পরিবেশ ঃ প্রধান ইস্যুসমূহ. পরিবেশ ও আমরা, পরিবেশ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ৫।

২৬ Op cit, p. 8.

২৭ Government of the People's Republic of Bangladesh. : The Fourth Five Year Plan 1990-95. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1990, p. V.E. 2.

২৮ ibid.

২৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০. পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৩. পৃ. ২১৯।

খ. অধিকতর বনায়ন এবং

গ. জ্বালানী ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৪.১ বিদ্যমান বনভূমি সংরক্ষণ

ব্যবস্থাপনার দিক থেকে বাংলাদেশের মোট বনভূমির নব্বুই শতাংশেরও বেশি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সংরক্ষিত হয়। এককভাবে বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রণ করে প্রায় তিন চতুর্থাংশ বনভূমি। পরিমাণগত দিক থেকে কম হলেও বন অধিদপ্তরের বাইরেও বেশ কিছু সরকারী সংস্থা ও ব্যক্তিক নিয়ন্ত্রণ দেশের সামগ্রিক বন ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত (সারণি-৪)। এ কারণে সামগ্রিকভাবে দেশের বনসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহের সমন্বয় আবশ্যক এবং প্রয়োজন সুষ্ঠু বন প্রশাসন ও বন ব্যবস্থাপনার। একটি সুষ্ঠু বন প্রশাসন ও বন ব্যবস্থাপনার দু'টি মৌলিক দিক হচ্ছে যুগোপযোগী আইনের ভিত্তি তৈরি এবং আইন প্রয়োগের জন্য একটি সুব্যবস্থিত, দক্ষ ও কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ দু'টি বিষয়ই দীর্ঘ দিনের একটি অবহেলিত অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।

১৯৮৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত বন-আইন ছিল ভূতপূর্ব বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত, যার মৌলিক ধারা ছিল নির্বিচারে বনোজাড়ের মধ্য দিয়ে কৃষির পত্তন ঘটানো এবং বনভূমি থেকে সর্বোচ্চমাত্রায় সম্পদ আহরণ। ১৯৮৯ সালেই প্রথমবারের মত প্রচলিত বন- আইন সংশোধনীর প্রয়াস নেয়া হয়। বিশেষজ্ঞমহলের অনেকেরই ধারণা, সংশোধিত এ বন-আইনটিও অনেক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টতার অভাব দোষে দুষ্ট। এছাড়া অনুভূত প্রয়োজনের আলোকে সময়ে সময়ে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ এবং সামগ্রিকভাবে সংশোধিত এ বন-আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না, এ অভিযোগ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ছাড়াও সরকারী দলিলপত্রেও স্বীকৃত[৩০]। উদাহরণত ১৯৮৯ সালে ইটের ভাটায় লাকড়ির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করা হয় কিন্তু সারাদেশে এ আইনটি লঙ্ঘিত হচ্ছে ব্যাপকভাবে[৩১]। তবে, শুধু আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়। কোন আইন প্রণয়ন করার পূর্বে আইনের প্রয়োগযোগ্যতা ও প্রয়োগ কৌশলের বিষয়টিও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন এবং সর্বোপরি, জনগণের হাতে বিকল্প কিছু তুলে দিতে না পারলে এ জাতীয় আইন বাস্তবত কখনোই কার্যকরী করা সম্ভব নয়। জনগণের মধ্যে বন-আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি-প্রবিধি সংক্রান্ত অজ্ঞতাও অপরিকল্পিত এবং অননুমোদিত বনোৎসাদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিজ্ঞমহলের অনেক অভিযোগ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণতা, দায়িত্বহীনতা, লোভী ও অসাধু ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারীদের সাথে যোগসাজস রক্ষা করে চলা ইত্যাদি অন্যতম[৩২]। এগুলো কঠোর হস্তে দমন করা না গেলে বিদ্যমান সমস্যার উত্তোরণ বাস্তবে কখনোই সম্ভব নয়।

---

৩০ Government of the People's Republic of Banagladesh. : The Fourth Five Year Plan 1990-95, Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1990, p. V.E. 2.

৩১ দৈনিক ইত্তেফাক. ঃ চট্টগ্রামে কাঠচোরদের দৌরাত্ম ঃ সরকারী বনাঞ্চল উজাড়. ঢাকা, ২৩.০৯.১৯৯১; পৃ. ৬।

৩২ রনরফ, পৃ. ৩ ও ৬।

সারণি- ৪ ঃ ব্যবস্থাপনা অনুসারে বনের শ্রেণীবিন্যাশ ও বনভূমির পরিমাণ

	বনের শ্রেণী	ব্যবস্থাপনার ধরন	বনভূমির পরিমাণ (%)
১।	খাস অরণ্য (Reserved Forest)	বন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ন্যাস্ত	৫৮.৯৫
২।	সংরক্ষিত অরণ্য (Protected Forest)	বন বিভাগের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে ন্যাস্ত, কিন্তু জনগণের কিছু অধিকার রয়েছে, যেমন-পশুচারণ	২.৩৩
৩।	দখলকৃত অরণ্য (Acquired Forest)	জমিদারী মালিকানাধীন ছিল, জমিদারী প্রথা বিলোপের পর সরকারী দখলে	৩.২৪
৪।	অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমি (Unclassed State Forest)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত	১৫.৭৫
৫।	ওয়াপদা ও খাসভূমির অরণ্য (WAPDA & Khas-land Forest)	পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত	৮.৬১
৬।	অর্পিত অরণ্য (Vested Forest)	বেসরকারী, কিন্তু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারকে অর্পিত	০.৪৬
৭।	ব্যক্তি মালিকানায় নিয়ন্ত্রিত বনভূমি (Village Forest)	সমগ্র বাংলাদেশের একক পরিবার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত	১০.৬৬
	মোট		১০০.০০

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন মতে, বন বিভাগের বৃক্ষায়ণ প্রক্রিয়া খুবই অপ্রতুল। রোপণোত্তর পরিচর্যার অভাবে বেশির ভাগ গাছই মারা যাচ্ছে এবং এগুলোর প্রতিস্থাপন হচ্ছে না। বন বিভাগ, বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে কোন কার্যকরী সমন্বয় গড়ে ওঠেনি। পরিবেশ নীতিতে জ্বালানী, বন, বন্য প্রাণী ও জৈব বৈচিত্র খাতের নীতিসমূহের বাস্তবায়নকারী সংস্থা নির্ধারণ অধিকতর প্রয়োগযোগ্য হওয়া প্রয়োজন রয়েছে এবং এ সকল সংস্থাসমূহের মধ্যে একটি কার্যকরী সমন্বয় গড়ে তোলার ব্যাপারে ব্যাপক প্রয়াস আবশ্যক। গবেষণার সাথে বাস্তব প্রয়োজনের তেমন কোন মিল নেই। আশির দশকে বন বিভাগকে পুনর্গঠনের প্রয়াস নেয়া হলেও তা বিশেষ কোন উপকারে আসেনি[৩৩]। সত্তরের দশকে সুইডিশ আর্থিক সহযোগিতায় বন বিভাগের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও পরবর্তীতে কার্যত অর্থের অভাবে সেটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

---

৩৩ Op cit. pp. 4-5.

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বন উপখাতে ৮৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটাই এই উপখাতে এ যাবতকালের সর্বাধিক বরাদ্দ। পরিকল্পনায় দেশের বনসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহের পুনর্বিন্যস্তকরণ, সমন্বয়ন ইত্যাদি পদক্ষেপের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। দেশের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায়ও (*Perspective Plan, ১৯৯৫-২০১০*) এসকল বিষয়সহ বনসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক ও টেকসহ উন্নয়ন ধারণার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সরকারী বনভূমি সংরক্ষণে জনগণের অংশগ্রহণের সূচনা করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে এ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি/কৌশল। কিন্তু বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, তুলনামূলক বিচারে আমাদের দেশের প্রশাসনিক উপরি কাঠামো (অর্থাৎ লিখিত নীতিমালা, পরিকল্পনা, প্রণীত আইন ও প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস ইত্যাদি) দৃশ্যত অত্যন্ত চমৎকার। কিন্তু ভেতর কাঠামো (অর্থাৎ বাস্তবায়ন, জবাবদিহিতা, প্রশিক্ষণ ও পদায়ন ইত্যাদি) অত্যন্ত দুর্বল ও যথার্থ কার্যকরী নয়। এর গোড়ায় হাত দেয়া না গেলে সমস্যার উত্তোরণগতি শ্লথ হতে বাধ্য।

৪.২ অধিকতর বনায়ন

পৃথিবীর সবচেয়ে জন-অধ্যুষিত দেশের একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। তাই একথা সত্য যে, প্রয়োজনের আঙ্গিকে ব্যাপক এলাকা জুড়ে বনায়নের মত বাড়তি ভূমি আমাদের নেই। তবু বিদ্যমান বনসম্পদ সংরক্ষণে ব্যর্থতার সাথে সাথে বনায়নের বিষয়টিও দীর্ঘদিন নানাভাবে অবহেলিত।

অতীতের পরিকল্পনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উচ্চাভিলাষ ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যর্থতাই হচ্ছে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ব্যর্থতার জন্য যে কারণগুলোকে দায়ী করা হয়েছে তার স্বরূপও সকল ক্ষেত্রে মোটামুটি একই।

পরিকল্পনার আওতাধীনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। মূলত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকেই বনসম্পদ উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হয়। তবু প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা দু'টি ছিল অনেকটা ঔপনিবেশিক চেতনা লালিত। এ সময় বনসম্পদ উন্নয়ন থেকে সর্বোচ্চমাত্রায় বনসম্পদ আহরণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে[৩৪]। বনভূমি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার চাপ ও প্রয়োজনীয় জমির স্বল্পতার বিষয়টি দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময় থেকে সর্বাধিক অনুভূত হয়। সে জন্য তখন থেকেই গ্রামীণ বনোন্নয়নের ওপর দৃষ্টি দেয়া হয়। মধ্য পর্যায়ে এসে দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোর বনহীনতার প্রতিক্রিয়া রোধকল্পে একটি ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে এটি সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি (১৯৮২-১৯৮৭) নামে সারাদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ বনায়ন কর্মসূচি বিশেষ গতি পায় এবং একই সঙ্গে সংযোজিত হয় উপজেলা বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্প (১৯৮৮-১৯৯৪), গুচ্ছগ্রাম ও বনায়ন এবং এনজিও-এর মাধ্যমে ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বনায়ন। কিাত তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতাধীনে গৃহীত অসংখ্য প্রকল্পের উল্লিখিত প্রকল্পগুলো অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এবং সর্বাধিক আলোচিত। এর মধ্যে এনজিও-এর মাধ্যমে গৃহীত

---

৩৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০. পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৩. পৃ. ২১০-২১৭।

বনায়ন কর্মসূচি যথেষ্ট ফলপ্রসূ বলে অনেকে মনে করেন। তবে সামগ্রিক বিচারে এনজিও'র মাধ্যমে গৃহীত বনায়ন কর্মসূচির ফলপ্রসূতার বিষয়টি প্রশ্নাতীত নয়। বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে ব্যাপৃত। ব্যাপক স্থানিক পরিসরে কর্মসূচি পরিচালনা করার মত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কোন এনজিও'র নেই। তাই এনজিও'রা স্বল্প পরিসরে ভাল ফলাফল দেখাতে পারলেও বৃহত্তর পরিসরে সরকারী প্রতিষ্ঠানের থেকে তুলনামুলকভাবে কম ফলপ্রসূ; তুলনামূলক বৃহত্তর পরিসরে কার্যরত এনজিও'গুলোর অবস্থা থেকে অন্তত তাই মনে হয় --- সাধারণত অনেকে এমন ধারণা পোষণ করেন। আবার অনেকের মতে, যে অর্থ ও লোকবল দিয়ে এনজিও'গুলোর বনায়ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে তা আপাত ফলপ্রসূ মনে হলেও কার্যত অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়। তবে তুলনামূলক বিচারে বন অধিদপ্তর থেকে অধিক অর্থ ও লোকবলের মাধ্যমে বনায়ন কর্মসূচি পরিচালনা করলেও তাদের কর্মসূচিতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ অধিকতর নিশ্চিত হয়ে থাকে বলে অনেকে মনে করেন। ইদানিং ব্যক্তিগত পর্যায়ে বনায়নও জনমনে বেশ সাড়া যোগাচ্ছে। নিম্নে তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

সারণি-৫ ঃ বিভিন্ন এলাকার বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন কর্মসূচির অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা, ১৯৭৩-৯০

বৃক্ষায়ন/বনায়নের ধরন		দ্বিবার্ষিকসহ ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৮০) (হেক্টর)	২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) (হেক্টর)	৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)		
				লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (হেক্টর)	(%)
১।	কর্তিত প্রাকৃতিক পাহাড়ী বনাঞ্চলে পুনঃবৃক্ষরোপণ	২১৭২৩	২৬,৮৮৩	৩০,৩৬০	১৮,১৭৩	৬০
২।	ক্ষয়িষ্ণু ও অনাবৃত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বনায়ন	৬,৭৬১	১১,৮৮৬	৩৬,০০০	২,৩৭৬	৭
৩।	পার্বত্য চট্টগ্রামের অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমিতে বনায়ন	৮,৪৪৬	১৭,৯৯৬	২৯,১৫০	১০,৭২১	৩৭
৪।	উপকূলীয় অঞ্চলে নতুন জেগে ওঠা ভূমিতে বনায়ন	৩০,৯৮২	৪০,৪১৫	৪০,৪৮৫	৩২,৫৫৩	৮০
৫।	Woodlot & Agroforestry Plantation	-	২,৯৩২	১৫,৬২৮	৫,৪১৩	৩৫
৬।	Strip Plantation (Km)	-	৩,৪১০	৪,৯৮০	৪,২৪১	৮৫
৭।	Pviv weZiY (mln)	২৬.৭	২১	৭৬	৪২	৫৫

উৎস ঃ *The Fourth Five Year Plan 1990-95, p. V.E. 2.*

এযাবতকালের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, উপকূলীয় বনায়ন ও Strip plantations সর্বাধিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে, যার পরিমাণ যথাক্রমে ৮০ ও ৮৫ শতাংশ (সারণি-৫)। সাম্প্রতিককালের এক জরীপে দেখা গেছে যে, উপকূলীয় অঞ্চলে রোপিত বৃক্ষের প্রায় ৭০ শতাংশ বেঁচে উঠেছে। এতদাঞ্চলের প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে " কাণ্ড-খোঁড়ক' কীটের আক্রমণ। রোপিত বৃক্ষের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ এই আক্রমণের শিকার। তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্তিত

প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি মাত্র ৬০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে, যা দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় অনেক কম। ক্ষয়িষ্ণু ও অনাবৃত বনাঞ্চলের বৃক্ষায়ন কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রায় শূন্যের কোটায় (৭ শতাংশ)। "প্রজাতি-স্থানের" উপযুক্ততা নির্ধারণের ব্যর্থতাই এ সকল ক্ষেত্রে মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত। বৃক্ষায়ণে অসঙ্গত প্রজাতির মিশ্রণ ও দ্রুতবর্ধনশীল একক প্রজাতির বৃক্ষায়নও ব্যর্থতার আর একটি প্রধান কারণ। সাম্প্রতিক এক জরীপে দেখা গেছে, একক প্রজাতির বৃক্ষশিশু অতিমাত্রায় পোকার আক্রমণের শিকার হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, রোগাক্রমণ, নিম্নমানের চারা ও বীজ, রোপণোত্তর পরিচর্যার অভাব ও প্রশাসনিক অদক্ষতা অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করছে।

তবে বনসম্পদ উন্নয়ন ও অধিকতর বনায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান ভূমিস্বল্পতা এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতার দিকগুলো সরকারের চলতি পরিকল্পনায় সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলা যায়। কারণ বনায়নের ক্ষেত্রে এ পরিকল্পনায় গ্রামীণ বনায়ন, চাষজ বনায়ন, কৃষি বনায়ন, সামাজিক বনায়ন, প্রান্তিক ভূমিতে বনায়ন ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে[৩৫]। এছাড়া ব্যক্তিক নার্সারী পরিচালনায় ঋণ প্রদান, সংরক্ষিত মূল বনাঞ্চলের চারপাশে বনায়নের মাধ্যমে বাফার-অঞ্চল সৃষ্টি, সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে গ্রীন-বেল্ট তৈরি, বহুমাত্রিক ব্যবহারযোগ্য প্রজাতির বনায়ন ইত্যাদিও এ পরিকল্পনার এক একটি বাস্তব দিক-নির্দেশনা।

অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, প্রজাতি-স্থানের যথোপযুক্ততা নির্ধারণ ও সঙ্গত প্রজাতির মিশ্রণ বনায়নের ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাযোগ্য দিক। সাম্প্রতিক কালে কিছু প্রজাতির গাছ (যেমন মেহগনি) দেশের সর্বত্র সফলভাবে রোপিত হতে দেখা যাচ্ছে। তবু প্রকৃতিগত দিক থেকে স্থানিকভাবে আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ-গোষ্ঠী (*Plant Community*) রয়েছে (সারণি-৬)। প্রজাতি-স্থান ও সঙ্গত প্রজাতির মিশ্রণ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য জানা না থাকলে সাধারণভাবে বনায়নের ক্ষেত্রে এটি অনুসরণ করা যেতে পারে।

---

৩৫ Government of the People's Republic of Bangladesh. : Participatory Perspective Plan for Bangladesh 1995-2010. Planning Commission, Ministry of Planning , 1995. Dhaka, pp. 19-20.

সারণি-৬ ঃ উদ্ভিদগোষ্ঠী (*Plant Community*) অনুসারে বনের শ্রেণী বিভাজন, অবস্থান ও প্রধান জাতসমূহ

	বনের শ্রেণী	অবস্থান	প্রধান জাতসমূহ
১।	ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের অরণ্য	বৃহত্তর ময়মনসিংহ, ঢাকা, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর ও রংপুর জেলা	প্রধানতঃ শাল। এছাড়া কড়ই, হাড়গজা, আজুলি, ডোয়া, হলদু, বহেড়া, হরিতকি, হিজল, কাঁঠাল, শিরিষ ইত্যাদি
২ক।	ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য	বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলা	চাপালিশ, তেলসুর, ময়না ইত্যাদি
২খ।	পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের অরণ্য	-ঐ-	প্রধানতঃ গর্জন। এছাড়া অর্জুন, চালতা, চম্পা, সিভিট, জলপাই, মেহগনি, ছাতিম, কদম, জারুল, জাম, গামার, তুন, শিমুল, কড়ই সেগুন, প্রভৃতি
৩।	স্রোতজ অরণ্য (উপকুলীয় বন)	বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার উপকুলবর্তী এলাকা	প্রধানতঃ গরান ও সুন্দরী। এছাড়া পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বাইন, গোলপাতা প্রভৃতি।

৪.৩ জ্বালানী ব্যবস্থার উন্নয়ন

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে জ্বালানী ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন আসলেও তৃতীয় বিশ্বের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কাঠ ও জ্বালানী হিসেবে বনসম্পদের ব্যবহার প্রাধান্য পেয়ে থাকে। একথা উল্লেখ্য যে, আজ থেকে মাত্র এক শতাব্দি আগেও সারা বিশ্বে বনজ-জ্বালানীই ছিল জ্বালানী শক্তির প্রধানতম উৎস। ধীরে ধীরে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটেছে, আবিষ্কৃত হয়েছে নানা খনিজ পদার্থ এবং জ্বালানী শক্তির উৎসের স্বরূপ ব্যাপকভাবে পাল্টে গেছে পৃথিবীব্যাপী। কিন্তু বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর হাতে এমন কোন আলাদীনের প্রদীপ নেই যা দিয়ে রাতারাতিই তাদের জ্বালানী শক্তির উৎসের স্বরূপকে ভেল্কিবাজির মত পাল্টে দিতে পারে। আর তাই, জ্বালানীর ক্ষেত্রেও "বনজ-জ্বালানী" আজও এসকল অঞ্চলে প্রধানতম উৎস বিবেচিত।

বনজ সামগ্রীর ৮০ শতাংশ জ্বালানী কাঠরূপেই ব্যবহৃত হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন অনুসারে, বনজ সামগ্রী দেশের প্রচলিত জ্বালানীর ৭৫ শতাংশেরও বেশি জ্বালানী ব্যবহারের যোগান দেয়। অবশ্য চতুর্থ পঞ্চবর্ষিক পরিকল্পনা প্রতিবেদন মতে, উক্ত খাতে বনসম্পদের অবদান মাত্র ১৭ শতাংশ এবং বাদবাকী আসে কৃষিজ আবর্জনা, খড়কুটা, গোবর ইত্যাদি থেকে। কেউ কেউ মনে করেন, প্রচলিত জ্বালানীর ক্ষেত্রে বনসম্পদের অবদান ২০ শতাংশ এবং

সম্পূর্ণ জ্বালানী কাঠের ৬৯ শতাংশ ব্যবহৃত হয় রান্নার কাজে, ২৩ শতাংশ ইটের ভাটায় এবং ৮ শতাংশ শিল্প জ্বালানী হিসেবে[৩৬]।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মতে, দেশের বর্তমান কাঠ ও জ্বালানী কাঠের মাথাপিছু বার্ষিক ব্যবহারের পরিমাণ যথাক্রমে ০.৩৮ ও ২.৩০ ঘনফুট। অথচ একই জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত নেপাল ও বার্মার ব্যবহার প্রায় ২০ ঘনফুট[৩৭]। ১৯৮৫-৮৬ সালের হিসেব মতে, দেশে কাঠ ও জ্বালানী কাঠের ব্যবহার ছিল যথাক্রমে ৩৮ ও ২৩০ মিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমি থেকে যথাক্রমে ১৩.৩ ও ২.৫ মিলিয়ন ঘনফুট কাঠ ও জ্বালানী কাঠ সরবরাহ করা হয়েছে। বাকী ২৪.৭ ও ২০৪.৫ মিলিয়ন ঘনফুট কাঠ ও জ্বালানী কাঠের সরবরাহ হয়েছে গ্রামীণ বন থেকে। দেশের মোট বনভূমির মাত্র ১১ শতাংশ (প্রায়) গ্রামীণ বন হিসেবে বিবেচিত[৩৮]। অথচ এখান থেকেই সামগ্রিকভাবে দেশে ব্যবহৃত কাঠের প্রায় ৭০ শতাংশ এবং জ্বালানী কাঠ ও বাঁশের প্রায় ৯০ শতাংশ সরবরাহ পাওয়া যায়[৩৯]। কিন্তু প্রতিবছর যে হারে গ্রামীণ বন উ হচ্ছে পুনর্জন্ম ক্ষমতা তার তুলনায় অনেক কম। এ কথাটি যে শুধুমাত্র গ্রামীণ বনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা' নয় বরং তা' সামগ্রিকভাবে দেশের সকল বনাঞ্চলের জন্যই একটি নির্মম সত্য।

সবচেয়ে আশংকাজনক বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয় বনসম্পদের সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের মধ্যে। দেশের বনসম্পদের পরিমাণ কমছে দ্রুতহারে; বন এলাকার সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া লক্ষ্যমাত্রার অনেক নীচে পড়ে থাকছে। কিন্তু, অন্যদিকে মানুষের চাহিদার পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা থেকে সতত উর্ধ্বগামী। বর্তমানে সামগ্রিকভাবে দেশের প্রয়োজনীয় কাঠ ও জ্বালানী কাঠের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ব্যবধান যথাক্রমে ২৬.১২ ও ১২৯.৯১ মিলিয়ন ঘনফুট। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও ভোগান্তর বর্তমান অবস্থায় স্থির থাকলে ২০০০ সাল নাগাদ এ ব্যবধান যথাক্রমে ২৮.২ ও ১৪৫.২ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়াবে (সারণি-৭)। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে এই বিরাট ব্যবধান সৃষ্টির প্রধান কারণ হচ্ছে সীমিত বনভূমি, জনসংখ্যার অত্যাধিক চাপ, ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, নগরায়ন, শতবর্ষের পুরানো বন-আইনের দুর্বলতা ও প্রশাসনিক অব্যবস্থা।

---

৩৬. Ali, Omar M. : Bangladesh Forests with Special Reference to Demand and Supply of Fuelwood : a research mimio, BARC, Dhaka, 1990, p. 13.

৩৭. Government of the People's Republic of Bangladesh. : The Second Five Year Plan 1980-85. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1983, p. 142.

৩৮. Government of the People's Republic of Bangladesh. : The Fourth Five Year Plan, 1990-95. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1990, p. V.E. 1.

৩৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৮৫-৯০, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২১৯।

সারণি-৭ ঃ কাঠ ও জ্বালানী হিসেবে বনসম্পদের চাহিদা ও যোগান ১৯৯০

	কাঠ (মিঃ ঘনফুট)	জ্বালানী কাঠ (মিঃ ঘনফুট)	২০০০ হাজার সাল নাগাদ অবস্থা (মিঃ ঘনফুট)	
			কাঠ	জ্বালানী
চাহিদা	৪৬.৬০	২৭৯.৫৮	৫০.০	৩০৪.০
যোগান	২০.৪৭	১৪৯.৬৭	২১.৮	১৫৮.৮
ঘাটতি	২৬.১২	১২৯.৯১	২৮.২	১৪৫.২

উৎস ঃ Ali, Omar M. : Bangladesh Forests with special reference to Demand and Supply of Fuelwood : a research mimio, BARC, Dhaka, 1990, p. 13.

সামগ্রিকভাবে দেশের জ্বালানী ব্যবস্থায় বনসম্পদের ওপর বর্ণিত এ নির্ভরশীলতা যতটা এবং যত দ্রুত সম্ভব, কমিয়ে আনা আবশ্যক। এজন্য বিকল্প জ্বালানীর (যেমন জীবাশ্ম জ্বালানী, বিদ্যুৎ, সৌরশক্তি ইত্যাদি) উৎস সৃষ্টি, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। কাঠের বিকল্প ব্যবহারের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনা দরকার।

৫.০ গৃহীতব্য ভবিষ্যৎ কৌশল ও কর্মসূচি

দেশের বনসম্পদের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক অপ্রতিরোধ্য আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। অবশ্য চলতি অবস্থা বিরাজ করলে বর্তমান প্রজন্মও এ হুমকির বাইরে নয়। এ সমস্যার উত্তোরণে নিম্নলিখিত কৌশল ও পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

৫.১ বনসম্পদ সংরক্ষণ কৌশল ও কর্মসূচি

- সরকারী বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

- বনব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথাশীঘ্র সম্ভব "দ্বি-অঞ্চল পদ্ধতি"র প্রবর্তন করতে হবে। এখানে একটি থাকবে মূল বনাঞ্চল (*core forest area*) এবং তার চারপাশে থাকবে একটি বাফার-অঞ্চল (*buffer zone*)।

- প্রশাসনের ভেতর কাঠামো শক্তিশালী ও যথার্থ কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

- বন-আইনের যথার্থ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট সমস্যার আলোকে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সংশোধিত বন-আইনে (১৯৮৯) এগুলোর সংযোজন ঘটাতে হবে। জনসাধারণের মাঝে বন-আইনের স্বচ্ছতা আনয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

- অসদুপায় ও অননুমোদিত বনোৎসাদনের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

- বৃক্ষের রোপণোত্তর পরিচর্যা ব্যবস্থার ওপর সর্বাধিক জোর দিতে হবে ও তার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।
- গৃহীত প্রকল্পসমূহ প্রয়োজনের সময় অর্থাভাবে যাতে ব্যাহত না হয়, সে জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের অবমুক্তি প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে এবং গৃহীত প্রকল্পসমূহসহ সামগ্রিক কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়নের ওপর অধিক জোর দিতে হবে।

৫.২ অধিকতর বনায়ন কৌশল ও কর্মসূচি

দেশের বর্তমান আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রয়োজনে পর্যাপ্ত বনায়ন অতীব জরুরী এবং এ বনায়ন প্রক্রিয়াটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যভিত্তিক ও পরিকল্পিত উপায়ে পরিচলিত হতে হবে। এজন্য নিম্নলিখিত কৌশল ও পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক ঃ

- যে সকল এলাকায় বনায়নের সুযোগ রয়েছে সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বনায়ন করা।

- বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির অনাবৃত এলাকায় সুষ্ঠু পুনর্জন্ম ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে "স্থান-প্রজাতি"র যথোপযুক্ততা যাচাই ও রোপণযোগ্য বিভিন্ন "প্রজাতির সংগতিপূর্ণ মিশ্রণ" ব্যবহার করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।

- উপকূলীয় বনায়নের ওপর আরো জোর দিতে হবে। সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম প্রক্রিয়া সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক ঘূর্ণীঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রতিরোধে স্থানীয় প্রকৃতির বনায়নের সাথে উপকূলের সম্মুখভাগে নারিকেল, খেজুর, তাল জাতীয় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত "গ্রীণ বেল্ট" সৃষ্টি করতে হবে।

- জ্বালানী কাঠের ঘাটতি পুরণের লক্ষ্যে সংগতিপূর্ণ মিশ্রণ আকারে স্বল্পমেয়াদী আবর্তক জাতের বৃক্ষ বা দ্রুতবর্ধনশীল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত অনাবৃত বনাঞ্চলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে এ জাতীয় বৃক্ষায়ন করা যেতে পারে।

- গ্রামীণ বনায়ন প্রক্রিয়াকে আরো জোরদার করতে হবে এবং সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বনায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য জনগণকে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

- সম্ভাব্য শীঘ্র একটি পূণাঙ্গ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়াস নিতে হবে এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বনায়নের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

- ভূমি স্বল্পতা হেতু গ্রামীণ বনায়ন, চাষজ বনায়ন, কৃষি-বনায়ন/উদ্যান কৃষি, সামাজিক বনায়ন, প্রান্তিক ভূমিতে বনায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

- সরকারী ও বেসরকারীভাবে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে নার্সারী সৃষ্টি, পরিচালনা এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যথাশীঘ্র সম্ভব ব্যক্তিক ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় নার্সারী উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৩ কাঠ ও জ্বালানী ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত কৌশল ও কর্মসূচি

- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সলিড কাঠের ব্যবহার সীমিত করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে বিকল্প দ্রব্যাদি যেমন পারটেক্স ইত্যাদির ব্যবহার সম্প্রসারিত করতে হবে এবং জনগণকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। কেননা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে জনসাধারণের মাঝে সলিড কাঠের ব্যবহার প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

- কাঠ আহরণ ও চেলাইকরণের সময় প্রচুর কাঠ নষ্ট হয়। এ সমস্যার সমাধানে আহরণ ও চেলাইকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

- অনেক ক্ষেত্রেই স্বল্পসময়ে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কাঠ ব্যবসায়ীরা কাঠকে প্রক্রিয়াজাত করেনা। দীর্ঘায়ু করার জন্য কাঠ ব্যবহারের পুর্বে অবশ্যই প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। এব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

- ১৯৮৯ সাল থেকে ইটের ভাটায় লাকড়ির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার সুষ্ঠ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

- জ্বালানী কাঠের বিকল্প উৎস, যেমন গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য লাগসই বিকল্পের ব্যবহার সম্প্রসারিত করতে হবে।

৬.০ উপসংহার

একটি দেশের বিশেষ কোন সম্পদ উন্নয়নের কৌশলসমূহ কতটা সঠিক ও গুরুত্ব সহকারে নির্ধারিত হবে তা সাধারণভাবে ঐ দেশে সম্পদটির অর্থনৈতিক অবস্থানের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বনোন্নয়ন যতটা না অর্থনৈতিক কারণে জরুরী তার থেকেও বেশী জরুরী প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রয়োজনে। তবে দেশের অর্থনীতিতে এই উপ-খাতের অবদানও নিতান্ত অবহেলারযোগ্য নয়। ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে এই উপ-খাতের প্রত্যক্ষ অবদানের চেয়ে পরোক্ষ অবদানের সম্ভাবনাই বেশি। একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নে বনসম্পদ একরকম অণুঘটকের ভূমিকা পালন করে। প্রয়োজনীয় মাত্রায় বনোন্নয়ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে যেমন সমৃদ্ধির সোপান সৃষ্টি করে, তেমনি এর অপ্রতুলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সে কারণে বনসম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অতীব জরুরী। তবে, আমাদের এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এককভাবে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন বা সরকারের পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এ দায়িত্ব আমাদের সকলের, সমগ্র জাতির।

গ্রন্থপঞ্জি

১। Ahmed, Nafis and Khan, Fazle Karim : "The Sundarban Forests of East Pakistan" : A Resource Appraisal, *Oriental Geographer*, Dhaka, July 1959.

২। Ali, Omar M. : "Bangladesh Forests with Special Reference to Demand and Supply of Fuelwood." a research mimio, BARC, Dhaka, 1990.

৩। Barner, J. : *Experimentelle Landschaftsoekologie : Lehrbuch der Umweltforschung*. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1983.

৪। Curtis, S. J. : *Working Plan for the Forests of the Sundarban Division*. Vol. 1 Part 1, Calcutta, 1933.

৫। Government of the People's Republic of Bangladesh. : The First Two Year Plan, 1978-80. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1978.

৬। Government of the People's Republic of Baangladesh. : *The Second Five Year Plan*, 1980-85, Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1983.

৭। Government of the People's Republic of Bangladesh. : *The Fourth Five Year Plan*, 1990-95. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1990.

৮। Government of People's Republic of Bangladesh. : *Participatory Perspective Plan for Bangladesh 1995-2010*. Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka, 1995.

৯। Nishat, Ainun. : "*Key Issues of Environmental Concern for Bangladesh*; Seminar Paper, BPATC, Savar, Dhaka, 1993.

১০। Rashid , Harun Er. : *Geography of Bangladesh*. University Press Ltd., Dhaka, Bangladesh, 1977.

১১। Rashid, Harun Er. : *Geography of Bangladesh*. University Press Ltd., Dhaka, Bangladesh, 1991.

১২। The World Bank : Indonesia : *Sustainable Development of Forests, Land and Water*, a World Bank Country Study, Washington D.C., 1990.

১৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. ঃ *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জরীপ*, ১৯৮০-৮১.

১৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. ঃ *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জরীপ*, ১৯৮৩-৮৪.

১৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ *তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৮৫-৯০.* পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৩।

১৬। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. ঃ *পরিবেশ নীতি ১৯৯২ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম,* পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯২।

১৭। দৈনিক ইত্তেফাক, "চট্টগ্রামের কাঠচোরদের দৌরাত্ত ঃ সরকারী বনাঞ্চল উজাড়". ২৩.০৯.১৯৯১ইং।

১৮। চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম ঃ *আর্থনীতিক ভূগোল ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্ব.* দি সিটি প্রেস, ঢাা, ১৯৮৮।

১৯। মণ্ডল, দীপংকর ও মোর্শেদুল আনোয়ার খান. ঃ "বাংলাদেশের পরিবেশ উন্নয়নে সামাজিক বনায়ন" ; দ্বাদশ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে উপস্থাপিত সেমিনার প্রবন্ধ, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৪।

২০। মাসুদ, আলম ঃ "বাংলাদেশের বিপর্যস্তকর পরিবেশ ঃ প্রধান ইস্যুসমূহ" ; *পরিবেশ ও আমরা,* পরিবেশ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, ১৯৯৩।

২১। সিদ্দিকী, গিয়াস ঃ *সবুজ স্বর্ণ ঃ বনদস্যুদের তৎপরতা,* পরিবেশ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, ১৯৯৪।

২২। হোসেন, এম মোজাম্মেল ঃ "বাংলাদেশের বনসম্পদ, জ্বালানী শক্তির চাহিদা ও সম্ভাবনা", একটি গবেষণা মিমিও, ১৯৯০।

MINERAL AND ENERGY RESOURCES OF BANGLADESH AND THEIR STRATEGIES FOR DEVELOPMENT

Syed Shamsul Alam
Deputy Director, BPATC.

1.0 Introduction.

1.1 The importance of mineral and energy resources cannot be over emphasised in a developing country like Bangladesh. It plays a vital role in developing the socio-economic condition of a nation. These resources are, not only, considered as driving force but also as a backbone of modern economy required for industrialization, power generation, elevating the social standards of people through economic development and above all attainment of a comfortable lifes style. In the context of its importance it should be regarded as a major policies of all welfare states to make sincere efforts for the development of this sector.

1.2 Experts and professionals of this discipline mainly divided these resources on the basis of the two criteria, a) non-renewable and b) renewable. Non renewable resources found in the Bangladesh are as follows:

i. National Gas
ii. Coal
iii. Peat
iv. Lime stone
v. Hard Rock

vi. China Rock

vii. Bolder and

viii. Sand.

While renewable resources found in our country mainly are as follows:

i. Electricity

ii. Bio-Gas

iii. Solar Energy

iv. Wind mills and

v. Animal Force etc.

Purpose of the the present paper is to highlight the mineral and energy resources of Bangladesh and the national policy formulated in 1996 by the Government of Bangladesh with proposed strategies for implementation. First and second parts of the paper deals with the major minerals and energy resources of the country following the criteria mentioned above. While in the third part the present policies of the government and their strategies for implementation have been discussed. Finally an attempt has been made to recommends some pertinent issues that can be considered as a policy options in order to improve the overall situation of the resources of Bangladesh.

1.3 Natural Gas

Natural gas is one of the most important non-renwable resources in Bangladesh. Over the years it has acquired as an alternative to oil and also regarded as a main source of power generation, and its use and requirement has also been greatly enhanced in recent times. During the pre-liberation period, around 1968-1969, the use of gas remained at 19 percent only, when the consumption of oil was more than 70 percent. From 80s a distinct decrease was noticed in the consumption of oil and it came down to 52 percent and simultaneously the consumption of natural gas rose a little above 37 percent, and by 90's the consumption of gas exceeded 70 percent.

1.4 From the above it appears that natural gas occupies a significant place as primary source of energy in the country and the rate of consumption is rapidly increasing and it is anticipated by the experts that unless an alternative source is found immediately, the existing reserve might be exhausted by the year 2016. Considering the anticipated crisis special efforts have been made by the present government to remove the possible constraints in attracting foreign investment in petroleum exploration and development activities. A petroleum policy has also been formulated in 1996 and the government has approved a proposal for exploration of petroleum reserves in the 23 different blocks and a number of other proposals are under active consideration. In order to meet the growing demand for gas in the country a decision has been taken by the government to hand over six small gas fields to the private sector immediately. In fact the search for gas reserve commenced in Bangladesh in the early part of this century. It is

learnt that upto 1995 total of 90 gas wells have been dug out of which only in 18 wells gas field reserve have been found. The total estimated reserve amounts to nearly 20.35 trillion cft of which about 13 trillion cft has been confirmed. The highest quantity of a gas reserve is abailale in Bakhrabad Gas Field. Its quantum of reserve stands at 2.78 trillion cft.

1.5 Moreover, the Government has undertaken an ambitious plan for the development of this sector. A gas infrastructure development plan has been launched with financial assistance amounting to US$213.00 million from the World Bank. It has been targeted to meet the national requirement up to the year 2000. Besides a project title " The Natural Gas Development" has been undertaken by the government for development of gas field, distribution and laying of operational lines at a cost of US$217.13 million. This will help improvement of petrobangla and its subordinate agencies like Jalalabad Gas Transmission and Distribution Ltd., and also help its marketing expansion programme.

1.6 The Petrobangla has been entrusted with the responsibility of lifting 10.60 trillion cft gas. At present 580 to 600 cft gass is being lifted per day and 1000 barrels of condense and 150 barrels of oil are being produced. Arrangements have been made for distribution of gas by the Petrobangla through its three subsidiary agencies namely the Titas Gas Transmission and Distribution System, the Bakhrabad Gas Transmission and Distribution System and Jalalabad Gas Transmission and Distribution Lines respectively. The agencies are also responsible for marketing of gas among the consumers in accordance with their set rules. It is learnt that the gas is now being

consumed at a rate of 43 percent in industrial units, 16 percent for production of fertilizer and seven percent for commercial and domestic purposes. The annual incremental rate or the demand for gas stands at 10 percent at present.

1.7 With the discover of Sangu gas field 35 km. Southwest of Chittagong port on 10th Jan 1996 Bangladesh became the owner of 19th gas field which has 1 lakh billion cft. estimated reserve, would according to the opinion of experts be able to produce 20 crore cft per day. Bangladesh Government signed an agreement of 197 million US dollar investment plan for exploration and production of gas for the Sangu gas field in block-16 in the Bay of Bengal with the three main parties Cairn Energy PLC of UK, Hallibertion of the USA and the Holland Sea search of Netherlands.

2.0 **Coal**

2.1 Coal is second important mining resources discovered in 1962 by a German group of experts known as Krupp's Coal Exploration team. The survey report revealed that at a depth of 2800 feet, there are approximately 105.39 crore metric tonnes of coal reserves in the northern part of the country, over an area 11.66 sq.km. The report indicated that a considerable amount of coal would be found in the Jamalganj area of Bogra district. The mining range is spread over a large area of about 41. sq. km. According to the same report it is said that about 75 crore metric tonnes of coal may be found in the Jamalganj area alone. It is also estimated that coal can be extracted from the mines in this area upto a period of 250 years, if extraction rate remains at 10 thousand tonnes per day. It can also provide employment

opportunity to nearly 10,000 to 12,000 people. Coal is also available in different areas of greater Dinajpur, Rangpur Rajshahi and Pabna districts.

2.2 At present the annual requirement of coal stands at 315 lakh metric tonnes. Since there is an adequate supply of hidden coal reserves in the country it is expected that after proper extraction of coal in Jamalganj area the national requirement will be fulfilled and dependence upon coal import will be greatly minimized. Coal exploration work is also being taken under private entrepreneurship and a proposal from an Australian firm has been accepted in principle and the work is expected to start soon.

2.3 The second coal field was found at Barapukaria Dinajpur in 1985 at a depth between 425 to 1661 cft. The reserve in Barapukaria was estimated at 389 million tons covering an area of 2.5 sq. km. Another coal deposit third of its kind was found in 1989 at Khalashpir in Rangpur district at a depth of 843 feet where the reserve was calculated at about 685 million tons on an area of 12.26 sq. kms.

2.4 The fourth coal field was found at Dighipara, on July 4, 1995 in Dinajpur district at a depth of 1075 feet. survey for assessing the amount and the total area covered is not being conducted.

2.5 A permian coal deposit of high quality first if its kind has been discovered on November 2, 1996 at Phulbaria in Dinajpur district at a depth of 495 feet is spread over a large area having 126 feet thickness. BHP minerals, a US Australian Multi-national Company, while exploring coal in

the northern region, was able find this coal field during the drilling 18th hole at Phulbaria. This type of coal is bituminous which is known as Gondowana coal available in South Africa, Australia, Argentina and Brazil.

3.0 **Peat**

3.1 Peat is another important mineral found in Bangladesh but its exploration and utilization is not taken by the government like other mineral resources. The total available reserves of peat have been estimated at 470 million tons. It is also learnt that the deposit in the greater Faridpur district stands at about 133 million tons. Peat can be used as a ultimae source of fuel particularly by low and middle income groups. It can be used for cooking purposes in the homesteads and dependence upon consumption of organic energy may be reduced to great extent.

3.2 We have by now been able to discover five peat field in Bangladesh Government should take all necessary measure to explore the peat immediately as the country not only suffer shortage of fuel but also remain unutilized this peat discovered more than decade before.

4.0 **Hard Rock**

4.1 It is estimated that Bangladesh requires about 3.15 million cft of construction materials annually and approximately 0.87 million cft. of stone (hard rock) are used for construction purposes alone. It is anticipated that by the year 2000 the requirement of Hard rock will rise to 2.00 million cft

to 3.40 million tones approximately. At present the demand for stone is partially met by the stone pebbles collected from river heads in the Sylhet district and a limited quality of refined stones are imported from abroad.

4.2 Bangladesh Geological Survey authority identified the hard rock in the Madhyapara at Parbatipur Thana of Dinajpur district at a depth of 106 metres to 152 metres. Subsequently, a Canadian Team of expert under commonwelth assistance conducted a technical survey on Madhyapara hard rock and made recommendations for development of mining in the area: During the FY 1978-79 ECNEC approved the project at a cost of Tk. 489.86 lakh of which Tk. 210.60 lakh was earmarked as external assistance. The Saudi Government gave US$ 20.00 million to this project. Some 157 acres of land has been acquired and related infrastructure development work has been completed at the site at a cost of about seven crore taka.

4.3 The progress of Mahyapara hard rock development scheme has been delayed for various reasons at various stages and therefore implementation could not continue as per shecdule. However, in 1992 a North Korean team of experts came to Bangladesh to negotiate which resulted into signing of MOU between the two governments for undertaking the project at a cost of Tk697 crore of which external assistance amount was to Tk.522.00 or US$ 134.00 million. Under the terms of the agreement North Korea will give technical and financial assistance to Bangladesh for implementation of the project. Petrobangla will be responsible for physical execution of the project work. It is expected that on an average of 16 lakh tonnes of hard rock will be lifted from the mine annually. The experts opined that within a period of

four years partial lifting of hard rock may be possible. Although the mine will not start functioning as its full capacity before six to seven year and it will provide employment to nearly 800 to 1000 people.

5.0 Limestone

5.1 Bangladesh has satisfactory reserves of limestone which is an important raw material for the cement industry. It also widely used in steel, sugar, paper, leather, and ceramic industries. It is estimated that 4 lakh tonnes of limestones is consumed by these industries per year. At Takerhat alone in Sylhet district, the reeserve fo limestone amounts to five crore tonnes, which is spread over an area of 19.2 sq. kilometres and only at 61 metres beneath the earth surface. While conducting a survey in Bogra district by the standard Vocunm Oil Company in 1958, found limestone reserve covering an area of 384 sq. km. amount to about 1200 million tonnes.

6.0 China clay

6.1 With the discovery of China Clay in three major areas of Bangladesh since 1973 it has not only producing a good quality of different types of wares but also over the years earning foreign exchange by exporting it Experts considered that if proper incentive is given by the government to the owner of the private company, would able to expand their international market by producing standard quality of china clay products. The reserve of China Clay in those areas was estimated at 42.50 million tons and 1,09541 tons have been utilized since 1993.

Sands

Being a riverine country, Banglaedesh has a potential ground of sand collection from many areas amongst which Baro pokaria Madhyapara, Naryapara, Shahzxibazer, Choddagramurd, Balijuri are remarkable. Estimated reserves is about 125 million tons and 98,773 tons have been colllected from these areas. Besides vast char lands of Jamuna and Padma sometime provide good qualities of sand.

Stone Chips

Bangladesh is blessed with considerable amount of stone chips of her boardering areas particularly Chittagong Hill Tract, Patgram, Panchgon-Talutia and Bhölaganj. These stones are being used in making cement and construction of rail and roads.

7.0 Energy Reseouces

7.1 Among the known renewable energy sources of Bangladesh are Electricity Bio-gas, Solar Energy Wind and Animal Forces.

These resources have increasing importance to our society, powering the equipment to work and facilitating environmental protecion and energy efficiency. Percapita consumption of these energy is recognised as one of the yeardsticks of development of any country. State of development of a country can also be assessed from the quantity and quality of energy being used there. The present section is an attempt to discuss the demand of their resources in Bangladesh and possible options for meeting these demands.

Electricity

7.2 The present per capita generation of electricity is only 80 KWh which is much lower than the average of Asian Countries (about 600 Kwh) or neighboring countries, like India and Pakistan (more than 300 Kwh). The peak demand of the national grid is 1900 MW, and this has grown at an annual average rate of more than 10% since the independence of the country. The installed capacity during the same period, also increased almost at the same rate. Natural gas is the predominant fuel in the present generation mix of the grid and accounts for 86.60% of the total generation the hydro electricity contributed 8.95% and the energy generated by liquid fuel was 4.44%. So far the consumption of electricity is concern large industries and commercial sector accounts for about 19.99% the rest is consumed by domestic sector (17.77%) small commercial (6.99%0 small industries (5.44%). DESA consumes 37.58% REB consumes 9.94% and agriculture 1.42 and the rest by others 1.87%(GOB).

7.3 Total hydropower resources of Bangladesh is limited to around 1,500 GWh per annum. So far about 1000 GWh potential have been utilized at Kaptai. Present installed capacity of 230 MW would be increased by raising the dam height. However, ecological consequences of this have to be assessed before this increase of installed capacity is considered. Other minor potenatial sites, like Matamuhuri and Sangu could generate an additional energy of 500 GWh per annum.

7.4 Various studies on the energy sector of Bangladesh were conducted in the past. These include the Bangladesh Energy study (in Mid 70s) the Bangladesh Enrgy Planning Project in the mid to end of 80s the Power System Master Plan (Mid. 80s) In addition, the Task Force on Energy had submitted its report in 1991 and a Draft Energy Policy was prepared in 1989. A final Energy Policy was approved by the government in 1995.

7.5 In view of the prevailing low consumption base in Bangladesh a high growth rate in energy consumption in desirable for facilitating smooth transition from below subsistence level of economy to developent thereshold. However, the future growth may also continue to be influenced by constraints of physical and financial resources. In any case sustainability should be the key factor in determining the growth of this sector. It is imperative that growth rate for the energy sector should be sufficiently high so as to attain goals of national development. Cross linking of energy growth with that of economy is complicated as this would depend on many exogenous variables, like investment oportunities, growth of user sectors of economy, efficiency and conservation content of local fuels in future energy balance technology options, replacement fuels penetration of commercial fuels, environmental dimension of energy and the situation in the international fuel market.

Bio-Gas:

7.6 Bio-Gas is the major source of fuel in agricultural country like Bangladesh and is available from three sources: trees, field crops and livestock. Only a fraction of total bio-bass is used as fuel. However, 60 to

80% of total energy is supplied by bio-mass fuel which is mainly used for household level consumption (e.g. cooking and parboiling) and some portion of it is used in agro-processing and non-agroprocessing industries. It is not at all used in electricity generation.

Solar Energy:

Bangladesh blessed with bright sunshine throughout the year. One estimate says that the average daily solar radiation in Bangladesh varies from 5.05 Kwh/m^2 in winter to 8.36 Kwh/m^2 in summer. Thus the total solar energy that is intercepted annually is equivalent to 133,330 million tonnes of coal Solar energy which is not properly used except for drying crops, fish clothes and for producing salt, Technology has by now been developed to store this solar energy electricity by the developed countries for about more than one decade. Bangladesh Local Government and Engineering Department as undertaken a project in 1995-96 to utilize the solar energy to generate electricity in the remote islands and coastal areas of Bangladesh. It is learnt from the government source that this project has been able to generate electricity from solar energy and started supplying in the island areas of sonadia village of Noakhali district. Solar Pannels have been installed on the roof of cycle shelter centres of cuatal area and successfully generate electricity and supply it to the surrounding villages.

Wind and Animal Forces:

Bangladesh is fortunate to receive a regular slow of wind of its coastal belt extended from Cox's Bazer to Sunderban area to the Bay of Bengla. This wind can be converted into energy for generating electricity as in the case Halland in western Europe. Bangladesh Government has undertaken a project to utilize this wind with technical assistance of world Bank and is exputed to commission very soon.

7.10 There are about 21 million cattle heads in Bangladesh of which 11 million are reported as working animal. Cattle resources play an important role in national economy by providing milk, manner, fuel and energy.

7.11 It is evident from Table 1 that there is ever growing defict in meeting the demand from indigenous fuel. Thus fuel import will be substantial for the assurmed growth of electricity. A comprehensive plan is desirable in a long term perspective so as to ensure a reliable supply of electricity in the country. The alternative imported fuels are oil coal and nuclear. a part from the high price, because of the uncertainty in availability and price of oil, the same cannot be considered as a viable proposition a long term basis. So far as coals concerned logistics of transportation and handiling is a big handicap. A 300 MW coalfired power plant would repquire I million tins of coal per year. This means infrasturucures at the port, inland transportation and handling for 300 tons of coal per day would have to be provided.

Table 1 Generation of Electricity with indigenous feuls.
(Figures in GWh)

Type	1995	2000	2005	2010	2015	2020
GAS	10500	15000	15000	15000	15000	15000
Coal (GWh)	0	1030	3090	5150	6180	7210
Coal (MW)	0	300	600	900	900	1200
Hydro	800	1000	1000	1300	1300	1300
Total Generation	11300	17030	19090	21450	22480	23510
Deficit in GWh	1077	1890	9190	18611	32090	60034
Imported Fuel MOTOE MW	0.28	0.48	2.35	4.76	8.2	15.34

Source : Petrobangla & PDB 1994.

8.0 Policy formulated by Government

8.1 In recognition the importance of mineral and energy in developing socio-economic condition, the Government of Bangladesh has been formulated National Energy Policy in 1996.

8.2 Objectives of the Policy

The objective of the National Energy Policy are outlined as follows :

1. To provide energy for sustainable economic growth so that the economic development activities of the different sectors are not constraints due to shortage of energy

2. To meet the energy needs of different zones of the country and socio-economic-groups
3. To ensure optimum development of all the idigeneous energy sources
4. To ensure sustainable operation fo the energy utilities
5. To ensure \rational use of total energy sources
6. To ensure invironmentally sound sustainable energy development programmes causing minimum damage to the environment
7. To encourage public and private sector particpation in the development and management of energy sectors

8.3 The policy formulation of any sectors by the government is a continuing process which is usually implemented at different levels by different Institutions and individuals. At the times of operationalizing this policy there is a need to ensure appropriate strategies in rational way to achieve the states objectives at various levels at which there is a need for synchronised and positive attitude are stated as follows :

1. At macro level, policy decisions are to be synchronised to ensure that the output of the energy sector meets energy demands of all the end use sectors zones and socio-economic group on sustainable basis

2. At the sectoral level, policy decisions are to be to ensure balance development of different sub-sectors (e.g. coal, oil gas and power etc.) As for example power sector may be affected due to inadequate developmnt in natural gas sub-sectors.

3. While at tine subsector level, policy decisions are to be not only ensure balance development of different projectors and programmes but also maintained the stratigical schedule to complete the programme in due time.

8.4 Major policy issues and recommended policies are to be considered to achieve the objectives of National Energy Policy have been mentioned in the following sections:

a) Assessment of indigenous resources
b) Supply and augmentation of indigenous resources
c) Reduction of imbalance in energy consumption
d) Allocation of non-renewable enegy resources
e) Conservation
f) System loss reduction
g) Environmental Impact Assssment
h) Project Planning and implementation
I) Institutional issues
j) Research and development
k) Human resource development

9.0 Conclusion

9.1 Mineral and energy are the most important forms of energy. In the developing countries, electricity demand grew at a annual rate of 6.8% in the 1980's . In Bangladesh this growth rate was 10%. Since our consumption

base is low this growth is likely to continue growign vigoroulsy. Once it reaches the threshold, it will level off.

9.2 It has been established that the production distribution and utilization of electricity are the most important ingredients needed for the development of the country and that Bangladesh has to depend on imported fuel. In selecting fuels it is to be recognised that different sources of energy are in many respects complementary rather than competitive. Bangladesh cannot, however, afford to experiment on a new concept of electricity production without determining its reliability and cost economics. Among the important fuels, both gas coal and solar energy and wind mill would be appropriate in our situation.

9.3 In order to make policy decisions concerning the energy requirements of the country and make necessary plans and programmes it is imperative to examine closely what can be expected from the diferent sources of energy in long term perspective. Moreover the cost-benefit, transportation and handling and pollution of environment of each individual source have to be examined carefully with specific reference to Bangladesh conditions. Only then a clear picture of the energy situation of the country will emerge and thus it will be possible to select from a range of primary fuel, a judicious generation mix which offers the most economic solution, the greatest technical convenience, the highest degree of cleanliness of the environment and the most reliable supply at the appropriate time to the majority of the population who need it.

References :

GOB : Third and Fourth Five Year Plan

GOB : National Energy Policy 1996

GOB : Task Force Report 1990

BBS : Report on the Energy & Minerals 1990

BBS : Oil, Gas and Mineral Development 1991.

MOPFMR : Unnayan Prabaho, 1991-95.

মডিউল-৩

বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ

জননীতি (Public Policy) ও নীতি প্রক্রিয়া

মোশাররাফ হোসাইন ভুইঞা

ভূমিকা

নীতি বিশ্লেষণ(Policy Analysis) চর্চার সুত্রপাত ঘটে ষাটের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে । এর প্রেক্ষাপট অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় মুখ্যত দু'টি বিষয় লক্ষণীয় । একদিকে ওই সময়ে রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যাপক সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি নীতি ও কর্মসুচি ফলপ্রসুতা মুল্যায়নের প্রয়োজন দেখা দেয় । অপরদিকে লোক-প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ জননীতি সম্পর্কে পঠন ও গবেষণায় বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন । ফলে জ্ঞানচর্চার (Academic discipine) শাখা হিসেবে জননীতি ও নীতি বিশ্লেষণের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় । এ আগ্রহ ও জনপ্রিয়তা অন্যান্য পশ্চিমা দেশেও ছড়িয়ে পড়ে । জননীতি সম্পর্কে গবেষণা ও পরামর্শদানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন think tank ।

নীতি (Policy) কী ?

সমাজ , রাজনীতি, সরকার ,শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'নীতি' কথাটি প্রায়শই উচ্চারিত হয় । সহজ ভাষায় বলতে গেলে নীতি বা (Policy) হচ্ছে সেইসব বৃহত্তর সিদ্ধান্ত, যার আলোকে ক্ষুদ্রতর সিদ্ধান্তসমুহ গৃহীত হয় ।

জননীতি(Public Policy) কী ?

ব্যাপক জনসাধারণকে সামনে রেখে যে নীতি গ্রহণ করে, এক কথায় তাই হচ্ছে জননীতি বা (Public Policy), এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সরকার মুলত একটি রাজনৈতিক কঠামো এবং বিপুল সংখ্যক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এর আওতাধীন । জননীতির কয়েকটি সুপরিচিত সংজ্ঞা এ প্রসংঙ্গে প্রণিধানযোগ্য ঃ

" Public Policy is whatever governments choose to do or not to do" (Dye)

"Broadly defined, public policy is the relationship of a government unit to its environment" (Eyestone)

" Public policy is a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern." (Anderson.)

জননীতির বৈশিষ্ট্য

জননীতি সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় সবিশেষ লক্ষণীয় । প্রথমত, জননীতি কোন লক্ষ্যহীন আচরণের বহিঃপ্রকাশ নয় । জননীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে । দ্বিতীয়ত, জননীতি কতিপয় বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তের সমষ্টি মাত্র নয় । জননীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের একটি কাঠামো ও ধারাবাহিকতা রয়েছে । তৃতীয়ত, জননীতি কেবল কাঙ্খিত করণীয় বিষয়ের মধ্যেই সীমিত নয় , প্রকৃত কার্যক্রম ও এর অর্ন্তভূক্ত । চতুর্থত, জননীতি ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটোই হতে পারে ।

জননীতির বিভিন্ন দিক

জননীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার ঃ

১. **নীতি সংক্রান্ত দাবি (Policy demands)** ঃ সরকারি বা বেসরকারি বিভিন্ন মহল থেকে প্রায়শ বিভিন্ন বিষয়ে সরাসরি উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত কামনা করে দাবি উচ্চারিত হয় । এগুলোকে বলা হয় Policy demands অনেক সময় এসব দাবি জননীতি প্রণয়নের ভিত্তি রচনা করে ।

২. নীতিগত সিদ্ধান্ত (Policy decisions) ঃ সরকারি কর্তৃপক্ষ জনগুরুত্ব-সম্পন্ন বিভিন্ন বিষয়ে যেসব দিক নিদের্শনামুলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেগুলো হচ্ছে Policy decisons নীতিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় ।

৩. নীতি বিবরণী (Policy statements) ঃ কোন নির্দিষ্ট জননীতি সম্পর্কে সরকার সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি সম্বলিত যেসব বিবরণী বা বিবৃতি প্রকাশ করে, সেগুলো হল (Policy statements) সাধারণত গণমাধ্যম এবং সরকারি প্রকাশনার মাধ্যমে এগুলো প্রচার করা হয় ।

৪. নীতির ফলাফল (Policy outputs) ঃ বিঘোষিত জননীতির বাস্তবায়িত রূপ হচ্ছে Policy outputs. বিভিন্ন সরকারী কর্মসুচিকে আমরা Policy outputs হিসাবে গণ্য করতে পারি ।

৫. নীতির প্রভাব (Policy outcomes) ঃ জননীতির আলোকে গৃহীত কর্মসূচি জনগোষ্ঠী তথা সমাজের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা হল Policy outcome. প্রতিটি জননীতির কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হল, Policy outcomes থেকে তা প্রতিভাত হবে।

জননীতি অধ্যয়নের উদ্দেশ্য

এতকাল রাষ্ট্রযন্ত্র , সরকার-কাঠামো এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার মাধ্যম ছিল মুলত সনাতন রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোক- প্রশাসন। সাম্প্রতিককালে এর পাশাপাশি জননীতি ও নীতি বিবশ্লেষণ পঠন-পাঠনের আগ্রহ ও প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে । কারণ , প্রথমত , জননীতি অধ্যয়নে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, জননীতি চর্চার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবনের বাস্তব সমস্যাবলীর সমাধানে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পেশাগত জ্ঞানের সম্বলিত প্রয়োগ সম্ভব হয়। তৃতীয়ত, জননীতি বিষয়ক গবেষণা সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে যথাযথ নীতি ও কৌশল অবলম্বনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

নীতি প্রক্রিয়া (Policy Process)

নীতি প্রক্রিয়া একটি ঘুর্ণায়মান চক্রের মত । জনজীবনে একটি নুতন দাবি কিংবা বিষয়ের অবতারণার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার শুরু। বিষয়টি যখন সরকার তথা জনসাধারণের মনোযোগ লাভ করে, তখনই এটি নীতিগত বিষয়ে পরিণত হয়। এ পর্যায়টিকে বলা হয় বিষয় নির্ধারণ। এর পরের স্তরটি হচ্ছে কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ । এ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠী তাদের স্বার্থের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে । এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্ভাব্য বিকল্প কর্মপন্থাসমুহ চিহ্নিত করে এবং প্রতিটি পন্থার সুবিধা-অসুবিধা বিচার বিশ্লেষণ করে। এ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সকল দিকই বিবেচনায় আনা হয়। সম্ভাব্য বিকল্পসমূহের চুলচেরা বিশ্লেষণের পর সরকার তার বিবেচনার সর্বোত্তম কর্মপন্থাটি গ্রহণ করে। এটি একটি নীতগত সিদ্ধান্ত (Policy decision)।

এতোগুলো নীতি প্রণয়নের (Policy formulation) পর্যায় । এরপর আসে যথাযথ কর্মসুচির মাধ্যমে নীতি বাস্তবায়নের পর্যায়। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রমের সমর্থনে আইন প্রণয়ন ও অর্থ মঞ্জুরির জন্য সংসদের শরনাপন্ন হতে হয়। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন কারণে বাস্তবায়ন পর্যায়ে জননীতি ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করে । গণতান্ত্রিক কাঠামোতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ নীতি গ্রহণ করলেও বাস্তবায়নের কাজটি সাধারণত স্থায়ী প্রশাসন-যন্ত্র অর্থাৎ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণই করে থাকেন। নীতি বাস্তবায়নের পর বিঘোষিত লক্ষ্যের নিরিখে নীতি মুল্যায়ন করা হয় । অবশ্য কর্মসুচি বাস্তবায়নকালে পরিবীক্ষণের কাজও চলতে পারে।

মুল্যায়নের মাধ্যমে নীতর সফলতা ও ব্যর্থতা যাচাই করা হয় । এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সামনে তিনটি পথ খোলা থাকে । যদি দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট নীতি ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে, তাহলে তা বহাল থাকে । একে বলা হয় Policy Continuation । যদি দেখা যায় যে, আংশিক লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কিছু ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে, তাহলে নীতির সংশোধন বা পরিমার্জনের[১] প্রয়োজন হয় । আর যদি এরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, সংশ্লিষ্ট নীতি কাঙ্কিত লক্ষ্য অর্জনে সম্পুর্ণভাবে কিংবা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে , তবে এই নীতি বাতিল[২] করতে হবে । এই পর্যায়ে আবার সর্বসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং একে কেন্দ্র করে আরেকটি নীতিগত বিষয়ের অবতারণা হয় , যা একটি নতুন বিষয়ের[৩] ভিত্তি স্হাপন করে(Agenda Setting) ।

Bibliography

1. Anderson, James E. (1984), Public Policy-Making, 3rd edn., New York: Holt Rinehard & Winston.

2. Davis, G. et al (1988), Public Policy in Australia, Sydney: Allen and Unwin.

3. Dror; Yehezkel (1968), Public Policy,Making Reexaminied. San Francisco: Chandler.

4. Dunn, William N. (1981), Public Policy Analysis : An Introduction, Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc.

5. Dye, Thomas R. (1978), Understanding Public Policy, 3rd edn., Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc.

6. Lindblom, Charles E. (1959), "The Science of Muddling Through", Public Administration Review, Vol. 19.

7. .... "Still Mudding , Not yet Through, "Public Administration Review Vol. 39 No.6.

8. Simon, Hervert A. (1957), Administrative Behaviour : A Study of Decision,Making Processes in Administration, New York: Macmillan.

নীতি -বিশ্লেষণের বিভিন্ন মডেল

মোশাররাফ হোসাইন ভূঞা
উপ-পরিচালক, বিপিএটিসি

নীতি বিশ্লেষণ (Policy Analysis)

সংক্ষেপে বলেত গেলে, Policy analysis হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে একটি নির্দিষ্ট জননীতির বিচার বিশ্লেষন। "Public Policy analysis involves observing politics and tracing how economic and social forces, institutions, people events and circumstances interact. It offers a way of exploring how policies were chosen, and a method for judging their impact." (Davis, et al.)

নীতি-বিশ্লেষণের বিভিন্ন মডেল (Policy Analysis models)

সময়ের বিবর্তনে নীত বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা ও মডেলের বিকাশ ঘটেছে। জননীতি ও জনজীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণের জন্য এসব মডেল প্রয়োগ করা হয়। এগুলোর তুলনামূলক যথার্থতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের প্রচেষ্টা অর্থহীন। বাস্তব অবস্থা হল, জননীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজে বিভিন্ন শক্তি সক্রিয় রয়েছে। এসব শক্তির তুলনামূলক প্রভাব নির্ধারিণ দুরুহ। বিভিন্ন মডেল বিভিন্ন শক্তির তৎপরতা ও মিথস্ক্রিয়ার উপর তুলনামূলকভাবে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। নিচে কয়েকটি সুপরিচিত মডেল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

প্রতিষ্ঠানবাদ(Institutionalism)

এটি একটি সনাতনী মডেল। সাধারণত ধারণা করা হয় যে, রাজনীতি তথা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম বিভিন্ন সংগঠন তথা প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয় মাত্র। এ মডেলে বিশ্বাসীগণ জননীতি আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। একথা অনস্বীকার্য যে, কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত কোন নীতিই জননীতির রূপ পরিগ্রহ করে না। সরকার জননীতিকে তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন। এগুলো হচ্ছে ঃ আইনসঙ্গত রূপ, সর্বজনীনতা এবং বাধ্যবাধকতা।

দলতত্ত্ব (Group Theory)

রাজনৈতিক কাঠামোর একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিভিন্ন দল বা গ্রুপের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া । এসব গ্রুপের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের পালার্মেন্টারি পার্টি , সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন , ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, মহিলা সংস্থা, ধর্মীয় সংস্থা, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক, গণমাধ্যম প্রভৃতি । বিভিন্ন বিষয়ে এসব গ্রুপ প্রায়ই পরস্পর বিরোধী ভূমিকা পালন করে থাকে । সরকারি প্রশাসন-যন্ত্রের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকাও অনেক সময় বিভিন্নমুখী হয়ে থাকে । জননীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এসব পরস্পর বিরোধী দলীয় স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয় । Earl Latham এর মতে , "Public policy is actually the equilibrium reached in the group struggle at any given moment, and it represents a balance which the contending factions or groups constantly strive to tip in their favour."

এলিট তত্ত্ব(Elite Theory)

যদিও আদর্শগতভাবে জননীতি সংক্রান্ত দাবি জনসাধারণের মধ্যে থেকেই উত্থাপিত হওয়ার কথা এবং জননীতিতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ইচ্ছাই প্রতিফলিত হওয়ার কথা; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সমাজের সুবিধাভোগী এলিট শ্রেণীই ব্যাপক জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । নীতি সংক্রান্ত দাবি সাধারণত তাঁরাই উত্থাপন করেন এবং জননীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁরাই সরকারকে প্রভাবিত করেন । সুতরাং জননীতিতিতে জনসাধারণ নয়, এলিট শ্রেণী মুল্যবোধেরই প্রতিফলন ঘটে । Dye এর ভাষায় "Public policy may be viewed as the preferences and values of a governing elit."

যৌক্তিক মডেল(Rational Model)

Simon প্রবর্তিত এ মডেলটি সম্ভবত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সবচাইতে পরিচিত কাঠামো । যৌক্তিক জননীতি গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে "to maximise net value achievement" আমরা যখন Net value achievement এর কথা বলি তখন আমরা ধরে নেই যে, সমাজের সংশ্লিষ্ট সকল মুল্যবোধ আমরা জানি, কিছু কিছু মুলাবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে অপরাপর কিছু মুল্যবোধ ত্যাগ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের হারানোর চাইতে প্রাপ্তির পরিমাণ বেশী । এখানে মুল্যবোধ বলতে অবশ্য জননীতির সাথে সংশ্লিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক মুল্যবোধকে বোঝায় ।

স্বল্প বৃদ্ধির মতবাদ(Incrementalism)

সাইমনের যৌক্তিক মডেল সম্পর্কে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল এই যে, প্রক্রিয়াটি অবাস্তব। সমাজের প্রচলিত মুল্যবোধ চিহ্নিতকরণ এবং এগুলোর তুলনামুলক মুল্য নিরূপণের কাজটি সহজ নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে Charles E. Lindblom উপস্থাপন করেন Incremental Model । এ মডেল অনুযায়ী নতুন জননীতি পুর্বতন জননীতির ধারাবাহিকতা মাত্র। নীতি প্রণেতাগণ বিদ্যমান জননীতিকে ভিত্তি হিসেবে ধরে স্বল্প মাত্রায় কিছু কিছু নতুন বিষয় যোগ করেন। এ ব্যবস্থায় পুর্বতন জননীতির বৈধতাকে স্বীকার করে নেয়া হয়।

মিশ্র অনুসন্ধান মডেল (Mixed Scanning Model)

Amitai Etzioni প্রবর্তিত এ মডেলের সারকথা হল জননীতির ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় যৌক্তিক মডেল অনুসারে এবং মৌলিক সিদ্ধান্তের আলোকে খুঁটিনাটি বিষয় নির্ধারিত হয় স্বল্প বৃদ্ধির মতবাদ অনুযায়ী।

খেলা তত্ত্ব (Game Theory)

সাধারণতঃ যুদ্ধ, শান্তি, আন্তর্জাতিক কুটনীতি, পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, দর-কষাকষি, মোর্চা গঠন প্রভৃতি প্রতিযোগিতামুলক ক্ষেত্রে এ মডেল প্রয়োগ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে কোন পক্ষ এককভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। এক পক্ষের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে অপর পক্ষের মনোভাবের ওপর। এ মডেলে 'পরাকৌশল' (Strategy) বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ।

সিস্টেম তত্ত্ব (System Theory)

এ মডেলে জননীতিকে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার Political System ফসল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ব্যবস্থাটি কাজ করে একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গসমূহ হচ্ছে পরিবেশ, কাঠামো ও পদ্ধতি। জনদাবি ও জনসমর্থন এখানে input হিসেবে কাজ করে এবং পরিবেশ , কাঠামো ও পদ্ধতি সম্বলিত সিস্টেমের ভেতর দিয়ে output হিসেবে বেরিয়ে আসে সরকারী সিদ্ধান্ত তথা জননীতি। পুরানো নীতির feedback নতুন নীতি input হিসেবে কাজ করে।

উপসংহার

একটি নির্দিষ্ট জননীতি আলোচনার উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ মডেলের প্রয়োগ সকল ক্ষেত্রে যথার্থ নাও হতে পারে। একই সঙ্গে একাধিক মডেলের আলোকে জননীতিকে বিশ্লেষণ করা যায়। Dye এর ভাষায় "although some policies appear at first glance to lend themselves to explain by one particular model, most policies are a combination of rational planning, incrementalism, interest group activity, elite preferences, systemic forces, competition and institutional influences." বিভিন্ন মডেলের প্রাসঙ্গিকতা এবং তুলনামুলক গুরুত্ব নির্ভর করবে দেশ, কাল, পরিস্থিতি, নীতির প্রকৃতি এবং অংশত বিশ্লেষকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

Bibliography

1. Anderson, James E. (1984), Public Policy-Making, 3rd edn. New York: Holt Rinehard & Winston.

2. Davis, G. et al (1988), Public Policy in Australia, Sydney: Allen and Unwin.

3. Dror; Yehezkel (1968), Public Policy,Making Reexaminied. San Francisco: Chandler.

4. Dunn, William N. (1981), Public Policy Analysis : An Introduction, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.

5. Dye, Thomas R. (1978),Understanding Public Policy, 3rd edn.,Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc.

6. Lindblom, Charles E. (1959), "The Science of Muddling Through", Public Administration Review, Vol. 19 (1979)

8. Simon, Hervert A. (1957), Administrative Behaviour : A Study of Decision,Making Processes in Administration, New York: Macmillan.

7. .... "Still Mudding , Not yet Through, "Public Administration Review Vol. 39 No.6.

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষানীতি

প্রফেসর এম, হোসেন আলী
সদস্য, পরিচালন পর্ষদ

১। **শিক্ষার গুরুত্ব**

বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। সংবিধানের ১৫নং ধারায় বর্ণিত রয়েছে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানের প্রভূত উন্নতি সাধন যাতে নাগরিকদের জন্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমুহ অর্জন করা যায় ঃ

(ক) ‘‘অন্ন,বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা ....।’’

সংবিধানের ১৭ নং ধারায় আরো উল্লেখ রয়েছে ঃ

‘‘রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য ;

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপুর্ণ করবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য ;

(গ) ‘‘আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দুর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।’’

বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষার গুরুত্ব ও অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ থাকলেও বাস্তব অবস্থা ভিন্নতর। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড । যার শিক্ষা নেই তার কিছুই নেই। বছরের পর বছর যুগের পর যুগ এ ধরণের কথা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে তা ছড়িয়ে গেছে। গত কয়েক দশকে দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। বৃটিশ গেছে, পাকিস্তান হয়েছে, পাকিস্তানী কর্তৃত্ব হটে গেছে চিরকালের মত। কায়েম হয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। লোকসংখ্যা বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। দুনিয়ার কত দেশ বর্ষ বিদায় ও যুগ বদলের পালায় কত এগিয়ে গেছে। সেই তুলনায় আমরা কোথায়!

শিক্ষা হচ্ছে সভ্যতার পুর্বশর্ত। শিক্ষার সোপান বেয়ে চলেছে মানব সভ্যতার অগ্রগতি। কিন্তু একটি দুঃখজনক সত্য এই যে, শিক্ষার পরিসংখ্যানে আমাদের স্থান লজ্জাজনকভাবে নীচে।

মানুষ মাত্রই আলোর পথের অভিযাত্রী। অন্ধকারে ডুবে থাকতে কে চায় ? অশিক্ষা, নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মানুষ নিশ্চয়ই চায় বেরিয়ে আসতে। যে দেশের মানুষ যত আগে এই অভিযাত্রায় পা বাড়িয়েছে সে দেশ তত এগিয়ে গেছে। তাদের এই অগ্রযাত্রার প্রতিটি দিকই বেশ চমকপ্রদ। দেশের মানুষ যতই লিখতে, পড়তে পারার মত জ্ঞান পেয়েছে ততই সবক্ষেত্রেই তাদের দক্ষতা গেছে বেড়ে। এখন কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। বলতে হবে, আমরা আমাদের দেশকে ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যাব আলোর পথে। অশিক্ষার অন্ধকার হটিয়ে আমরা সবাই মিলে সমাজকে অগ্রগতির ধারায় চালিত করব।

২। **বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন, ১৯৯০-এর ঘোষণা**

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা নীতি আলোচনায় যাওয়ার আগে ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যান্ডে (জমতিয়েন) অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত 'সবার জন্য শিক্ষা' ঘোষণা পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

১৯৯০ সালে বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে 'সবার জন্য শিক্ষা' ঘোষণা

১) সকলের মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পুরণ ঃ মৌলিক শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত সুযোগ থেকে প্রত্যেক শিশু, যুবা, বয়স্ক ব্যক্তি উপকৃত হতে পারবে।

২) দৃষ্টি ভঙ্গী গঠন ঃ সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে প্রচলিত মৌলিক শিক্ষার প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করাই যথেষ্ট নয়। বিদ্যমান সর্বোত্তম ব্যবস্থাদির ভিত্তিতে দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করতে হবে যেন বর্তমান সম্পদ সীমা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, শিক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি অতিক্রম করে সকলের মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পুরণ করা যায়।

৩) সার্বজনীন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও সমতার বিস্তৃতি ঃ সকল শিশু, যুবা ও বয়স্ক ব্যক্তিকে মৌলিক শিক্ষা দিতে হবে।

৪) শিক্ষা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান ঃ শিক্ষার সম্প্রসারিত সুযোগ কোন ব্যক্তি বা সমাজের অর্থবহ উন্নয়নের কাজে লাগে কিনা তা চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে প্রাপ্ত সুযোগ থেকে ঐ ব্যক্তি বা সমাজ প্রকৃতপক্ষে কোন শিক্ষা অর্জন করে কিনা তার উপর। অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান, যুক্তি, যোগ্যতা, দক্ষতা এবং মুল্যবোধ যদি আত্মীকরণ করা যায় তবেই শিক্ষা উন্নয়নের কাজে লাগে।

৫) মৌলিক শিক্ষার পদ্ধতি ও পরিধি বিস্তৃতকরণ ঃ শিশু, যুবা, বয়স্ক ব্যক্তি - সকলের মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজনের বৈচিত্র্য, জটিলতা এবং পরিবর্তনশীলতার কারণে মৌলিক শিক্ষার সংজ্ঞায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে তার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে।

৬) শিক্ষার পরিবেশ ঃ সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে শিক্ষা লাভ হয় না। যাদের জন্য শিক্ষার আয়োজন তারা যেন শিক্ষা কর্মকান্ডে শরিক হওয়ার জন্য এবং সে কর্মকান্ড থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি, স্বাস্থ্য সেবা, শারীরিক ও আবেগিক সমর্থন পেতে পারে সমাজকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৭) অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করা ঃ জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা আয়োজনের যে বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় সে দায়িত্ব পালনে কোন কর্তৃপক্ষ এককভাবে লোকবল, সম্পদ, প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন দিতে সক্ষম হবে এমন আশা করা যায় না। সে জন্যই সকল স্তরে নতুন উদ্যমে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও শক্তিবৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৮) প্রাসঙ্গিক সমর্থক নীতিমালা গঠন ঃ ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থা গঠন করা এবং তার সদ্ব্যবহার করার জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমর্থক নীতিমালা গঠন করা প্রয়োজন।

৯) সম্পদ সংগ্রহ ঃ অতীতের চেয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তৃত আকারে সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষার আয়োজন করতে গেলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সরকারী, বেসরকারী, স্বেচ্ছাসেবী কর্মকান্ডে অধিকতর অর্থ সম্পদ ও মানব সম্পদ যোগানো অপরিহার্য।

১০) আন্তর্জাতিক সংহতি দৃঢ়করণ ঃ মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটানো সকলের ও বিশ্বের মানবিক দায়িত্ব। সেহেতু বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিকারকল্পে ন্যায্য, নিরপেক্ষ অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দৃঢ় করা প্রয়োজন।

৩। ঐতিহাসিক পটভূমিকা

বৃটিশ আমল ঃ

১) বাংলা-ভারত উপ-মহাদেশে শিক্ষার আনুষ্ঠানিক সুচনা ঘটে ১৮৩৫ সালে। আগে এদেশে প্রথম জনশিক্ষা কমিটি (Committee of Public Instruction)গঠিত হয় ১৮২৩ সালে যার প্রথম সভাপতি ছিলেন থমাস ব্যারিংটন ম্যকলে। ম্যকলে দেশের শিক্ষা বিষয়ে যে 'মিনিট' রচনা করেছিলেন তা 'ম্যকলে মিনিট' নামে পরিচিত। সেটি গভর্ণর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিংক কর্তৃক গৃহীত হয় ১৮৩৫ সালে (৭ই মার্চ)।

২) এ দেশের শিক্ষা প্রথম সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৮৪৫ সালে। ইংল্যান্ডের অনুকরণে বাংলা-ভারত উপ-মহাদেশে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে শিক্ষা বিষয়ক একটি বিল অনুমোদন করে। এর ভিত্তিতে উপ-মহাদেশের তৎকালীন শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সভাপতি স্যার চার্লস উড্ ১৮৪৫-এ কতগুলি সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করেন। যে সরকারী নথিতে তিনি এ সুপারিশগুলি পেশ

করেছিলেন তা 'উড্‌স এডুকেশন ডেসপ্যাচ' নামে পরিচিত। এতে শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক স্তর - প্রাইমারী, জুনিয়র, হাই-ইংরেজী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে উড্‌স ডেসপ্যাচ-এর সুপারিশ প্রায় অবাস্তবায়িতই থেকে যায়।

৩) ১৮৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ দেশে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়।

৪) ১৮৮২ সালে ভাইসরয় লর্ড রিপণ উইলিয়াম হান্টারকে চেয়ারম্যান করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন যা 'ইন্ডিয়ান এডুকেশন' নামে পরিচিত। এই কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার দায়-দায়িত্ব স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসন যেমন জেলা বোর্ড ও পৌর সভার থাকা উচিত বলে সুপারিশ করে।

৫) ১৮৩৫ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত এই ৬৮ বছর সময়কালে এ দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়। এর মধ্যে স্কুল ভবন নির্মাণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, নিম্ন বর্ণের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে ভর্তি করানো এবং ছাপানো বইয়ের বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন লক্ষণীয়।

৬) ১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন ভাইসরয় হিসেবে উপ-মহাদেশে আসেন। তাঁকে একজন উল্লেখযোগ্য শিক্ষা সংস্কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি শিক্ষা খাতে অধিক সরকারী অনুদান প্রদানের নীতি গ্রহণ করেন। ফলে ১৮৯৮ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত এ দেশে শিক্ষার বেশ প্রসার ঘটে।

৭। পুর্ব বাংলা ও আসামে উচ্চ শিক্ষাদানের লক্ষ্যে ১৯১২ সালের মে মাসে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করা হয়, যা 'নাথান কমিশন' নামে অভিহিত। পরবর্তীতে ১৯১৭ সালে সরকার কর্তৃক গঠিত 'স্যাডলার কমিশন' ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ পেশ করে ১৯১৯ সালে। এর প্রেক্ষিতে ১৯২০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাশ হয় এবং ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ বছর জুলাই থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

৮। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাশ হয়। যাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয় এবং এর পর থেকেই এ দেশের শিক্ষা প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৯। ১৯৪৪ সালে এ দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত বাস্তব পরিকল্পনা গৃহীত হয়, যা 'সার্জেন্ট রিপোর্ট' নামে পরিচিত। এ রিপোর্ট অনুযায়ী ৩ থেকে ৫ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের জন্য সার্বজনীন বাধ্যতামুলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের সুপারিশ করা হয়। ৬ থেকে ১১ বছর বয়সীদের

জন্য জুনিয়র বেসিক এবং ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের জন্য সিনিয়র বেসিক পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

<u>পাকিস্তান আমল</u>

১) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় করাচীতে। এ সম্মেলনে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত বয়স সীমা ১১ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। সম্মেলনে আশা ব্যক্ত করা হয় যে, সর্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা অর্জিত ও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে ২০ বছরের মধ্যে।

২) পাকিস্তানে প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ১৯৫৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর যা 'শরীফ কমিশন' নামে খ্যাত। শরীফ কমিশন ১৯৫৯ সালে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। শরীফ কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখার জন্য পাকিস্তান সরকার বিচারক হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন ১৯৬৪ সালে। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে । এর পর ১০৬৯ সালে সরকার এয়ার ভাইস মার্শাল নুর খানের নেতৃত্বে শিক্ষা বিষয়ক আর একটি কমিটি গঠন করেন যার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে।

পাকিস্তান আমলে শিক্ষার প্রসারে উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে শিক্ষা বাস্তবে কাঙ্খিত অগ্রাধিকার বা গুরুত্ব পায়নি। পুরো শিক্ষা খাতে এই ২৪ বছরে গড়ে শতকরা ২২ ভাগ অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা থাকলেও বাস্তবে ব্যয় হয়েছে অনেক কম।

<u>বাংলাদেশ আমল</u>

১) ১৯৪৭ সালে বৃটিশরা এদেশ থেকে চলে যাবার পর পাকিস্তানী শাসনামলে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে তেমন কোন মৌল পরিবর্তন করা হয়নি। ঔপনিবেশিক আমলের মূল ধারা অক্ষুন্ন রেখেই শিক্ষা সুযোগের কিছু সম্প্রসারণ করা হয়েছিল মাত্র। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত বিষয়গুলোর প্রথম সারিতে স্থান পেলো শিক্ষা। তাই বলা হলো শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে জনশক্তিকে মানব সম্পদে উন্নীতকরণের একটি মৌল প্রক্রিয়ায় রূপ নেয় ও দেশের আপামর জনসাধারণ সে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পরই ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই

বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয় যা 'ডঃ কুদরত-ই-খুদা কমিশন' নামে অভিহিত। তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ ঐ কমিশন উদ্বোধন করেন। ১৯৭৩ সালের ৮ই জুন কমিশন সরকারের কাছে অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। কমিশনের পুর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ৩০শে মে।

২) ১৯৭৮ সালে (৫ই আগষ্ট) রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান 'জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করেন যার সভাপতি ছিলেন প্রথমে কাজী জাফর আহম্মদ এবং পরে ডঃ আব্দুল বাতেন। উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে একটি অন্তবর্তীকালীন শিক্ষা নীতি প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে (৮ই ফেব্রুয়ারী)।

৩) ১৯৮৭ সালে (২৩শে এপ্রিল) অধ্যাপক মফিজ উদ্দিনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ সালে।

৪। অর্ন্তবর্তীকালীন শিক্ষা নীতি-১৯৭৯

জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ ১৯৭৯ সালে একটি অর্ন্তবর্তীকালীন শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করে সরকারের নিকট পেশ করেন। অর্ন্তবর্তীকালীন শিক্ষা নীতির প্রধান বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করা হ'ল ঃ

প্রাথমিক শিক্ষা

১) দেশের গণমানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ, জাতীয় উন্নয়ন এবং জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সুষ্ঠু ও গতিশীল প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে নৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি সচেতন করে তোলা, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা, দেশের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা এবং সামাজিক মুল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টির জন্য গুরুত্ব আরোপ করা।

২) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তি হবে পাঁচ বছর। এই শিক্ষা ৬-১১ বছর বয়সের শিশুর জন্য।

৩) প্রাথমিক শিক্ষা হবে অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামুলক।

৪) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বাড়াতে হবে।

৫) প্রয়োজনবোধে নির্বাচিত বিদ্যালয়সমুহে ডবল শিফ্‌ট চালু করে নির্মাণ ব্যয় আপাততঃ বাঁচাতে হবে।

৬) বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে স্মৃতি সংরক্ষণে অভিলাষী নাগরিকদের কাছ থেকে জমি, বাড়ি বা অর্থ দান হিসেবে এবং সন্তানহীন অথচ উত্তরাধিকারহীন নাগরিকদের বিষয়সম্পত্তি গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে দেশের সর্বত্র ১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাক্রম (পাঠ্যসুচি) অভিন্ন হবে।

৮) দেশে বর্তমানে চালু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালত তথাকথিত কিন্ডারগার্টেন, নার্সারী ও এই ধরণের বিশেষ স্কুল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থের পরিপন্থী বিধায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হবে।

৯) প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা। এর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসুচিতে প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাথে সৌন্দর্য্যবোধ, শিল্পকলা, পরিবেশ পরিচিতি, স্থানীয় ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক এবং উৎপাদন সম্পর্কিত বিষয়াদি সন্নিবেশিত হবে।

১০) প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১) প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বর্তমান চাকুরির মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

১২) প্রাথমিক বিশেষ করে নতুন স্কুলে শিক্ষক পদে অধিক সংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

১৩) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অতি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় বিধায় এর জন্য মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ বিভাগ (ডিভিশন) স্থাপন করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

১) মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ৩টি স্তর থাকবে। যথাঃ নিম্ন মাধ্যমিক- ৩ বছর, মাধ্যমিক-২ বছর এবং উচ্চ মাধ্যমিক-২ বছর। তিনটি স্তরেই প্রান্তিক পরীক্ষা হবে। নবম শ্রেণী থেকে সাধারণ বিষয় ছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য, কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদি বিভাগ থাকবে।

২) কোন শিক্ষার্থী এস,এস,সি পরীক্ষা পাশের পুর্বে যে কোন শ্রেণী থেকে বিদ্যালয় ত্যাগ করলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে পঠিত বিষয় সম্পর্কে সার্টিফিকেট প্রদান করবে।

৩) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর শিক্ষার্থী যে কোন পেশায় প্রথম ধাপে নিযুক্তি লাভের উপযুক্ততা লাভ করবে।

৪) মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা। ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হবে।

৫) মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রমে স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনায় স্থানীয় জনগণের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭) সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সরকার বাস্তবানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা

১) মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও উৎপাদনমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে।

২) মাদ্রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ী স্তরগুলো সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে।

৩) মাদ্রাসার সর্বস্তরে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হবে এবং এর জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪) মাদ্রাসা শিক্ষাদান পদ্ধতির আধুনিকায়নের জন্য অবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষাকগণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) মাদ্রাসার দাখিল স্তরকে মাধ্যমিক, আলিমকে উচ্চ মাধ্যমিক, ফাজিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমমর্যাদা প্রদান করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১) উৎপাদনমুখী শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণের হাতে-কলমে শিক্ষাদান করে দক্ষতার সাথে বিভিন্ন কারিগরি ও উৎপাদনমূলক কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে এবং বৃত্তি গ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনে সাহায্য করা।

২) অষ্টম শ্রেণীর পর বৃত্তিমূলক কোর্স আরম্ভ হবে এবং এর মেয়াদ হবে সাধারণভাবে ২ বছর। স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হবে।

৩) বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন মেয়াদী খন্ডকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

৪) বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় লাগসই প্রযুক্তির উপর জোর দিতে হবে।

৫) মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তিমুলক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

কারিগরি শিক্ষা

১) ডিপ্লোমা স্তরের কারিগরি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা।

২) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তি, কৃষি, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, প্যারামেডিক্যাল ইত্যাদি এক বা একাধিক বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে।

৩) পরিকল্পিত জনশক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে ছাত্র ভর্তি করতে হবে।

৪) পলিটেকনিক থেকে উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রদের জন্য ডিগ্রী স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং এই শিক্ষার মেয়াদ হবে দুই বছর।

৫) শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের যথার্থ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৬) মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের কারিগরি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষা

১) জাতির উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভর করে উচ্চ শিক্ষার মান ও অগ্রগতির উপর। বিভিন্ন প্রকার উচ্চতর পর্যায়ের কার্যক্রম যেমন, সমাজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে নেতৃত্ব দেয়া, প্রশাসন, শিক্ষকতা, দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ইত্যাদির জন্য দক্ষ ও জ্ঞানী ব্যক্তি তৈরি করা এবং গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের নব দিগন্ত উন্মোচন করা উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং দেশের উচ্চতর চাহিদা ও সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য জাতীয় সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুপরিকল্পিতভাবে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই পরিকল্পনা গ্রহণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

২) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাদ্যমিক স্তর থেকে শিক্ষার মান সমন্বয় করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে।

৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৪) উচ্চ শিক্ষার কারিকুলাম ও সিলেবাস যুগোপযোগী করতে হবে।

৫) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অধ্যয়নের একই শ্রেণীভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য সুষম শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৬) ছাত্র ভর্তি, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণার নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকতে হবে।

৭) উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে বাংলা একাডেমী ও বেসরকারী প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দিয়ে বাংলায় মৌলিক পাঠ্যপুস্তক রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) সমাজের সব স্তরের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে।

৯) পুর্ণকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে খন্ডকালীন শিক্ষার্থীদের জন্যও উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে।

১০) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমুহের গবেষণাগার সমৃদ্ধ করতে হবে।

১১) শিক্ষার উচ্চ স্তরে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। একটি সুষ্ঠু শিক্ষা নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের উপর দেশের শিক্ষার উন্নয়ন নির্ভর করে। জাতীয় জীবনের অগ্রগতির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হবে তার সার্বিক দিক নির্দেশনা থাকে শিক্ষা নীতিতে। শিক্ষা নীতি প্রণীত হয় দেশের চাহিদার উপর ভিত্তি করে। ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম ও মুল্যবোধ, যুগের চাহিদা ইত্যাদি একটি শিক্ষা নীতি প্রণয়নে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বাস্তব অর্থে বর্তমান বাংলাদেশে কোন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট শিক্ষা নীতি নেই। অবশ্য অতি সম্প্রতি সরকার একটি বাস্তবধর্মী শিক্ষা নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ এবং চাহিদার নিরীখে সরকারের গৃহীত শিক্ষা বিষয়ক নীতিসমুহের সার সংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল ঃ

<u>প্রাথমিক শিক্ষা</u>

- প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করা হবে।
- ''সবার জন্য শিক্ষা'' কর্মসুচীর আওতায় ২০০০ সালের মধ্যে ৬২% মানুষকে স্বাক্ষর করা, ৯৫% শিশুকে স্কুলে ভর্তি করা এবং ৭০% শিশু যাতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তা নিশ্চিত করা হবে।
- স্কুল ত্যাগকারী ছাত্র-ছাত্রী এবং যারা আদৌ স্কুলে যায়নি (৮-১৫ বছর বয়স্ক) এমন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক স্বাক্ষরতা কর্মসুচী (নন-ফরমাল লিটারেসী প্রোগ্রাম) চালু রাখা হবে।
- ২৫-৪৫ বছর বয়স্ক নারী পুরুষের জন্য গণশিক্ষা কর্মসুচী (মাস এডুকেশন প্রোগ্রাম) চালু থাকবে।
- সরকারী তরফ থেকে নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন অথবা বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলকে সরকারীকরণের পরিবর্তে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করে সেই সকল স্কুলের প্রতিটির মোট ৪ জন শিক্ষককে ৫০০/- হারে বেতন প্রদান করা হবে।
- বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) সমুহকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে উৎসাহ প্রদান করা যাবে।

- ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামুলক রাখা হবে।
- ইংরেজীতে দ্বিতীয় আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাখা হবে।
- বিনামুল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ অব্যাহত থাকবে।
- কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ব্যবহৃত পুস্তকাদি সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের ব্যবস্থা থাকবে।
- ''শিক্ষার জন্য খাদ্য'' কর্মসুচী গ্রহণ ও সম্প্রসারণ করা হবে।
- প্রাথমিক স্কুলে ৬০% শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা থাকবে।
- স্কুল পরিচালনায় স্থানীয় ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করা হবে।
- শহর ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা সুবিধার বৈষম্য হ্রাস করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে।
- প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কম্পিউটার ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে।

<u>মাধ্যমিক শিক্ষা</u>

- মাধ্যমিক শিক্ষাকে জীবনমুখী ও কর্মমুখী করা হবে।
- সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষা এবং ভোকেশনাল শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধান করা হবে।
- নিম্নমাধ্যমিক স্তরকে ২টি উপ-ব্যবস্থায় ভাগ করা হবে ঃ
  - ক) সাধারণ শিক্ষা ও উপ-ব্যবস্থা এবং
  - খ) মাদ্রাসা শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা (জুনিয়র দাখিল)
- মাধ্যমিক স্তরকে ৩টি উপ-ব্যবস্থায় ভাগ করা হয়েছে ঃ
  - ক) সাধারণ শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা ;
  - খ) ভোকেশনাল শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা; এবং
  - গ) মাদ্রাসা শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা (দাখিল)
- মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষা উপ-ব্যবস্থায় ৩টি শাখা -
  - ক) বিজ্ঞান শাখা;
  - খ) মানবিক শাখা; ও
  - গ) ব্যবসায় শাখা।
- মাধ্যমিক স্তরের ভোকেশনাল শিক্ষা উপ-ব্যবস্থায় ৪২টি ভোকেশনাল ট্রেড থাকবে।
- মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষা উপ-ব্যবস্থায় ৫টি শাখা থাকবে ঃ
  - ক) বিজ্ঞান শাখা ;
  - খ) মানবিক শাখা ;
  - গ) ব্যবসায় শিক্ষা শাখা ;
  - ঘ) তাজবিদ শিক্ষা শাখা ; এবং

ঙ) হিফজুল কোরআন শাখা।

- মেয়েদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হবে।
- মিউনিসিপ্যাল বহির্ভুত অঞ্চলে মেয়েদেরকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে।
- ৪৬০টি থানায় ১১ হাজার মাধ্যমিক স্কুলে ও সাড়ে ছয় হাজার মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত সকল মেয়েদেরকে মাসিক বৃত্তি দান কর্মসুচীর আওতায় আনা হবে। মাধ্যমিক বৃত্তির হার হবে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী ৫০/- টাকা, ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী ৫৫/- টাকা, ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী ৬০/- টাকা, ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী ৭০/- টাকা, ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী ৮০/- টাকা এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফিস বাবদ একজন ছাত্রী এককালীন ২৫০/- টাকা পাবে।
- প্রতি থানা এলাকায় একটি সরকারী বালক বিদ্যালয় এবং একটি সরকারী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হবে।
- বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের বেতনের ৮০% সরকারী অনুদান প্রদান অব্যাহত রাখা হবে।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদার করা হবে। প্রতিটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে দুই শিফটে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা থাকবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ নিরুৎসাহিত করা হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

- উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে কর্মমুখী যুগোপযোগী করা হবে।
- উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরকে ৩টি শিক্ষা উপ-ব্যবস্থায় ভাগ করা হবে ঃ

  ক) সাধারণ শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা ;

  খ) ভোকেশনাল শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা; এবং

  গ) মাদ্রাসা শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা।
- সাধারণ শিক্ষা উপ-ব্যবস্থায় থাকবে ৫টি শাখা যথা ঃ ক) বিজ্ঞান শাখা, (খ) মানবিক শাখা, (গ) ব্যবসায় বাণিজ্য শাখা, (ঘ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শাখা এবং (ঙ) ইসলামী শিক্ষা শাখা।
- ভোকেশনাল শিক্ষা উপ-ব্যবস্থায় ৩টি শাখা থাকবে। যথা ঃ (ক) ভোকেশনাল ট্রেড শাখা, (খ) ৩২টি ভোকেশনাল ট্রেড, এবং (গ) ব্যবসায় ও অফিস ব্যবস্থাপনা শাখা।
- মাদ্রাসা শিক্ষা উপ-ব্যবস্থায় (আলিম) ৪টি শাখা থাকবে। যথাঃ (ক) বিজ্ঞান শাখা (খ) মানবিক শাখা, (গ) ব্যবসায় শিক্ষা শাখা, এবং (ঘ) তাজবিদ শাখা।
- উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রতি বিভাগে একটি করে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হবে।

উচ্চ শিক্ষা (কলেজ)

- ডিগ্রী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শাখাকে পৃথক করা হবে।
- কিছু কিছু প্রতিষ্ঠিত ও ঐতিহ্যবাহী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।
- সকল ডিগ্রী কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনা হয়েছে। কলেজগুলির সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে তুলে কলেজগুলির প্রশাসনিক এবং একাডেমিক মান উন্নত করা হবে।
- কলেজগুলিতে ক্রমান্বয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স সম্প্রসারণ করা হবে।
- ইংরেজী ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। ১৯৯৫-৯৬ সেশন হতে ডিগ্রী পাস ও অনার্স পর্যায়ে ইংরেজীকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে চালু করা হবে।
- বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের বেতনের ৮০% সরকারী অনুদান প্রদান অব্যাহত থাকবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

- মাদ্রাসা শিক্ষাকে জীবনমুখী ও কর্মমুখী করা হবে।
- সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধান করা হবে।
- নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষা উপ-ব্যবস্থার পাশাপাশি যথাক্রমে মাদ্রাসা শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা (জুনিয়র দাখিল) মাদ্রাসা শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা (দাখিল) এবং মাদ্রাসা শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা (আলিম) রাখা হবে।

ভোকেশনাল শিক্ষা

- ভোকেশনাল শিক্ষাকে জীবনমুখী এবং অর্থবহ করা হবে।
- মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মত ভোকেশনাল শিক্ষা ব্যবস্থাকেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার সমান্তরাল অবস্থানে নিয়ে আসা হবে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল উপ-ব্যবস্থায় বাংলা, ইংরেজী, গণিত, ধর্মশিক্ষা ও সামাজিক বিজ্ঞান আবশ্যিক বিষয় থাকবে।
- মাদ্রাসা শিক্ষা উপ-ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের মত কলেজে যথাক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্সে এবং ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা

- বেসরকারী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে।
- দেশের সকল (সাধারণ) ডিগ্রী কলেজ, আইন কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, সঙ্গীত কলেজ, চারু ও কারুকলা কলেজ, প্রতিরক্ষা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিদর্শন, অধিভুক্তি, পাঠ্যসুচী প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি দায়িত্বসমূহ পুরোপুরি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর উপর ন্যস্ত থাকবে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু মাস্টার্স, এমফিল এবং পি এইচ ডি কর্মসুচীর দায়িত্বে রেখে এ সকল প্রতিষ্ঠানকে উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
- পুরোপুরি শিক্ষাদান কর্মসুচী প্রবর্তনের প্রস্তুতি পর্বে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং কৃষি, গ্রাম উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা পরিকল্পনার বিষয়ে কর্মসুচী গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য নীতি

ধারণা, বিরাজমান স্বাস্থ্য সমস্যা ও সম্ভাব্য উত্তরণ প্রক্রিয়া

ডঃ মোহাম্মদ তারেক

১.০। ভূমিকা

১.১। স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। আর্থনীতিক ও সামাজিকভাবে উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল জীবনের পূর্বশর্ত হচ্ছে স্বাস্থ্য-সুস্বাস্থ্য । যে কোন দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন দেশটির জনগণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল । কেন ? শ্রম উৎপাদনের মৌল উপকরণ। আর শ্রমের পরিমাণ ও গুণগত মান নির্ভর করে স্বাস্থ্যের উপর। তাই, স্বাস্থ্য যেমন উন্নয়নের উৎপাদ (Output), তেমনি উন্নয়নের হাতিয়ার।

১.২। প্রশ্ন হচ্ছে, 'স্বাস্থ্য ' কি? 'স্বাস্থ্য'-এ প্রত্যয়টিকে সংকীর্ন অর্থে ও বিস্তৃত অর্থে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে বলা যায় - স্বাস্থ্য হচ্ছে রোগ ও পঙ্গুত্বজনিত পরিস্থিতির অনুপস্থিতির সাথে সাথে শারীরিক, মানসিক, আত্মিক ও সামাজিক কল্যাণ পরিপূর্ণ অবস্থা বা এ অবস্থা অর্জনের প্রক্রিয়া । সংক্ষেপে, নিম্নেবর্ণিত সমীকরণ দ্বারা স্বাস্থ্য কে সংজ্ঞায়িত করা যায় ঃ

স্বাস্থ্য = শারীরিক কল্যাণ + মানসিক কল্যাণ + আত্মিক কল্যাণ + সামাজিক কল্যাণ

শারীরিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন রোগ ও পঙ্গুত্বজনিত পরিস্থিতি; মানসিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজন মনের চাহিদা পুরণ হবার সামর্থ; আত্মিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজন মনন ও আত্মার চাহিদা পুরণ এবং সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সমাজে অন্যান্যদের সাথে সমভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা বিধান করা ।

১.৩। স্বাস্থ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া কি? স্বাস্থ্য উপকরণ (অর্থ ও ওষুধ) স্বাস্থ্য-প্রযুক্তির উপাদানের সাহায্যে (এক্সরে, ইসিজি, আলট্রাসনো ইত্যাদি (Hardware); হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র(Orgaware) ; ডাক্তার, নার্স.মেডিকেল সহকারী, ফার্মাসিষ্ট ইত্যাদি(Humanware)এবং পাঠ্যসুচী ও গবেষণা(Infoware) স্বাস্থ্য উৎপাদন করে(চিত্র ১)। স্বাস্থ্য উৎপাদনের জন্য সম্পদ যেমন প্রয়োজন,একইভাবে প্রয়োজন স্বাস্থ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন উৎপাদনের মধ্যে পারস্পারিক আন্তঃক্রিয়া ।[৪০]

---

40 ১। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৮ শতকের শেষ ভাগে বাংলাদেশে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার সূচনা করে। প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রচলন ছিল। ১৩ শতক থেকে ইউনানী ও হেকিমি চিকিৎস্যার প্রসার লাভ করে।

চিত্র ১

স্বাস্থ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া

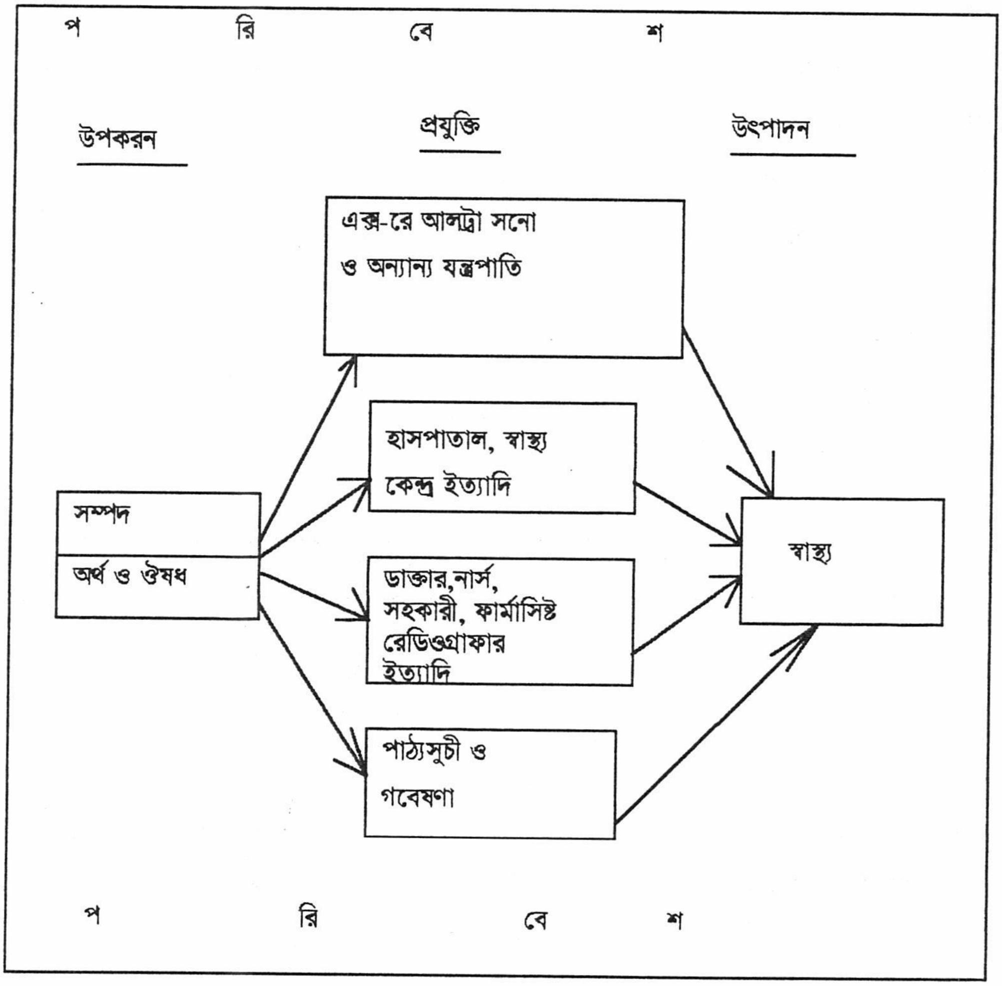

১.৪। চিত্র ১-এ এটাও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, স্বাস্থ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাম্বিত হয়। কি ভাবে?(চিন্তা করুন)

১.৫। তা'হলে 'স্বাস্থ্য নীতি' কাকে বলে ? 'স্বাস্থ্য নীতি' হচ্ছে দেশের জনগণের স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য সরকার প্রণীত কর্মপন্থা । বাংলাদেশে সামগ্রিক স্বাস্থ্য নীতি অনুপস্থিত। এখানে যা' আছে তা' হচ্ছে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বিধৃত স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিকল্পনা ও কৌশল এবং এ সংক্রান্ত একটি সাংবিধানিক নীতিমালা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে-কেন আমরা 'ঔষধ নীতি'র মত সর্বজন স্বীকৃত স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করতে পারিনি ?

২.০। সাংবিধানিক নীতিমালা

২.১। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের জন্য-

ক। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা;

খ। কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের অধিকার নিশ্চিত করা ;

গ। সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার,অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত অবস্থার কারণে অভাবগ্রস্থদের সাহায্য করা এবং

ঘ। পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করা ।

-(বাংলাদেশ সংবিধান, অনু ১৫ ও ১৮)

২.২। সীমিত সম্পদ ও জনসংখ্যার আধিক্যহেতু উপর্যুক্ত সাংবিধানিক অঙ্গীকার দ্রুত পুরণ করা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে- স্বাস্থ্য খাত কি মোট সরকারী বিনিয়োগের যথাযথ অংশীদারিত্ব পাচ্ছে ? স্বাস্থ্য খাতের কোন কোন অংশে সরকারের কতটা ভূমিকা থাকা প্রয়োজন ? এ ক্ষেত্রে ব্যাক্তি খাতে কি এবং কতটুক ভূমিকা থাকা প্রয়োজন? এনজিও-রা বা কি ভূমিকা রাখতে পারে?

৩.০। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য কাঠামো

৩.১। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য কাঠামো কে চারটি স্তরে ভাগ করা যায়ঃ (ক) প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্য সেবা (ওয়ার্ড থেকে থানা পর্যন্ত), (খ) দ্বিতীয় স্তরের স্বাস্থ্য সেবা (জেলা পর্যায়ে ৫০থেকে ২৫০ পর্যন্ত শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল), (গ) তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্য সেবা (মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল) এবং (ঘ) বিশেষ ধরণের স্বাস্থ্য সেবা (IPGMR) এবং অন্যান্য বিশেষ ধরণের স্বাস্থ্য সেবা)। এ ক্ষেত্রে কৌশলগত প্রশ্ন হচ্ছে - প্রতি স্তরে কিভাবে দক্ষতা বাড়ানো যায়? বিভিন্ন স্তারের মধ্যে রেভার্য়াল (referral) ব্যবস্থা চালু করে স্বাস্থ্য সেবা সর্বোচ্ছকরণ করা যায়?

৩.২। বর্তমানের স্বাস্থ্য খাতের জন ব্যবস্থাপনা দু'ভাগে বিভক্ত ঃ স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ । স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যে বিভাজন সেটিকে উপজেলা পর্যায়ে এক সময় একীভূত ও সমন্বিত করা হয়েছিল । কি জন্যে ? এর উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছিল? স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের এই দ্বিধা বিভক্তি সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে? না কমিয়েছে?

৪.০। রোগ চিকিৎসার প্যাটার্ন

৪.১। বর্তমানে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা কতটুকু জনগণের কাছে পৌছিয়েছে? ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক জরীপ মতে বাংলাদেশে প্রায় শতকরা ৬৭ ভাগ লোক আধুনিক চিকিৎসার বাইরে রয়েছে।

৪.২। সারণী ১ থেকে দেখা যায়- মাত্র ৩২.৯% জন যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা পাচ্ছেন । এর মধ্যে মাত্র ২১.৪% জন সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা পাচ্ছেন । এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার বাইরে থাকছেন ৪৪% জন।

সারণী ১

১৯৮৪ তে মারা গেছেন, তাঁরা মৃত্যুর এক মাস পূর্বে যে ধরণের চিকিৎসা নিয়েছিলেন

চিকিৎসাবিহীন	২৫.০%		
টোটকা/আধ্যাত্মিক চিকিৎসা			
হোমিওপ্যাথি/কবি-রাজী/হাকিমী	৬.০%		
এ্যালোপ্যাথি	১৩.০%		
	৫৬.০%		
		যোগ্যতা সম্পন্ন	৩২.৯%
		যোগ্যতা বিহীন	২৩.১%
			৫৬.০%
		সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র	২১.৪%
		ব্যক্তিগত ব্যবসায়	১১.৫%
			৩২.৯%
মোট	১০০%		

উৎস ঃ খান, এম, আর ও অন্যান্য Evalution of primary Health Care and Family planing Facilities and Their Limitations: Specially in the Rural Areas of Bangladesh, BIDS, mineographed, October, ১৯৮৫.

৪.৩। সাম্প্রতিককালে এ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায়। তবে, প্রশ্ন এসে যায়- কোন ধরণের চিকিৎসা জনগণের প্রয়োজন ? এবং এটা কিভাবে কম খরচে জনগণের কাছে পৌছেয়ে দে'য়া যায় ? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমেই দেখতে হবে- কি ধরণের রোগে বিশেষ করে আমাদের গ্রামীণ লোকজন ভুগছে।

৫.০। **রোগের কারণ**

৫.১। বাংলাদেশে, বিশেষ করে, গ্রামীণ এলাকায় সংক্রামক জাতীয় রোগ সহজেই বিস্তার লাভ করে । সংক্রামক ব্যাধির কারণে বাংলাদেশে মৃত্যু ও অসুস্থতার (morbidity) হার অনেক বেশী । ষাটের দশকে মোট অসুস্থতার ৫০% ছিল পেট পীড়া জনিত সমস্যা (gastro-intestinal disorder)-যেমন, উদারাময়, আমাশা, জ্বর ও কলেরা । উন্নত পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নাতা এবং বিশুদ্ধ পানির অভাব রোগের উৎপত্তির মূল কারণ ছিলো । স্বাধীনতার পর এ পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে ।

৫.২। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্পাদিত গবেষণায় দেখা যায়-বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় আনুপাতিক হারে বেশী লোক মারা যাচ্ছে পেটের পীড়া ও উদারময়ে (১৪.৫%), প্রতিশেধক টীকার নিয়ন্ত্রণাধীন রোগ সমূহে

(১৩.৬%), নিউমোনিয়া ঠান্ডা ও বিভিন্ন ধরণের জ্বরে (১৭.৫%), পক্ষাঘাত, রক্তচাপ ও হৃদরোগে (১১.৯%), বার্ধক্যজনিত রোগে (১৪.৪%) এবং অনাসক্ত রোগে (৮.৯%)।

সারণী ২

গ্রামীণ এলাকায় প্রধান রোগসমূহের মধ্যে মৃত্যুর আনুপাতিক হার

রোগ	মৃত্যুর % হার
পেটেরপীড়া ও উদারময়	১৪.৫
প্রতিশেধক টিকার নিয়ন্ত্রণাধীন	১৩.৬
নিমোনিয়া, ঠান্ডা ও বিভিন্ন ধরণের	১৭.৯
পক্ষাঘাত, রক্তচাপ এবং হৃদরোগ	১১.৯
শ্বাস-প্রশ্বাস সমস্যা	০৪.৩
বার্ধক্যজনিত	১৪.৪
অনাসক্ত	০৮.৯
অন্যান্য	১৪.৫
মোট	১০০

উৎসঃ BIDS, Bangladesh Health Finance and Expenditure study, Dhaka, July '88, P. ১৮৩.

৫.৩। উপর্যুক্ত তথ্য থেকে এটা প্রতিয়মাণ হয় যে, বাংলাদেশে নিরাময় স্বাস্থ্য সেবার (curative care) চেয়ে নিরোধমুলক সেবা (preventive care) ও উদ্দীপনামূলক সেবার (promotive care) উপর অধিকতর যোর দেযা বাঞ্ছনীয়।

৬.০। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ঃ তুলনামূলক চিত্র

৬.১। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার সমস্যাগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করার জন্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির কিছু মৌল সুচক/চলকের সাথে এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনীয় চিত্র দেখা যেতে পারে। সারণী ৩-এ ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত, এ ২০ বছরে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং একই সাথে সার্কভূক্ত কয়েকটি দেশ-যেমন, নেপাল,পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির সাথে বাংলাদেশের পরিস্থিতির তুলনামূলক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬.২। দেখা যায় যে উক্ত সময়ে বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। এবং ১৯৮৫ সালের দৈনিক মাথা পিছু ক্যালরীর পরিমাণ (১৯২৫) নুন্যতম দৈনিক মাথা পিছু ক্যালরী সুচকের (২২০০) চেয়ে কম। তবে, জনসংখ্যা-ডাক্তার ও শিশু মৃত্যুর হারের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে । এটা অনস্বীকার্য যে, পুষ্টি নীতি ও দারিদ্র বিমোচন নীতি এবং স্বাস্থ্য নীতিত বাংলাদেশে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছে। এর যে কোন একটি বিষয়ে নীতি প্রণয়ন কালে নীতি নির্ধারকদের এ সম্পর্কটি স্বরণ রাখা আবশ্যক।

৬.৩। অন্যান্য দেশের বিবেচনায় দেখা যায় - ১৯৮৫ সনের জনসংখ্যা -ডাক্তার অনুপাতটি (৬.৭৩০ঃ১) নিতান্তই অপর্যাপ্ততার আর অপ্রতুলতার স্বাক্ষর (নেপাল বাদে)। যেখানে ভারতে এটি ২,৫২০ঃ১ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৪৭০ঃ১

সারণী ৩

কয়েকটি দেশের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির তুলনামূলক চিত্র

দেশ	জনসংখ্যা প্রতি ডাক্তার		নার্স		শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মের)			মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরীর হার	
	১৯৬৫	১৯৮৪	১৯৬৫	১৯৮৪	১৯৬৫	১৯৮৪	১৯৯০	১৯৬৫	১৯৮৪
বাংলাদেশ	৮১০০	৬৭৩০	-	৮৯৮০	১৪৪	১২৬	১০৫	১৯৮৪	১৯২৫
নেপাল	৪৬১৮০	৩০২২০	৮৭৬৫০	৪৬৮০	১৭১	১২৪	১২১	১৮৮৭	২০৭৮
ভারত	৪৮৮০	২৫২০	৬৫০০	১৭০০	১৫০	৯৫	৯২	২১০৩	২১০৪
পাকিস্তান	-	২৯১০	৯৯১০	৪৯০০	১৪৯	১২৬	১০৩	১৭৯৭	২২০০
শ্রীলঙ্কা	৫৮২০	৫৫২০	৩২২০	১২৯০	৬৩	২০	১৯	২১৬৪	২৩১৯
যুক্তরাষ্ট্র	৬৭০	৪৭০	৩১০	৭০	২৫	১০	-	৩২৩৬	৩৬৬৬

উৎসঃ **World Development Report , 1993, World Bank, Oxford University Press ।**

৬.৪। লক্ষ্যণীয়, অন্যান্য দেশের তুলনায় জনসংখ্যা-ডাক্তার অনুপাতে বাংলাদেশ যতটা পিছিয়ে আছে, তার চেয়ে বেশী পিছিয়ে আছে জনসংখ্যা-নার্স অনুপাতে। অর্থাৎ বাংলাদেশে আরো ডাক্তারের চেয়ে আরো অধিক নার্সের প্রয়োজন অধিক। দেখা যায় - বাংলাদেশে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ডাক্তারদের প্রভাব থাকায় তারা তাদের সুযোগ-সুবিধা যেভাবে আদায় করে নিচ্ছে, স্বাস্থ্য সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবিরা (নার্স, স্বাস্থ্য সহকারী, মেডিকেল সহকারী, ইত্যাদি) সেভাবে পারছে না।

৬.৫। শ্রীলঙ্কা একটি অনুন্নত দেশ হয়েও জনসংখ্যা-নার্স অনুপাতে , শিশু মৃত্যুর হার এবং মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরীর পরিমাপের ভিত্তিতে প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি অবস্থান করছে। কিভাবে এটা সম্ভব ?

৭.০। পরিকল্পনা ও জাতীয় স্বাস্থ্য লক্ষ্য

৭.১। ১৯৭৮ সালে আলমা আতা সম্মেলনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিকল্পনায়'২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য স্বাস্থ্য' অর্জন মুখ্য লক্ষ্য হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে। এবং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাকে (Primary Health Care) প্রধান কৌশল হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

৭.২। 'বিংশ শতাব্দির মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য'-এ লক্ষ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩য় পবাপ (১৯৮৫-৯০) ও ৪র্থ পবাপতে (১৯৯১-৯৫) যে সব কর্মসূচী নে'য়া হয়, সেগুলো মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ ঃ

ক। জনগণের, বিশেষ করে মাতা ও শিশুদের স্বাস্থ্য হাল (Health Status) ও পুষ্টি হালের (Nutritional Status) উন্নয়ন;

খ। স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার (Health Care Delivery System) সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়ন;

অ. বিদ্যমান প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা (Primary Health Care) কার্যক্রম এবং এ সংক্রান্ত অনুষংগীক পদ্ধতি জোরদার করা ও সমন্বয় করা;

আ. প্রধান প্রধান সংক্রামক ব্যাধিসমূহ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;

গ। জরুরী ঔষধ , টীকা ও অন্যান্য রোগ নির্ণায়ক এবং রোগ চিকিৎসার উপকরণসমূহের উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণ জোরদার করা;

ঘ। উপযুক্ত স্বাস্থ্য জনশক্তির (Health Manpower) উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা ; এবং

ঙ। জৈব চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা গবেষণার জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং এর উন্নয়ন সাধন ।

৭.৩। প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এসে যায় - অতীতে এসব কর্মসূচী কতটা সফল হয়েছে ? এবং ৪র্থ পবাপ'র ফলে এসব কর্মসূচীর সফলতা লাভ করেছে কতটুকু ? শীঘ্রই ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঘোষিত হতে যাচ্ছে। এতে স্বাস্থ্য খাতের জন্য কি নতুন দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে?

৮.০। স্বাস্থ্য খাতের মূল্যায়ন

৮.১। কোন দেশের স্বাস্থ্য খাত বিশ্লেষণ করতে গেলে মোটামুটিভাবে স্বাস্থ্যের তিনটি মাত্রার দিকে খেয়াল দিতে হবে।এ তিনটি মাত্রা হচ্ছে- (ক) দেশের বর্তমান স্বাস্থ্য হাল (Health Status), (খ) স্বাস্থ্য প্রযুক্তি (Health Technology) এবং স্বাস্থ্য উপকরণ (Health Input) (চিত্র ১ দেখুন)।

ক। স্বাস্থ্য হাল

৮.২। এ ধারণাটিকে বেশ কিছু চলক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। সারণী ৪ক-তে এ ধরণের ৩টি চলকের (শিশু মৃত্যুর হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং জন্মে জীবন প্রত্যাশার বিবর্তন দেখানো হয়েছে ।

সারণী ৪ক

স্বাস্থ্য সূচক ঃ বিভিন্ন স্বাস্থ্য হালের (Health Status) অভিষ্ঠ ও অর্জন

সূচক/চলক	একক	১৯৭৯/৮০ ভিত্তি বছর	১৯৮৪/৮৫ অভীষ্ঠ (অর্জন)	১৯৮৯/৯০ অভীষ্ঠ (অর্জন)	অভীষ্ঠ ৯৪/৯৫	৯৯/
১। শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি ১০০০ জীবন্ত প্রসবের	১৪০	১০০ (১২৫)	১০০ (১১০)	৮০	৫০
২। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	প্রতি বছর	২.৬৫	১.৭৪ (২.৪০)	১.৮০ (২.১৬)	১.৮	১.০০
৩। জন্মে জীবন প্রত্যাশা	বছর	৪৭	৫২ (৬০)	৫৪ (৫৩)	৫৫	৬৫

উৎসঃ পরিকল্পনা দলিলাদি ও এম,আর,খান, Health Care Strategy for Third FiveYear Plan, Bangladesh Journal of Political Economy, Vol 7.IB|

৮.৩। লক্ষ্যণীয় যে এ ৩টা চলকের ভিত্তিতেই বলা যায় স্বাস্থ্য হালের উন্নতি হচ্ছে। তবে ,কোন কোন ক্ষেত্রেই ২য় ও ৩য় পরাপ তাদের অভীষ্ঠ অর্জন করতে পারেনি (সারণী-৪) । তা'হলে কি করে সবার কাছে ২০০০ সাল নাগাদ স্বাস্থ্য পৌছিয়ে দে'য়া যাবে ?

খ। স্বাস্থ্য প্রযুক্তি

৮.৪। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে,স্বাস্থ্য প্রযুক্তির চারটি মাত্রা আছে - (ক) স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিবেশনাতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, (খ) স্বাস্থ্য সংগঠনসমূহ, (গ) স্বাস্থ্য জনশক্তি এবং (ঘ) স্বাস্থ্য পাঠ্যসূচী ও গবেষণা (অনুচ্ছেদ ১.৩ ও চিত্র ১)। প্রযুক্তির এই চারটি উপাদানই বিভিন্ন সূচক/চলক দ্বারা প্রকাশ করা যায় ।

৮.৫। প্রথমেই প্রশ্ন করা যাক বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজের পাঠ্যসূচী সমূহ কি দেশোপযোগী ? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মধ্যে দেখা যায়- মোট ৫৩৫ টি প্রশ্নের মধ্যে মাত্র ১২০ টি প্রশ্ন রয়েছে আমাদের দেশীয় রোগ থেকে অর্থৎ শতকরা ২২.৪ শতাংশ মাত্র।

৮.৬। স্বাস্থ্য-সংগঠন (Health Organization) ও তাদের স্বাস্থ্য পরিবেশনার (Health Care Delivery) ৪খ-তে দেখা যেতে পারে । এটা ঠিক যে, দু'টি ক্ষেত্রেই ধীরে ধীরে উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে ।

সারণী ৪ খ

স্বাস্থ্য সূচক ঃ বিভিন্ন পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিবেশনের

(Health Care Delivery) অভীষ্ঠ ও অর্জন

সূচক/চলক	একক	১৯৭৯/৮০ ভিত্তি বছর	১৯৮৪/৮৫ অভীষ্ঠ (অর্জন)	১৯৮৯/৯০ অভীষ্ঠ অর্জন	অভীষ্ঠ ৯৪/৯৫	অভীষ্ঠ ৯৯/০০
১। হাসপাতাল শয্যা	ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা	২০,৫০০ (২১,১৪১)	৩৩,০০০ (২৭,৬৩৭)	৪০,৭৩৪ (৩৪,৪৮৮)	৩৬,৪৮৮	৬০,০০০
২। উপজেলা স্বাস্থ্য ১টি কমপ্লেক্স	প্রতি উপজেলায় (চালুকৃত)	২৯০ (৩৪১)	৩৯৭ (৩৫৯)	৩৯৭	৩৯৭	৩৯৭
৩। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	প্রতি ইউনিয়নে ১টি (চালুকৃত)	(১,৭৭৩) (১,৭৭৩)	(২,৩২৯) (২,৩২৯)	(৩,৩৭৫) (৩,৩৭৫)	৪,৩২৫	৪,৫০০
৪। ডাইরিয়া নিয়ন্ত্রণ	শুজবা-এর % অন্তর্ভুক্তি	৫	৯০ (৫০)	৯০ (৫০)	৯০	১০০
৫। পুষ্টিসেবাদি	অপুষ্টিতে আক্রান্ত জনসংখ্যায়	৫ (৪)	২৫ (৫)	৩০ (৫০)	৬০	৯০
৬। PHC-এর আওতাধীন জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা	- (২৫)	- (৩০)	৬৫ (৫০)	৮০	-

উৎস ঃ পরিকল্পনা দলিলাদি ও এম,আর,খান, Health Care Strategy for Third FiveYear Plan, Bangladesh Journal of Political Economy, Vol 7.IB|

তবে, ২য় ও ৩য় পবাপ কোনটিই তার অভীষ্ঠ অর্জন করতে পারেনি ।

৮.৭। সারণী ৪গ-তে বিভিন্ন পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য জনশক্তির অভীষ্ঠ ও অর্জন দেখানো হয়েছে ।

সারণী ৪গ

স্বাস্থ্য সূচক ঃ বিভিন্ন পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য জনশক্তির (Health Manpower) অভীষ্ঠ ও অর্জন

সূচক/চলক	একক	১৯৭৯/৮০ ভিত্তি বছর	১৯৮৪/৮৫ অভীষ্ঠ (অর্জন)	১৯৮৯/৯০ অভীষ্ঠ অর্জন	অভীষ্ঠ ৯৪/৯৫	অভীষ্ঠ ৯৯/০০
১। স্নাতক ডাক্তার	ক্রমপুঞ্জিত	১১,০০০	১৭,০০০	২২,৫০০	২৫,৬০০	৪০,০০০
		(১১,০০০)	(১৬,০০০)	(২০,৫৪০)		
২। শয্যা নার্স/ধাত্রী	ঐ	২,৭০০	৯,৪৬৫	১০,২০০	১১,৩৫০	৩০,৫০০
			(৬,৫০০)	(৯,১০০)		
৩। মেডিকেল/সহকারী	ঐ	৪৫০	৫,৫০০	৪,৬০০	৪,৭০০	২৯.০০০
			(৩,৬০০)	(৪,৩৪৮)		

উৎস ঃ পরিকল্পনা দলিলাদি ও এম,আর,খান, Health Care Strategy for Third FiveYear Plan, Bangladesh Journal of Political Economy, Vol 7.IB ।

ধীরে ধীরে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে, তা' প্রতি ক্ষেত্রেই অভীষ্ঠের চেয়ে পিছিয়ে। ডাক্তার- নার্স অনুপাত ২:১ রয়েই গেছে।

গ। **আর্থিক সম্পদ বরাদ্দের গতি-প্রকৃতি**

৮.৮। সারণী ৫ থেকে দেখা যায় যে স্বাস্থ্য খাতে মোট আর্থিক বরাদ্দ (রাজস্ব + উন্নয়ন) এউচ-র অংশ হিসাবে ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। এবং এটি এউচ-র ১ শতাংশও কোন সময় অতিক্রম করেনি। এমনকি ১৯৮৬-৮৭তে এটি ০.৬০ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে । উন্নত বিশ্বে সাধারণতঃ এউচ-র ৪ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ করা হয় ।

সারণী ৫ঃ বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে মোট খরচের গতি প্রকৃতি

চলতি কোটি টাকায়

সাল	স্বাস্থ্য খাতে* মোট খরচ (প্রাক্কলিত)	এউচ (বাজার দামে)	মোট জনসংখ্যা (কোটিতে)	স্বাস্থ্য খরচ এউচ-র % হিসাবে	মাথাপিছু স্বাস্থ্য খরচ
১৯৮০-৮১	১৯১.৪	২৩৩২৬.৩	৯	০.৮২	২১.২৭
১৯৮১-৮২	২০২.৪	২৬৫১৪.৪৯.২		০.৭৬	২২.৮০
১৯৮২-৮৩	২৫০.৩	২৮৮৪২.৩	৯.৩	০.৮৬	২৬.৩৫
১৯৮৩-৮৪	২৮৪.৪	৩৪৯৯২.২৯.৮	০.৮১	২৯.০২	
১৯৮৪-৮৫	৩৫৩.৭	৪১৭০২.১ ১০.১	০.৮৫	৩৫.০২	
১৯৮৫-৮৬	৩০৬.২	৪৬৫১৯.৩১০.০	০.৬৬	২৯.৪৩	
১৯৮৬-৮৭	৩২৭.১	৫৪১১৬.৪ ১০.৬	০.৬০	৩০.৮৬	

উৎস ঃ World Bank , Bangladesh Managing The Adjustment Process : An Appraisala, March ১৬, ১৯৯০ এবং World Tables, ১৯৮৯

* স্বাস্থ্য খাতের মোট খরচের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা কল্যাণ খাতের রাজস্ব ও উন্নয়ন খরচকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তবে রাজস্ব খাতের খরচটি প্রকৃত খরচ এবং উন্নয়ন বাজেটের খরচটি প্রাক্কলিত।

৮.৯। মাথাপিছু বরাদ্দ ১৯৮০-৮১ সালে ছিলো ২১.২৭ টাকা এবং ১৯৮৬-৮৭তে এটি হয়েছে ৩০.৮৬ টাকা(চলতি)। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মাথাপিছু বরাদ্দ ১ ডলারেরও কম এবং এটিও কমেছে।

৮.১০। সারণী ৬ থেকে দেখা যায় - যখন স্বাস্থ্য খাতে আনুপাতিক বরাদ্দ কমছে, অগ্রাধিকার কম পাচ্ছে, তখন প্রতিরক্ষা খাতে তুলনামূলক বরাদ্দ বেড়েছে। ১৯৮০-৮১ -তে যখন স্বাস্থ্য খাতে ১ টাকা খরচ হলে প্রতিরক্ষা খাতে ৩.০৬ টাকা খরচ করা হয়েছে। ১৯৮৬-৮৭ তে স্বাস্থ্য খাতে ১ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে প্রতিরক্ষা খাতে ৬.২৭ টাকা বরাদ্দ ও খরচ করা হয়েছে। দেশের রাজনীতির দায়বদ্ধহীনতা এবং সামগ্রিক প্রশাসনের জবাবদিহিহীনতারই পরিচায়ক এটি।

সারণী ৬

প্রতিরক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে রাজস্ব ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

	প্রকৃত বাজেট বরাদ্দ (চলতি কোটি টাকায়)		প্রতিরক্ষা স্বাস্থ্য অনুপাত
সাল	প্রতিরক্ষা	স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা	
১৯৮০-৮১	২৫৬.১	৮৩.৬	৩.০৬
১৯৮১-৮২	৩২২.৪	৯৩.২	৩.৪৬
১৯৮২-৮৩	৪৭৮.৬	১০৫.২	৪.৫৬
১৯৮৩-৮৪	৫১১.০	১২৭.৯	৪.০০
১৯৮৪-৮৫	৫৭০.৮	১৫৯.৩	২.৫৮
১৯৮৫-৮৬	৬৬৮.৮	১৫২.০	৪.৪০
১৯৮৬-৮৭	৯৩৩.৭	১৪৯.০	৬.২৭

উৎসঃ Bangladesh Managing the Adjustment, World Bank, Process-An Appraisal, Mach ১৬, ১৯৯০.

৮.১১। সরকারের গণতান্ত্রিক চেতনা কি দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে (সারনী ৭) ?

সারণী ৭

স্বাস্থ্য খাতে লোক ব্যয়

		আর্থিক বছর '৮৬	আর্থিক বছর '৯৩
ক.	স্বাস্থ্য খাতের অংশ		
	(১) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে	১.৮	৩.২
	(২) রাজস্ব বাজেটে	২.৬	৪.৯
খ.	জনসংখ্যা খাতের অংশ		
	(১) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে	৩.১	৪.২
	(২) রাজস্ব বাজেটে	০.৩	০.৪
গ.	প্রাথমিক স্বাস্থ্য খাতের অংশ		
	(১) স্বাস্থ্য খাতের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে	৬৪.০	৫১.০
	(২) স্বাস্থ্য খাতের রাজস্ব বাজেটে	১০.০	৪৯.০

উৎস ঃ World Bank, Bangladesh Implementing Structural Reform, 1993

উপর্যুক্ত সারণী হতে এটা স্পষ্ট যে, কিছুটা হলেও সার্বিক গণতন্ত্রের উন্নতি দেশের সম্পদ বরাদ্দের চাহিদা পাল্টিয়ে দেয় এবং তা অধিক জনগণমুখী হতে পারে।

৯.০। উপসংহার ঃ স্বাস্থ্য খাতের বিবেচ্য বিষয়

৯.১। এ পর্যন্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে - বিদ্যমান স্বাস্থ্য খাতের সমস্যাগুলো মোকাবেলার নিমিত্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কৌশল গ্রহণ/উদ্ভাবন আবশ্যক ঃ

অ। মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কার্যকর সমন্বয় সাধন করা;

আ। স্বাস্থ্য খাতে সম্পদ আহরণ ব্যবস্থা সৃষ্টি/উন্নয়ন করা এবং যথাযথ সম্পদ বরাদ্দ করা;

ই। স্বাস্থ্য খাতে সরকার, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের মধ্যে সামাজিকভাবে স্বীকৃত সীমারেখা নির্ধারণ করা;

ঈ। প্রাপ্ত সম্পদ ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;

উ। বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার শহর ও ধনী অভিমুখী ঝোঁক কমিয়ে আনা;

ঊ। চিকিৎসা পাঠ্যসূচীকে দেশোপযোগী করা ও গবেষণার নতুন নতুন দিক উন্মীলন করে গবেষণার ফলাফলকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে প্রয়োগ করা ;

ঋ। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রিকতা কমিয়ে আনা

৯.২। ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য স্বাস্থ্য কি নিশ্চিত করা যাবে? প্রশ্নটির নেতিবাচক উত্তর হ'য়াই স্বাভাবিক। যতদিন না আর্থনীতিক উন্নয়ন ঘটছে, সম্পদের সীমাবদ্ধতা থেকেই যাবে। তবে, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদের সীমাবদ্ধতার চেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে- আমরা কি স্বাস্থ্য খাতে প্রাপ্ত সম্পদ ও প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বোত্তম করতে পারছি। যদি না পারি তা'হলে কি বর্তমানে অনুসৃত নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে জনগণের কল্যাণ কিছুটা হলে বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়? সামগ্রিক প্রশাসনসহ স্বাস্থ্য খাতকে কি জনগণের কাছে জবাবদিহি ও দায়বদ্ধ করা উচিৎ নয় ?

গ্রন্থপঞ্জী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ১৯৭৩-১৯৯০ । বিভিন্ন পরিকল্পনা দলিল, পরিকল্পনা কমিশন।

হোসেন, কাজী জাহিদ । ১৩১৭। চীন-বাংলাদেশে স্বাস্থ্য পরিস্থিতি-একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ৮ম খন্ড ।

মোদক, সুমন। ১৯৮৭। ২০০০ সালে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' বাস্তবায়িত হবে কি? বাংলাদেশের চিকিৎসা চিত্র, সাপ্তাহিক রোববার।

Khan.M.R.etal 1985. Evaluation of Primary Health Care and Family Planning Facilities and Their Limitation in the Rural Areas of Bangladesh, BIDS(Mimio).

Khan, M.R. 1988. Health Care Strategy for the Third Five Year Plan (1985-90).

Economy, Bangladesh Economic Association, Vol.7, No. 1B.

World Bank, 1981. World Tables.

World Bank. 1990. Bangladesh Managing the Adjustment Process: An Appraisal

World Bank. 1991. World Development Report 1991.

World Bank. 1995. World Development Report 1993.

বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য নীতি

ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফরিদ
সচিব

সুচনা

সংজ্ঞা ঃ আমদানী + রপ্তানী নীতি, কেবল Merchandise বা পণ্য সংশ্লিষ্ট, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাণিজ্যনীতি উন্নয়ন নীতির অংশ-তাই আর্থিক বাজেট এবং উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) এর সাথে বাণিজ্যিকনীতি, বাংলাদেশের বাণিজ্যিনীতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব - চতুর্থ দ্বি-বার্ষিক বাণিজ্যনীতি (১৯৯৫-৯৭) সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে ।

আমদানী নীতি

খাদ্য, প্রতিরক্ষা এবং প্রকল্প সাহায্য আমদানী নীতির আওতা বহির্ভূত, এর কলেবর দেশের সার্বিক আমদানীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ ।

চার প্রকার আমদানী কারক

ক) বাণিজ্যিক খ) টিসিবি গ) শিল্প (সরকারী ও বেসরকারী) ঘ) ওয়েজআর্নার্স ।

তিন প্রকার আমদানী পণ্য তালিকা-নিষিদ্ধ, শর্তযুক্ত ও অবাধ ।

আমদানী নীতি ১৯৯৫-৯৭ এর লক্ষ্য

১. নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
২. উৎপাদনমুখী শিল্প খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ;
৩. কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানা স্থাপন;
৪. রপ্তানী মুখী শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান ;
৫. আধুনিক প্রযুক্তির অধিগ্রহণ ;
৬. ক্ষুদ্র আমদানীকারক ও আমদানী বাণিজ্যে নবাগতদের সুযোগ প্রদান;
৭. জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ আমদানী বিধিমালার পদ্ধতিগত সহজীকরণ ।

সার্বিক আমদানী পরিসংখ্যান (মিলিয়ন ডলার)ঃ

	৮৬-৮৭	৮৭-৮৮	৮৮-৮৯	৮৯-৯০	৯০-৯১	৯১-৯২	৯২-৯৩	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫	হিস্যা	৯৫-৯৬ (সাময়িক)
খাদ্য (চাল ও গম)	২৭২	৪৮৯	৩৭৪	৩৪৩	২৯৭	২৬৫	১৮৯	১৫১	৪৭৬	৮%	৬৫০
ভোজ্য তেল	৭৫	৯১	১০৯	১২৬	১৬৯	১৭২	১৮৫	১১৭	২২০	৪%	১৯১
প্রেট্রোল ও প্রেট্রোল জাত দ্রব্য	২০১	২০০	২৫৬	২৯৭	৩৪৮	২৯১	৩৫৪	২৮৫	৩৮৩	৭%	৪২০
তুলা	২৭	৫১	৪৯	৮৭	৬৮	৭১	৮২	৭২	১৩৫	২%	১৯১
সুতা	৩৮	৩৫	৩৭	৫৪	৭৪	১১১	১৭৩	১৬৮	২০০	৩%	২৭৬
রাসায়নিক দ্রব্য	১৬২	২১৩	২৩৬	৩০৫	১৯১	২০৬	২০১	২৭৯	২৯৭	৫%	২৯০
সিমেন্ট	৫৮	৪৮	৬০	৯৮	৭৫	৭৭	১০০	১০০	১১৬	২%	১৬৪
মুলধনী যন্ত্রপাতি	১০০৩	৮৫৬	১০৯০	১২৯৬	১২৩১	১২৮৯	১৪৩৩	১২৯৯	১৬৮৮	২৯%	১৭৯০
কাপড়	১৭২	২২৯	২৬১	৩৪২	৩৯২	৫১২	৬৬৮	৮৪১	১০২৫	১৮%	১১০০
অন্যান্য	৬১২	৭৭৫	৯০৪	৮১১	৬২৫	৪৬৯	৫১৯	৮৯৭	১২৯৪	২২%	১৭৫৫
মোট	২৬২০	২৯৮৭	৩৩৭৬	৩৭৫৯	৩৪৭০	৩৪৬৩	৩৯০৪	৪২০৯	৫৮৩৪	১০০%	৬৮২৭

রপ্তানী নীতি ১৯৯৫-৯৭

লক্ষ্য

১. রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে আয় ও আমদানী ব্যয়ের ব্যবধান ক্রমান্বয়ে সংকোচন ;

২. বহুমুখীকরণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানী পণ্যকে অধিকতর বাজার উপযোগীকরণ ;

৩. অধিকতর দেশীয় উপাদান সংযোজনের লক্ষ্যে রপ্তানীমুখী শিল্পের সাথে পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প ও সেবা সমূহের সংযোগ স্থাপন ;

৪. উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী উদ্যোক্তাগণকে আকৃষ্টকরণ ;

৫. বর্হিবিশ্বের প্রতিযোগিতামুলক বাজারে বাংলাদেশী রপ্তানী পণ্যের বাজারজাতকরণের সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা প্রদান;

৬. রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণ, সুসংহতকরণ এবং নতুন বাজার সৃষ্টি ;

৭. মুক্ত বাজার অর্থনীতির আলোকে রপ্তানী উন্নয়ন কল্পে কলা কৌশল প্রণয়ন ও উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করণ ;

৮. রপ্তানী সম্প্রসারণে বেসরকারী খাতকে অধিকমাত্রায় সম্পৃক্তকরণ ।

রপ্তানী উৎসাহদান পদ্ধতিসমূহ

ক) নতুন সুযোগ সুবিধা

১. ৮০% রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ১০০% রপ্তানীমুখী শিল্প ঘোষণা;

২. সফটওয়ার রপ্তানীর জন্য পৃথক লাইন প্রবর্তন;

৩. ক্রাষ্ট চামড়া রপ্তানী ক্রমান্বয়ে নিরুৎসাহিতকরণ এবং ১৯৯৭ সালের মধ্যে রপ্তানী নিষিদ্ধ করণ;

৪. ইলেকট্রোনিক্স যন্ত্রাংশসহ সকল পণ্য কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে রপ্তানীর সুযোগ প্রদান ;

৫. ১০০% রপ্তানীমুখী সকল শিল্পে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা;

৬. বাণিজ্য বিরোধ নিস্পত্তিতে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোকে ক্ষমতাদান;

৭. ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) একর পর্যন্ত কৃষিখামারকে শিল্প হিসাবে গণ্য;

৮. রপ্তানী শিল্পের প্যাকেজিং অবাধ আমদানী তালিকাভুক্ত;

৯. শুল্ক মুক্তভাবে রীফার ভ্যান আমদানী;

১০. হস্তশিল্পের জন্য কারুপল্লী স্থাপন ও জাতীয় পুরস্কার প্রদান ;

১১. অলংকার রপ্তানী উৎসাহিত করণ;

১২. ফ্যাশন ইনষ্টিটিউট স্থাপন ।

রপ্তানী পরিসংখ্যান (মিলিয়ন ডলার)

	৮৮-৮৯		৮৯-৯০		৯০-৯১		৯১-৯২		৯২-৯৩		৯৩-৯৪		৯৪-৯৫		৯৫-৯৬		৯৬-৯৭
	লক্ষ্য	প্রকৃত	লক্ষ্য	প্রকৃত	লক্ষ্য	প্রকৃত	লক্ষ্য	প্রকৃত	লক্ষ্য	প্রকৃত	লক্ষ্য	প্রকৃত	লক্ষ্য	প্রকৃত	লক্ষ্য	প্রকৃত	লক্ষ্য
কাঁচা পাট	১১৮	৮৭	৯৮	১২৫	১৪১	১০৪	১২৫	৮৫	১১০	৭৪	৮৩	৫৭	৮৩	৮৩	৭০	৯১ (২)	৮০
পাটজাত দ্রব্য	৩২৯	২৮২	৩১৪	৩৪১	৩৩৫	২৯০	৩২৭	৩০২	৩২০	২৯২	৩০০	২৮৪	৩১৫	৩১৯	৩৮০	৩২৯ (৮)	৪০০
চামড়া	২৫০	১৩৭	২৪৮	১৭৯	১৭১	১৩৪	১৮৯	১৪৪	১৮৯	১৪৮	১৭০	১৪৮	২১০	১০৭	২৫০	২১২ (৫)	২৭৫
হিমায়িত খদ্রব্য	১০৬	১৪১	১৭৩	১৪৮	১৫০	১৪২	১৮০	১৩১	১৪০	১৫৫	১৭৫	২১১	২৩০	৩০৬	২৮০	২১৪ (৮)	৪৮০
চা	৪৮	৪০	৫০	৪০	৫০	৪০	৪৯	৩২	৩৯	৪১	৪০	৩৮	৪০	৩০	২৫	৫০ (১)	৪০
তৈরী পোষাক	৫২৫	৪৭১	৫৩১	৬০৯	৭৭১	৭৩৬	৯০৭	১৪৭০	১৪৪৪	১৯০০	১৫৫৬	২৩২৬	২২৯২	২৩৮০		২৫৪৭ (৬৬)	২৭৫০
কৃষিজাত পণ্য	২৭	১৩	১৯	১০	১৪	৮	৯	৯	১২	১৩	১৮	১৪	২৪	১০	২০	২০ (১)	২৩
রাসায়নিক পণ্য	৪৫	৬৮	৬৮	২৫	৩৫	৪৮	৬৪	৩০	৫০	৫৮	৫৩	৫০	৫০	৯৫	৬০	৯৮ (৩)	৭০
বস্ত্রপণ্য	১২	১৬	১৪	১৭	১৪	৩৫	৫১	৮	২৫	৩৭	২০	১৬	২০	১৪	১৭	৫	২০
হস্তশিল্প	৪	৪	৪	৫	৬	৫	৭	৯	১২	৫	৭	৭	৯	৬	৯	৬	১১
প্রকৌশল দ্রব্য	৭	৬	৫	১২	১৫	৬	১১	৯	১০	১৮	১৫	৪	১৮	১০	৮	১৫	১০
অন্যান্য	১৩	১৭	৩১	৩৪	৩২	১৭২	২৪২	৫২	১৬	১৮	১২৫	১২৫	১৫৪	১৬০	১৯১	২১০ (৬)	২২১
	১৪০৪	১২৯২	১৪৫৫	১৫২৪	১৭৩৪	১৭১৮	২১৫১	১৯৯৪	২৫০০	২৩৮০	২৯০০	৩২০০	২৫৭০	৬৪৭০	৩৮০০	২৬৮২ (১০০)	৪০৮০

রপ্তানী প্রকৃতি পরিবর্তন (রপ্তানী আয়ের %)ঃ

	৮৩-৮৪	৮৫-৮৬	৮৯-৯০	৯০-৯১	৯১-৯২	৯২-৯৩	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬
পাট ও পাটজাত দ্রব্য	৫৯%	৫১%	২৯%	২৩%	১৯%	১৫%	১৩%	১১%	১২%
প্রচলিত পণ্য	৬৭%	৫৫%	৩২%	৩২%	২১%	১৭%	১৪%	১২%	১৩%
প্রাথমিক পণ্য	৩৫%	৩৭%	২৯%	১৮%	১৪%	১৩%	১৩%	১৩%	১৪%

ব্যালেন্স অব ট্রেড (মিলিয়ন ডলার)ঃ

সাল	রপ্তানী	আমদানী	বৈষম্য
৭২-৭৫ (গড়)	৩৫৬	১০৩৬	৬৮০
৭৫-৮০ (গড়)	৫২০	১৪৮৫	৯৬৫
৮০-৮৫ (গড়)	৭৬৩	২৪৮৪	১৭২০
৮৪-৮৫	৯৩৪	২৬৪৭	১৭১৩
৮৫-৮৬	৮১৯	২৩৭১	১৫৫২
৮৬-৮৭	১০৭৪	২৬১৪	১৫৪০
৮৭-৮৮	১২৩১	২৯৯২	১৭৬১
৮৮-৮৯	১২৯২	৩২০০	১৯০৮
৮৯-৯০	১৫২৪	৩৭৫৯	২২৩৫
৯০-৯১ প্রকৃত লক্ষ্য	১৭১৮ (১৭৩৪)	৩৪৭০ (৩৮০০)	১৭৫২
৯১-৯২ ”	১৯৯৩ (২১৩৫)	৩৪৬৩ (৩৬৫০)	১৪৭০
৯২-৯৩ ”	২৩৮৩ (২৫০০)	৩৯০৪(৪২৭৫)	১৫২১
৯৩-৯৪ ”	২৫৩৪(২৯০০)	৪১৯১ (৪৬০০)	১৬৫৭
৯৪-৯৫ ”	৩৪৭৩ (৩৫০০)	৫৮৩৪ (৪৮০০)	২৩৬১
৯৫-৯৬ ”	২৮৮২ (৪৮০০)	৬৮২৭ (৬৮০০)	২৯৪৫ (৩০০০)

উপসংহার

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক (১৯৮৫-৯০) পরিকল্পনায় রপ্তানী ও আমদানীর বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল যথাক্রমে ৪.৬% এবং ২.৮% প্রকৃত বৃদ্ধি পেয়েছে মার্কিন ডলারে বার্ষিক গড় ১৩% ও ৬% । চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক (১৯৯০-৯৫) পরিকল্পনায় রপ্তানী ও আমদানীর বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল যথাক্রমে ১১.৬% এবং ৫.১%- প্রকৃত বৃদ্ধি পেয়েছে মার্কিন ডলারে বার্ষিক গড় ২৬% এবং ১১% । ৯৪-৯৫ সনে রপ্তানী ও আমদানী প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল যথাক্রমে ৩৮% এবং ১৮% । প্রকৃত রপ্তানী ও আমদানী লক্ষ্যের তুলনায় যথাক্রমে ১% কম এবং ২২% বেশী এবং ৯৩-৯৪ সনের প্রকৃত রপ্তানী ও আমদানীর তুলনায় যথাক্রমে ৩৭% বেশী ও ৩৯% বেশী হয়েছে । ৯৫-৯৬ সনের প্রকৃত রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা ৯৪-৯৫ সনের প্রকৃত রপ্তানীর তুলনায় ৯% বেশী । বিগত (১৯৯৫-৯৬) অর্থ বৎসরের রপ্তানী আয় ৩৮৮২ মিলিয়ন ডলার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ২% এবং আমদানী ব্যয় ৬৮২৭ মিলিয়ন ডলার লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় সামান্য বেশী ।

বাংলাদেশের শিল্পনীতি

ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফরিদ
সচিব

সুচনা

শিল্পায়ন অর্থাৎ যন্ত্রপাতির সাহায্যে মুল্য সংযোজন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার। শিল্পনীতি তাই দেশের সার্বিক উন্নয়ন নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশে শিল্পনীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

শিল্পনীতির বিবর্তণ

পাকিস্তান আমলে অবাঙ্গালী শিল্পপতি -স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ঐতিহাসিক কারণে জাতীয়করণকৃত শিল্প সম্পদের ৮৫% রাষ্ট্রয়াত্ব খাতে - সমাজতান্ত্রিক শিল্পনীতি।

১৯৭৫ এ পট পরিবর্তনের পর বেসরকারী খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) শিল্প খাতে বরাদ্দের ১১% বেসরকারী খাতে, দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-৮০) বেড়ে ১৬% এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরো বেড়ে ৩৫%- তৃতীয় (১৯৮৫-৯০) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকালে সিংহভাগ (৫৫%) বেসরকারী খাতে বরাদ্দ- চতুর্থ (১৯৯০-৯৫) পরিকল্পনায় ৫১% বেসরকারী খাতে (৮৫৬০ কোটির মধ্যে ৪৩৬০ কোটি টাকা)

আরেক দিক থেকেও শিল্পনীতির দ্রুত পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা যায় - বেসরকারী খাতে শিল্পে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা ১৫ লক্ষ টাকা (৭ফেব্রুয়ারী'৭২) থেকে ২৫ লক্ষ টাকা (জানুয়াযী'৭৩) হয় এবং অতঃপর বিনিয়োগের ৩ কোটি টাকা (মার্চ ১৯৭৪) থেকে ১০ কোটি টাকায় (ডিসেম্বর, ১৯৭৫) উন্নীত করা হয় এবং অতপর তা বাড়িয়ে সীমাহীন (১৯৭৮) করা হয় এই সব বৃদ্ধি সংঘটিত মাত্র ছয় বৎসরের ব্যবধানে।

১৯৮২ নতুন শিল্পনীতি

তিন প্রকারের শিল্প ১) সংরক্ষিত ২) যৌথ ৩) শিল্প বিনিয়োগ তালিকা । সংরক্ষিত খাতে রয়েছে ক) অস্ত্র ও গোলাবারুদ খ) আণবিক শক্তি গ) বিমান পরিবহন ঘ) টেলিযোগাযোগ ঙ) বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ (পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ব্যতিরেকে) ও চ) বনজ সম্পদ যান্ত্রিকভাবে আহরণ। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সমুহ ঃ পাট ও বস্ত্রকল বেসরকারীকরণ- বেসরকারী খাতকে উৎসাহ প্রদান, ফলে ৬৫০ টি

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কারখানা ফেরত প্রদান ১৯৮১ সনে শিল্প সম্পদের ৮৫% রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতে ১৯৮৫ সনে মাত্র ৪০% ভাগ।

১৯৮৬'র সংশোধিত শিল্পনীতি

সংরক্ষিত তালিকায় সপ্তম শিল্প সিকিউরিটি প্রিন্টিং (নোট ছাপানো) ও টাকশাল। লক্ষ্যসমূহ ঃ ১) জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান বৃদ্ধি ২) শিল্পায়নে বেসরকারী খাতের ভূমিকা ৩) ক্ষুদ্র, কুটির ও তাঁত শিল্পের অগ্রাধিকার ৪) উপাদান সংযোজন থেকে মাধ্যমিক ও মৌলিক শিল্পে উত্তরণে উৎসাহ দান ৫) ভারী ও কৌশলগত শিল্পে সরকারী খাতকে সীমিতকরণ ৬) কৃষি ভিত্তিক শিল্পের অগ্রাধিকার ৭) আমদানী বিকল্প ও রপ্তানীমুখী শিল্পকে উৎসাহদান ৮) আবশ্যক ভোগ্য পণ্য উৎপাদন ৯) বস্ত্রে ১৯৯০ সন নাগাদ স্বয়ং সর্ম্পূণতা অর্জন ১০) শিল্পের ভৌগলিক সুষম বিতরণ ১১) দেশজ উৎপাদন ব্যবহারকারী প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহ প্রদান ১২) বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ।

শিল্পনীতি ১৯৯১

মুল লক্ষ্য পাঁচটি ১) বিদ্যমান শিল্প ইউনিট সমুহের সমস্যা ও সম্ভাবনার সযত্ন পরীক্ষা ও মুল্যায়নের পর একটি বাস্তবধর্মী শিল্প সংস্কার কর্মসূচি উদ্ভাবন ২) বিগত শিল্প নীতি ও কৌশল সমূহের ব্যর্থতা ও সমস্যা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে শিল্প খাতকে আরও দক্ষ ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক করে গড়ে তোলা ৩) একটি শক্তিশালী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং গ্রামীণ শিল্প খাত গড়ে তোলা ও তার সম্প্রসারণ করা ৪) একটি উপযুক্ত রপ্তানী কৌশল উদ্ভাবন করে রপ্তানীমুখী শিল্পের দ্রুত বিকাশ সাধন করা ৫) বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকে উৎসাহিত করা। সাম্প্রতিক সংশোধন- সংরক্ষিত খাত থেকে 'গ' 'ঘ' ও 'ঙ' খাতকে বাদ দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ সরকারের জন্য সংরক্ষিত কেবল চারটি খাত।

শিল্পনীতি ১৯৯১- শিল্প উন্নয়নের কৌশল

১. বেসরকারী খাতের উন্নয়নের জন্য সরকারের সহায়তামূলক ভূমিকা;
২. শুল্ক ও করের যথাযথ পুণর্বিন্যাস এবং বাণিজ্যিকনীতি প্রণয়ন শিল্পনীতির সহায়ক;
৩. শিল্প ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা প্রদানে সরকারী ও বেসরকারী খাতের সমান সুযোগ সৃষ্টি করা;
৪. শিল্প ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা প্রদানে দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা;
৫. উৎপাদনশীলতার সঙ্গে মজুরী ও শ্রমিক কল্যাণের সংযোগ সাধন করা;
৬. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে আর্থিক ও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা;
৭. কৃষি ও কাঁচা মাল নির্ভর শ্রমঘন পল্লী প্রতিষ্ঠান স্থাপন;

৮. রপ্তানীমুখী ও অস্থায়ী শিল্প স্থাপনে আর্থিক ও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি ;

৯. কারিগরী ও পেশাগত উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান কারিগরী কেন্দ্র উন্নয়ন ও নতুন কেন্দ্র স্থাপন;

১০. গবেষণা ও উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান ;

১১. রুগ্ন শিল্পের সমস্যাসমুহ চিহ্নিত করে প্রতিকারের পদ্ধতি নির্ণয়;

১২.অস্থায়ী শিল্প ও উপ-ঠিকাদারী শিল্পের বিকাশে উৎসাহ প্রদান;

১৩.শিল্পের সুষম বিস্তারে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির উপর রেয়াতী হারে শুল্ক ও কর আরোপ;

১৪.শিল্প সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

১৫.শ্রমঘন শিল্পের বিকাশকে উৎসাহ প্রদান;

১৬.পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ;

১৭. উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারীদের দায়িত্ববোধ ও দক্ষতা বৃদ্ধি ।

আর্থিক উৎসাহ দান

উন্নত, স্বল্পোন্নত, ন্যুনতম উন্নত ও বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় নতুন শিল্প সমুহকে যথাক্রমে ৫,৭,৯ ও ১২ বৎসরের কর অবকাশের ব্যবস্থা ১৯৯৫-৯৬ সনের বাজেটে সংশোধন করে পার্বত্য চট্রগ্রাম বাদে ঢাকা চট্রগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ৫ বৎসর এবং রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ ও পার্বত্য চট্রগ্রামে ৭ বৎসরের কর অবকাশ দেয়া হয়েছে । ১০০% রপ্তানীমুখী শিল্পকে ১০০% আয়কর মওকুফ এবং সকল রপ্তানীমুখী শিল্পে স্থানীয় কর মওকুফ করা হয়েছে ।

বেসরকারী শিল্প স্থাপনে অর্থায়ন সংস্থাকে পুর্ণ ক্ষমতা প্রদান - বেসরকারী শিল্প স্থাপনে সরকারী অনুমোদন নিস্প্রয়োজন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিনিয়োগের যথাক্রমে অনুর্দ্ধ ৩ (তিন) কোটি ও ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ।

শিল্পায়নের অগ্রগতি

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্প খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৫৮০০ কোটি টাকা - প্রকৃত বিনিয়োগ মাত্র ৩৩৫৮ কোটি বা লক্ষ্যের ৫৮% , সরকারী বিনিয়োগের উধ্বমুখী ৭৯% (২০৪৪-২৬০০) এবং বেসরকারী বিনিয়োগের ৩২% (১০১৪/৩২০০) অর্জিত হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার ৫৫% যেখানে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ হওয়ার কথা, সেখানে প্রকৃত বিনিয়োগের মাত্র ৩০% (১০১৪/৩৩৫৮) বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ করেছে । ফলে শিল্পে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১০% লক্ষ্যের তুলনায় মাত্র ৪% প্রথম দ্বি-বার্ষিক ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প খাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৯%, ২% এবং ৫% - তবুও ১৯৭২ সন থেকে ১৯৯০ অবধি দেশজ উৎপাদনে শিল্পের অবদান ৭% থেকে ৯% হয়েছে - প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান করছে শিল্প খাত - শিল্প উৎপাদন সুচক ১৯৭৩-৭৪ সালের তুলনায়

১৯৯০-৯১ সনে ১৬৬ হয়েছে। চতুর্থ যোজনার (১৯৯০-৯৫) শিল্প খাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ৯% - প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৯০-৯১ সনে ২.৪%, ৯১-৯২ তে ৭.৪% এবং ৯২-৯৩ সনে ৯.৩%, ৯৩-৯৪ সনে ৯.৭% এবং ৯৪-৯৫ সনে ৮.৬%। ১৯৯৫-৯৬ সনে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ১০.৫% প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৬% (অনুমিত) অর্জিত হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে শিল্প প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ৮.৬%।

উপসংহার

শিল্পায়নে আবশ্যক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং উদ্যোগ- আর্থিক ও ভৌত অবকাঠামো - জাতীয় আয়ে শিল্পায়নের অবদান, মুলধন- উৎপাদনের অনুপাতের ভূমিকা, শিল্পায়নের চালিকা শক্তি হল নতুন প্রযুক্তি, স্পেশিয়ালাইজেশন ও বাণিজ্য, শিল্পায়নের পুর্বশর্ত - শিক্ষিত মানব সম্পদ- অনুকূল পরিবেশ।

বাংলাদেশে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাবলী

মোশাররাফ হোসাই ভূঞা
উপ-পরিচালক, বিপিএটিসি

ক) বাংলাদেশে নীতি-প্রক্রিয়ার পরিকাঠামো ও পরিমন্ডল

১. সাংবিধানিক ও আইনগত কাঠামো
২. রাজনৈতিক দর্শন, সংস্কৃতি ও মুল্যবোধ
৩. সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও মুল্যবোধ
৪. প্রশাসনিক কাঠামো, পদ্ধতি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ
৫. অর্থনীতি, শিল্পোন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত বিকাশের পর্যায়।

খ) নীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমুহ

১. নীতি প্রণয়নের পটভূমি
২. নীতি প্রণয়নকারী সংস্হাসমুহ
৩. কাদের জন্য নীতি প্রণীত হচ্ছে
৪. কোন এলাকার জন্য নীতি প্রণীত হচ্ছে
৫. নীতি প্রণয়নের যৌক্তিকতার মাত্রা
৬. এলিটিজমের মাত্রা
৭. Interest groupসমুহ
৮. বাস্তবায়নকারী সংস্হাসমুহ
৯. বাস্তবায়নকারীদের মনোভাব/দক্ষতা
১০.সুবিধাভোগীদের মনোভাব
১১.নীতির প্রভাব।

গ) বাংলাদেশে নীতি প্রণয়নের সমস্যাসমুহ

১. রাজনৈতিক সমস্যা
২. আমলাতান্ত্রিক সমস্যা
৩. প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব
৪. Interest Group এর দুর্বলতা ।

ঙ) সমাধানের উপায়

১. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমুহ সুদৃড়করণ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ
২. স্হানীয় সরকার ব্যবস্হা শক্তিশালীকরণ
৩. প্রশাসনিক সংস্কার
৪. জননীতি সংক্রান্ত গবেণার প্রসার
৫. সমন্বয় নিশ্চিতকরণ
৬. জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ।

বাংলাদেশ চর্চা

মডিউল-৪ ঃ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

Bangladesh Foreign Policy : Challenges and Opportunities

ডঃ আবরার চৌধুরী
চেয়ারম্যান,
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Introduction :

At the fag end of the millennia, the world is awakened to a new series of events and phenomena of far-reaching consequences. Accordingly, Bangladesh is also undergoing a process of unprecedented transformation market by difficult challenges as well as tremendous opportunities. The most remarkable aspects of this process are the economic liberalization and democratic regeneration. Bangladesh has been going through arduous processes of institutionalization of democracy and economic liberalization during the past few years of the current decade. However, the long drawn political turmoil has ended with the successful holding of the general elections of June 12, thanks to the persistence of the democratic movement, assertion on the part of the resurgent civil society, and more importantly, the courage caution and sagacity as displayed by the people at large. In conformity with the verdict of the people in the elections. the victorious party-Bangladesh Awami Legue- formed the new government with its chief Sheik Hasina as the Prime Minister. As a protracted political crisis found a democratic solution, a sense of security and stability has begun to prevail in the country. Thus a new era of fresh prospects and opportunities has

emerged in the chequered history of Bangladesh. The country's march towards democracy is, however certain to be difficult due to the gigantic tasks and severe challenges faced by it in the way of democratic transformation and socio-economic advancement.

In the economic ream the challenges are more formidable but the opportunities for Bangladesh are enormous as well. Economic liberally actio, and more so, new opportunities in the world market has given boost to the burgeoning garment and textile industries. Sectors like frozen food, leather and electronics are also displaying tremendous potentials. Now the challenge facing Bangladesh is to formulate a viable development strategy capable of materializing the economic opportunities and thus, pulling the country out of the poverty trap.

In a highly interdependent world, Bangladesh will have to pursue its nation building objectives in an international environment that is undergoing a process of radical transformation and marked by considerable fluidity. The post-War international order that was marked by Cold-War and accompanying phenomena, now belongs to history. One of the two main antagonists of the Cold-War era the US, has lost its position as the economic giant that dominated and structured the world economy, while retaining its military might. The other one, Russia , the successor to the former Soviet Union, is far from being able to assert itself as a great power, in terms of either miliitary or economic might. With the decline of super powers, new poles of power are emerging. The changes are taking place in the backdrop of new realities of contemporary world wherein economic strength is

increasingly becoming the determinant of national status and power of a state. In this regard, the meteori rise of Japan as a economic super power has been one of the most significant developments of post-War period. Similarly, the transformation of the Asia-Pacific region as one of the most important economic power-house of the contemporary world is of crucial international importance. However, a new international order is yet to take a concrete shape. More importantly whether and how far the emerging international order would be based on equality commonality of interests and cooperation remains an open question. This implies particularly to the emerging international economic order which as it appears has taken the ongoing process of economic liberalization with its singled minded emphasis on free market as a panacea capable of healing all economic ills. The emerging international order could be, thus, summarized as one full of fluidity uncertainty, challenges as well as opportunities.

It is in this backdrop, that an attempt would be made below to study foreign policy of Bangladesh with particular focus on the challenges faced by the country in its external relations and The available options to meet these challenges. Foreign policy of Bangladesh, like that of any country, is basically an instrument for garnering material and political support in international arena with a view to realizing the socio-economic and political objectives of the country in studying foreign policy of any country the ongoing process of socio-economic and political development of the country which ultimately determines the tasks on foreign policy is of crucial importance. Hence the understanding of the process of development in a given country is a sine-quo-non for evaluating the purpose f its foreign policy

and its effectiveness as an instrument of achieving national goals. In our attempt to identify the challenges faced by Bangladesh in relation to its foreign policy and to find out available options to meet them, we would, therefore, concentrate our attention on analyzing the domestic context of foreign policy.

Challenges Facing Bangladesh Foreign policy: The Domestic Context

Foreign Policy can be defined as a strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis-à-vis other states of international entities aimed at achieving specific goals defined in terms of nations interests.[2] In pursuit of their foreign policy, the nations recognize no "internal allies" or "perpetual enemies," they single-mindedly seek to augment national self-inters which alone are eternal and perpetual. The tasks of foreign policy of any country is determined by its tasks in the domestic front making foreign policy an extension of domestic policy. Being subservient to domestic policy, foreign policy is assigned to master international support and create international conditions favourable to the fulfilment of domestic national goals. Therefore, attempt to identify the tasks of foreign policy of Bangladesh would be premised on the analysis of the national objectives. In this regard, our prime focus would be the broad issues of socio-economic and political development of the country which constitute the major challenges.

The political process in Bangladesh has always been a rather volatile one marked by recurrent crisis. With the resolution of the recent political

crisis through free and fare elections, desperation has been replaced by hopes. Bangladesh's march towards democracy, however is certain to be highly difficult and could even be painful. An array of reasons could be attributed in favour of such a prognosis. Economic and political institutions of the society are highly underdeveloped. Only a small segment of the population is politically conscious and drawn to the modern economic activities. The vast majority remains illiterate and the level of their political consciousness and participation is also very low. They live in absolute poverty and are yet to be drawn to the modern economic activities. Country's small but, geo-politically important minorities are yet to be drawn to the national mainstream.

On the other hand exposure to modernization coupled with the revolution in communication generated great expectations among mass population with regard to prosperity which even sincere attempts on the part of the leadership could hardly fulfill. The country is, thus, posed with the formidable challenge of telescoping the socio-economic progress achieved in the relatively advanced countries. If we take the past as a guide to the future, it could be asserted with some certainty that political stability as well as the future of the on-going democratic process in the country would depend primarily, though not exclusively, on the success of the government in fecing the economic challenges. Our attempts, therefore, would be concentrated below to identify the economic tasks facing the country.

Bangladesh is a small country with 144,000 square kilometers of territory and 115.06 millions of people. With about 800 people per square

kilometer, it is one of the most densely populated countries in he world. Projected average annual growth of population for the period 1992-2000 is about 1.8 percent.[3]" Despite some improvements , with a per capita GNP of only US$28 . Bangladesh belongs to the group of then poorest countries of the world listed by the World Bank[4]. While the 4.7 percent average GDP growth achieved in the last five years is a strong growth rate, particularly with an investment activity that has been hovering around 12-14 percent of GDP, it is significantly below the range above 6 percent -where the economy could reach a capacity to effectively tackle Bangladesh extreme poverty problem.[5] In order to achieve this higher pace of growth, the investment rate should be increased to a level in the 20 percent range. Most of this increase needs to come from the private sector, domestic as well as foreign. It is also important that investment takes place in activities with the greatest potential for creating a dynamic and efficient economy in line with the country's comparative advantage and poverty alleviation needs. In this respect, export-based and labor-intensive growth is crucial to achieve sustained increase in growth and employment opportunities.

Thus, the first and foremost task of the nation in the field of economy is to increase the growth rate. According to one estimate, the overall economy must grow at a rate of 7 percent per year for a decade before a serious dent on poverty can be made through employment creation.[6] As a matter of fact, increase in the overall growth of the economy would influence not only poverty alleviation and employment creation, it would also help bridge the gap between export and import, increase gross domestic savings and investment and thus, reduce external dependency. It is in this

background that the Finance Minister Shah A.M.S. Kibria, in his budget speech, committed to raise GDP growth rate to 5.5 percent in the current year and further raise it to 7 percent in the next five years[7]. This remains the single most challenging task before the nation. While this challenge should be faced primarily through domestic efforts, foreign policy of the country and its external economic relations could as well be of crucial importance. It is primarily because of the fact that the world is highly interdependent. No country, no economy small or big can survive in isolation. More important external economic relations-foreign trade, investment, scientific and technological cooperation etc.-are increasingly becoming more and more powerful instrument of socio-economic advancement. For countries like Bangladesh, export of man power is as well an important factor contributing to the developmental process. The role of foreign policy in achieving socio-economic goals of the country, therefore, could hardly be overstated. How could foreign policy and external relations of the country serve as an instrument of facing the economic challenges, however, remains a question to be dealt with.

It is in this backdrop that an attempt would be followed to evaluate the challenges faced by Bangladesh in its external relations and how foreign policy could play a role in meeting these challenges.

Pursuing Economic Diplomacy : The Most Vital Task

Foreign Policy is being increasingly used worldwide as a device of molding and influencing the policies of other states with a view to

maximizing economic benefits. This dimension of diplomacy more often regarded as economic diplomacy, is gaining more and more importance in attaining the broader economic goals of states at the global level. As it became evident from some of the policy statements made by Prime Minister Sheikh Hasina, the new government clearly realizes potential role of diplomacy in the fulfilment of the country's socio-economic tasks. On 24 June, in her first encounter with the Dhaka-based heads of diplomatic missions and international agencies as Prime Minister, Sheikh Hasina said that the essence of the country's foreign policy would be economic diplomacy. Even effort would be made to boost exports, explore employment opportunity for Bangladeshi nationals abroad and to make Bangladesh specially attractive to foreign investors. She also added hat one of he prime objectives of her foreign policy would be to enhance the image of the country abroad[8]. The newly appointed Foreign Minister of the country, Abdus Samad Azad, has also retirated the same position of the Government.

A host of domestic predicaments and constrains faced by the country sets if agenda for economic diplomacy. These are the inadequate domestic resources for economic development; scarcity of capital in international market the need to diversify trade relations and to explore new market for export, the necessity of exporting manpower; the need for appropriate technology to boost her industrialization and modernization efforts, and the need to make the developmental process environmentally safe. In more concrete terms Bangladesh's economic diplomacy may concentrate its efforts on the following areas:

i. trade promotion, with particular emphasis on the promotion of export and the diversification of trade relations

ii. foreign investment and joint ventures

iii. export of manpower

iv. sustenance of the current flow of foreign aid, with particular emphasis on the diversification of the sources of aid and the removal of adverse conditionalities

v. scientific and technical assistance

vi. collaborative research in relevant fields

vii. appropriate advanced technology, including training and technical know-how

viii. protection of environment through international cooperation.

For Bangladesh it is an imperative to assign its diplomacy to promote multifarious economic cooperation with individual countries, regional groupings as well as international organizations, with a view to taking the maximum advantage of the contemporary international division of labor. While, such a realization is very strong, including among the decision makers at the top level and some efforts were as well initiated with a view to achieving these goals, very little has been achieved in concernet terms. The

expansion of trade with the countries of Asia-Pacific region, Japan and the NICs of the region in particulars, took place at the expanse of a huge deficit against Bangladesh. In terms of attracting investment from these countries as well achieved level remains far short of the country's potentials. Similarly, efforts aimed at promoting existing markets for Bangladeshi goods and exploring new ones in the West also bringing less than leisured results. More importantly Bangladesh is yet to devise concrete policy measures designed to face the post-GATT challenges in international trade. At state remains the garments industry- the most dynamic sector of the industry which generates more than 60 percent of the country's total export earnings. Raising alarm signals about losing preferential access to developed markets or loaf markets because of ILO conventions will not be enough. Concrete ways and means must be devised and the component of the policy package should be productively employed with missionary zeal.

The West :

Since its emergence, Bangladesh has undergone a rather radial transformation in terms of its approach towards the West. It has long abandoned the anti-imperialist and anti-Western rhetoric's of its foreign policy as displayed during the immediate post-independence period. Over the last two decades, Bangladesh is pursuing a policy in international arena that was being more and more tilted towards the West. Even the political and economic values of the society were more and more influenced by those of the West. The extent of Western influence on Bangladesh society could be gauged by the fact that the sudden outburst of so passionate anti-Western,

particularly anti-American, feelings during the Gulf War died down as quickly as they developed.

However, there is a limit to which Bangladesh can expect to yield the dividends for pro-Western stance in its foreign policy and adherence to Western political and economic values. It is primarily because of the fact that following its victory over the East, the West hardly needs the political support of economic liabilities. Political considerations in Western policy is likely to give way to economic rationalism. Therefore, to attract the attention of the West in terms aid and trade relations, Bangladesh needs to create economic opportunities attractive to the former. While this should be done primarily through the improvement of economic performance of the country and through opening opportunities to foreign business, diplomacy as well as a crucial role to play.

However, in the changed circumstances, the role of diplomacy needs to be reorient radically shifting its main thrust from securing aid to promoting trade and investment. It is also the best way of reducing the consequences of external dependence. Foreign policy an external[10] elation's as an instrument of the promotion of trade and investment still remains largely under-explored. Potentials for increasing export further remain vast. Foreign policy establishment could be of significant use in export promotion. It could serve in two ways first, by undertaking measures aimed at promoting export market; second, by providing the business circles of the country with current information on the market situation in the West.

The Asia-Pacific Region:

The Asia-Pacific region has emerged as one of the most important economic commercial and geo-strategic centers of the present day world. It is a vast area washed by to wheaters of two oceans and currently populated by more than half of the mankind. For the convenience of our analysis, we would concentrate our attention, primarily on Japan and the Asia-Pacific NICs who are assuring increasing importance if Bangladesh foreign policy particularly in its external economic relations.

Since the World War if the region has been undergoing a dramatic transformation. The countries of the region witnessed spectacular growth in their economies, technological and scientific development parallel with the deepening of economic cooperation, interdependence and rapid increase in their share of world trade. In this regard, the meteoric rise of Japan as an economic super power has been one of the most significant developments of post-War period. From to ashes of nuclear catastrophe, it has emerge as the second largest economic power of the world. It has also emerged as the world's largest creditor nation.

Along with Japan, the Asia-Pacific NICs, namely, South Korea, Taiwan, Hongkong, Singapaore, Indonesia, Malaysia and Thailand have achieved great success in economic and industrial development. All these developments have transformed the region as one of the most important focuses of attention in the present day world. In the broader perspective, the balance of global politico-strategic and economic importance is

increasingly being shifted from the Atlantic Ocean to the Pacific setting the stage for the "Age of the Pacific".

Such developments of global significance in its neighborhood cannot but have profound implications for Bangladesh. The challenge facing the country today is how to derive benefit from the dynamic economic growth and progressive socio-political developments in the Asia-Pacific region.

For Bangladesh, Japan is of paramount interest. It has already turned into the largest aid donor and a leading economic partner of the country. However, trade between the two countries increased at the expense of a huge deficit against Bangladesh. During the year since 1980 to 1992, Bangladesh extorted goods worth US$ 362 million to Japan as against its import of goods worth US$4425.32 million. This created a total deficit of US$4063.45 million against Bangladesh.[10] This can not be allowed to continue indefinitely to reverse the triend, it is necessary to study the Japanese market thoroughly with a view to readjusting the production capacity of export onented industries, the type of products, and more importantly, their quality. The main objective should be to produce exportables suitable for Japaneses market.

An array of leasons would suggest that there is tremendous scope for further development of Bangladesh Japan relations. In a highly interdependent world, Japan also needs cooperation with its relatively less prosperous neighbors. Technologically highly developed but resource-starved Japan needs its neighbors as source of raw material and market for

its industrial goods. Very recently, Japan is also suffering from lack of manpower, particularly the unskilled one, In the face of growing protectionism in Europe and the US, Japan's sustained prosperity is likely to depend significantly on a prosperous neighborhood. It is already displaying a clear interest in the economic welbeing of Asian countries a certain degree of preparehess to invest in this venture. Over the recent years, Japan is displaying a district willingness to increase the current level of cooperation with the SAARC countries. Tokyo is also timidly embarking up on a more active foreign policy. Japanese policy, however, would be determined more by economic rationalism than political considerations. It is necessary to evaluate carefully every step of Japanese foreign policy, its "economic diplomacy" in particular, and act accordingly.

China remains an important partner of Bangladesh for a number of reasons. China is an important trade partner and the potential for two way trade remains vast. It is also an important donor country. The amount China offers to Bangladesh may be small, its terms and conditions comparatively easier, China is as well a major arms supplier to Bangladesh and due to laters inability to pay for Western arms it is likely to remain the same for some times to come. Bangladesh will have to maintain and strengthen further its mutually beneficial relations with China.

By now, the necessity of close economic cooperation with the Asia-Pacific countries has been clearly realized. Some efforts were as well initiated with a view to expanding Bangladesh's cooperation with these countries. Nonetheless very little has been achieved. As a study shows, the

expansion of Bangladesh's trade with a group of Asia-Pacific countries, which includes China, Japan and most of the NICs of the region, took place at the expense of a huge deficit against Bangladesh. For the period since 1980 to 1992 , on average Bangladesh, exported goods worth US$1`454.48 kmillion per year to these countries as against its yearly average import of US$968.84 from these countries[11]. While Bangladesh's inability to produce goods that could be attractive to the Asia-Pacific market remains the main hurdle, lack of measures directed at promoting market for Bangladeshi goods and insufficient information on the part of business circles as well partially responsible for the situation.

A combination of colonial legacy, economic and technological backwardness, external economic dependence and a perceived sense of intellectual poverty made us traditionally reliant on the West for development models. However, development models successfully tested in the West are facing severe problems of adaptation and adjustment to the peculiar conditions of Bangladesh. It is in this backdrop that certain obscurantist forces are seeking a reversal of history, a retreat into the past that they have mythified for political purposes. Their aim is the eradication of the present in the hope that the future will more closely resemble the past. A retreat into the past-an irrational as well as impossible task- would only make the nation-building process more painful. Current realities of national, regional and international life would suggest Bangladesh to learn from the national-building experiences of the Asia-Pacific NICs than any other region of the world. It would smoothen the quest for finding out workable development model for the country as well as allow it to impart some of the

economic dynamism of these countries. Bangladesh. Most of the Asia-Pacific NICs-North Korea, Taiwan, Hongkong, Indonesia, Malaysia and Thailand - have been as impoverished during the 1950s as Bangladesh was. During the past four decades, they have achieved tremendous success in industry, trade, education and science, and turned into envy of other developing countries. Learning form the nation building experiences of Asia-Pacific NICs and imparting some of their economic dynamism to Bangladesh is a gigantic task that would need concerted efforts on the part of national planners, business circles, foreign policy, establishment and above all political leadership of the country .

The West Asia:

West Asia occupies an important place in Bangladesh foreign policy. It is the single-most important area of employment opportunity for the Bangladeshia abroad and the largest source of remittance. It is also an important source on foreign and to the country. The region remains almost the only source of crude on and a largely unexplored market for Bangladeshi goods.

Bangladesh foreign policy is faced with two broad groups of issues in its relations with West Asia. First one pertains to its aid and trade relations as well as employment opportunities for Bangladesh's in the region; and the other pertains to Bangladesh's stand on the issues of significant concern to the regional countries.

Current state of Bangladesh's relations with the main stream West Asian countries are highly favorable for increasing country's export to the regional as we as employment opportunities for Bangladeshi workers. Whether the business opportunities would be explored or not would depend largely in the ability of the countries lansiness countries. With regard to increasing employment opportunities, along with the private initiative foreign policy establishment needs to invigorate its activities. Employment market in the West Asia has increasing becoming competitive and Bangladesh has already been in certain instances outsmarted by Pakistan and India Proper coordination of both government and private initiatives is highly essential.

Bangladesh foreign policy will have to deal with two major issues of the region First one is the Palestinian issue and the Arab-lsraell conflict and otheris of intra-Arab feud the nature of which is both unpredictable and volatile.

Palestine Issue

Intra-Arab feud , while a permanent phenomenon of regional politics, it is also highly unpredictable , volatile and complex. It is often difficult to find out rational explanation for why and when Arab regions come into conflicts. The same implies to the process of escalation and de-escalation of the conflicts and the pattern of shifting alliances in West Asia. Therefore, it would be difficult for Bangladesh to formulate any policy towards the problem. Intra-Arab conflicts will have to be considered case by case while keeping in mind Bangladesh's national interests as of paramount importance.

Coming back to our main theme on how the foreign policy establishment, particularly the missions abroad can be of more effective use in achieving the economic tasks of the nation, a host of concrete suggestions are being put forward for consideration:

I. The Bangladesh missions abroad should keenly observe the policy changes in the countries concerned and transmit back the likely implications in terms of gains and losses for Bangladesh. For example, due to US ban on wild shrimp, there will be a shortfall in the shrimp supply in the short run. Is it possible to coordinate the utilization of idle capacity of our producers to offset the probable losses we might encounter ? Similarly, how would the domestic policy changes in the manpower importing counties affect our interests? In this connection, the Bangladesh missions may establish electronic information centers dealing with all relevant sets of data related to trade and disseminate the information to the concerned enterprises;

ii. The missions abroad may coordinate market surveys with regard to the range of exportable areas with a view to identifying the export potentials;

iii. One importent goal of an economic diplomatic offensive will be to identify complementarties and interdependence between our economy and the concerned foreign economies. Suggestions regarding how to exploit the complementarities-both static and dynamic in trade and investment should also come from the missions abroad;

iv. Contacts between our entrepreneurs and business communities and the expatriate Bangladeshis be activated with a view to linking trade and investment;

v. Where needed the missions may engage in bilateral negotiations with local parties on behalf of Bangladeshi parties;

To be precise, similar role for Bangladesh missions abroad has been talked about in the past. For effective implementation, the question of accountability should be accompanied by incentives for the missions and this makes ample economic sense to tag incentives to performance side by side with accountability.

Bibliography

1. Virendra Narain, Foreing Policy of Bangladesh, (Aaleka Publishers 1987. p.5
2. J.C. Plano and R. Orton, The International Relations Dictionary (BC-CLIO Inc. Oxford, 1982. p.7.
3. World Development Report 1994. (Table 25), p. 210.
4. Ibid.(Table 1) p. 162.
5. Bangladesh Recent Econiomic Developments and Priority Reform Agenda for Rapid Growth, World Bank Country Report No. 13875-BD, (March 16, 1995) p. 21.
6. Sultan Hafeez Rahman, Thoughts on the Budget: 1991/92, Dhaka courier, (May 31- June 6, 1991) p. 12.
7. See Shah A.M.S. Kibria, Budget Speech Part 1, Annual Budget 1996-97, Ministry of Finance , Dhaka, July 28, 1996. p.13.
8. The Financial Express and Bangladesh Observer, June 25, 1996
9. See Delwar Hossain "Bangladesh Foreign Policy: Quest for Economic Diplomacy" Bangladesh Foreign Policy Survey, (Vol.1 No. 1-4, 1995) pp.8-9.
10. These data are from, Schemes of Rrgional Cooperation Aimed at Fostering Economic Growth in "South Asia: The Role of Japan, Final Report Cooperative Research Project Betwen Research Institurtes of SAARC and Japan, (Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, Dhaka. March, 1996) (Table 13,1 1b), p.197.
11. Seen ibid., (Table 13.1.1a) p. 196.

সার্ক ও আসিয়ান ঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা

কাজী মোঃ শামসুল আলম
উপ-পরিচালক, বিপিএটিসি

সুচনা

দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পুর্ব এশিয়া দু'টি পরস্পর সন্নিহিত ভৌগলিক, রাজনৈতিক অঞ্চল। এ দু'টি অঞ্চলের একটিতে অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় গঠিত হয়েছে দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asian Association for Regional Cooperation) বা সার্ক। অপরটিতে অর্থাৎ দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ায় গঠিত হয়েছে দক্ষিণ পুর্ব এশিয়া জাতি সমুহের সংস্থা (Association of South East Asian Nations) বা আসিয়ান। দুটি সংস্থার মাঝে সার্ক অপেক্ষাকৃত নবীণ। অনেকে আসিয়ানকে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি সফল ঘটনা বলে মনে করেন। আসিয়ান দেশগুলোর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সিংগাপুর, কুয়ালালামপুর ও ব্যাংকককে বিশ্ব বাণিজ্যের গুরুত্বপুর্ণ কেন্দ্র সমুহে পরিণত করেছে। তথাপি ভিন্ন প্রেক্ষাপট, পরিবেশ, পরিস্থিতির কারণে সার্ক-এর পক্ষে আসিয়ান-কে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবুও সার্ক পারস্পরিক তুলনা আমাদের জন্য গুরুত্বপুর্ণ। দুটি সংস্থার তুলনামুলক আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা এ দুটি সংস্থার জন্ম, বিকাশ ও সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা করবো।

সার্ক ঃ জন্ম

দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর অল্প কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলের একটি যেখানে আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা অনেক দেরীতে বিকশিত হয়েছে। এর কারণও রয়েছে। এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যকার ঐতিহাসিক শত্রুতা, সীমানা বিরোধ এবং রাজনৈতিক বৈচিত্র আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য অনুকুলে ছিল না। সত্তুরের দশকের দিকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে সরকারের পরিবর্তন সার্ধিত হয়। ভারতে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে সরিয়ে জনতা পার্টি, পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেনারেল জিয়াউল হক এবং শ্রীলংকায় মিসেস বন্দরানায়ক এর স্থলে জে, আর, জয়, বর্ধন ক্ষমতায় আসেন। বাংলাদেশেও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর ক্ষমতা সংহত করেন। এসব সরকারগুলো ছিল সাধারণভাবে পাশ্চাত্যের প্রতি সহানুভুতি সম্পন্ন। ১৯৭৮ সালে এ অঞ্চল সফরকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জেমস কালাহান এ অঞ্চলের দেশগুলোর মাঝে শান্তি, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের কথা বলেন। তাঁরা এ অঞ্চলের দেশগুলোর বহুপাক্ষিক সহযোগিতামুলক প্রকল্পে অর্থনৈতিক সহায়তারও আশ্বাস দেন।

আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রকৃত উদ্যোগ নেন বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান । ১৯৭৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান সফর কালে তিনি দুদেশের নেতাদের সাথে এ বিষয়ে প্রাথমিক যোগাযোগ করেন । ১৯৭৮ সালে নেপালের রাজা বীরেন্দ্র'র বাংলাদেশ সফর এবং ১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এর শ্রীলংকা সফরের সময়ও বিষয়টি আলোচনায় আসে । ১৯৮০ সালের মে মাসে তিনি এ অঞ্চলের সকল রাষ্ট্র নায়কদের কাছে আঞ্চলিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিঠি লেখেন । তাঁর চিঠিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে সহযোগিতার সম্ভাব্য এলাকা হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন । সে বছরের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে তাঁর সফরের সময় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করেন। ২৫ নভেম্বর ১৯৮০ সালে আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্পর্কিত ওয়ার্কিং পেপার অঞ্চলের দেশগুলোর মাঝে বিতরণ করা হয় । আঞ্চলিক সহযোগিতার এই প্রস্তাব নিয়ে সাতটি দক্ষিণ এশীয় দেশের পররাষ্ট্র সচিবরা নয়াদিল্লী ঘোষণা নামীয় দলিল চূড়ান্ত করেন । দলিলে সম্মত নয়টি ক্ষেত্রে সহযোগিতার কাঠামো বর্ণনা করা হয় । সাতটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রিরা আগষ্ট, ১৯৮৩ তে নয়াদিল্লীতে মিলিত হয়, 'নয়াদিল্লী ঘোষণায়' স্বাক্ষর করেন । ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় সাতটি দক্ষিণ এশীয় দেশের সরকার প্রধানদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে সার্ক আনুষ্ঠানিকভাবে তার যাত্রা শুরু করে ।

সার্ক ঃ বিকাশ

সার্ক সনদ অনুসারে সার্ক এর অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধি করা এবং তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন । এই বিষয়টি সার্ক-এর সূচনালগ্নে যতখানি গুরুত্বপুর্ণ ছিল আজ এক দশক পরেও ততখানি গুরুত্বপুর্ণই রয়ে গেছে । গোঁড়াতে সার্ক সদস্য দেশগুলোর মাঝে সহযোগিতার পাঁচটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছিল । পরবর্তীতে এর সংখ্যা বারোতে উন্নীত হয় । সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে ঃ

১. কৃষি
২. যোগাযোগ
৩. শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলা
৪. পরিবেশ
৫. স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা কার্যক্রম
৬. আবহাওয়া বিজ্ঞান
৭. মাদকদ্রব্য পাচার ও মাদক দ্রবের অপব্যবহার প্রতিরোধ
৮. পল্লী উন্নয়ন
৯. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১০.	পর্যটন

১১.	পরিবহণ

১২.	উন্নয়নে নারী

উপযুক্ত সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি টেকনিক্যাল কমিটির আওতাভূক্ত। ১৯৯৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পরিবেশ ও আবহাওয়া বিজ্ঞান সম্পর্কিত টেকনিক্যাল কমিটি দুটি একীভূত করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে আরো কতগুলো গুরুত্বপুর্ণ ক্ষেত্রে সার্ক-এর কর্মকান্ড সম্প্রসারিত হয়েছে যেমন - দারিদ্র দুরীকরণ, সন্ত্রাস, শিশু , তরুণ ইত্যাদি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সার্ক দেশগুলো তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা বিস্তার ঘটিয়েছে। ১৯৯১ সালে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থা (সাপটা) (SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA) গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এর ফলে বাণিজ্যের মত গুরুত্বপুর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতার সুচনা হয়। সাপটা চুক্তিটি ঢাকায় ১৯৯৩ সালে এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন চলাকালে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির আওতায় আন্তঃ আঞ্চলিক বাণিজ্যের ধাপে ধাপে উদারীকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এতে মাঝে মাঝে বাণিজ্য আলোচনারও ব্যবস্থা রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সদস্য দেশগুলো একে অপরকে শুল্ক, আধা-শুল্ক, অশুল্ক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সুবিধা দেবে। চুক্তিটি ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯৫ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে। ২২৬টি পণ্য বর্তমানে এর আওতাভূক্ত। সদস্য রাষ্ট্রগুলো এসব পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে পরস্পরকে বিশেষ শুল্ক রেয়াত দিতে সম্মত হয়েছে। সার্ক দেশগুলোর মধ্যকার আন্তঃ আঞ্চলিক বাণিজ্যের অবস্থা (সাপটা পুর্ব) সারণী -১ এ দেখা যেতে পারে ঃ

সারণী-১

সার্কভূক্ত দেশগুলোর মোট আমদানী ও রপ্তানীর ভিতর আন্তঃ আঞ্চলিক আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ (%)।

১৯৮১	১৯৮৭
৪.৯	৩.০

সূত্র ঃ IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook, ১৯৮৮.

* ভূটান সম্পর্কে তথ্য না পাওয়ায় ভুটানকে বাদ দেয়া হয়েছে।

১৯৯৩ সালে সার্ক চেম্বার অফ কর্মাস এন্ড ইন্ডাষ্ট্রীজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর সদর দপ্তর করাচীতে অবস্থিত। সার্ক দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিস্তারে এই সংস্থাটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে সার্ক- এর দৃষ্টি দারিদ্র দুরীকরণের মতো গুরুত্বপুর্ণ ক্ষেত্রে নিবদ্ধ হয়েছে। দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলের চল্লিশ কোটি লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। সে কারণে এর নিরসনের জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দারিদ্র দুরীকরণ সম্পর্কিত স্বাধীন দক্ষিণ এশিয় কমিশন (Independent South Asian Commission on Poverty Alleviation) গঠিত হয়। সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। সার্ক নেতৃবৃন্দ দারিদ্র দুরীকরণকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে একমত হন। তাঁরা দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি কর্মসুচি বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করেন যাতে সামাজিক উদ্যোগ (Social mobilization) এবং বিকেন্দ্রীকৃত কৃষি ও মানবিক উন্নয়নের নীতি থাকবে। দারিদ্রের প্রতি পক্ষপাতপুর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়নেও নেতারা একমত হন। এরই ফলশ্রুতিতে দারিদ্র দুরীকরণের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য তিনস্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাঠামোটিতে রয়েছে ঃ

১. দারিদ্র দুরীকরণ ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সচিবদের দল
২. অর্থ ও পরিকল্পনা সচিবগণ এবং
৩. অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রিগণ

দারিদ্র দুরীকরণের বিষয়টিকে আরো গুরুত্ব দেয়ার অভিপ্রায়ে সার্ক ১৯৯৫ সালকে দারিদ্র দুরীকরণের জন্য সার্ক বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে।

অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয় উন্নয়ন তহবিল (SADF) গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই তহবিলের তিনটি জানালা থাকবে ঃ

১. প্রকল্প চিহ্নিত করা ও প্রকল্প উন্নয়ন
২. প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমুহ এবং
৩. সামাজিক উন্নয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমুহ

বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ সামাজিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সার্ক একেকটি বছরকে কোন একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করে সার্ক বর্ষ হিসেবে করছে। ১৯৮৯ সালকে মাদক দ্রব্য পাচার ও মাদক দ্রব্যের অপব্যবস্হার রোধে সার্ক বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। তেমনি ১৯৯৬ সার্ক 'সার্ক স্বাক্ষরতা বর্ষ' হিসেবে পালিত হচ্ছে। অধিকন্তু ১৯৯০ এর দশক 'সার্ক মেয়ে শিশু দশক' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

উপর্যুক্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়গুলোতে উদ্যোগ নেয়া ছাড়াও সার্ক চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র (SAIC) ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সার্ক যক্ষা কেন্দ্র (STC) কাঠমুন্ডুতে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সার্ক আবহাওয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (SMRC) ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সার্ক ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র (SDC) নয়া দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । কেন্দ্রগুলো তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করছে ।

সাপ্টা (SAPTA) ছাড়াও সার্ক আরো তিনটি গুরুত্বপুর্ণ আঞ্চলিক চুক্তি সমঝোতা চূড়ান্ত করেছে । এগুলোর আওতায় রয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা, সন্ত্রাস এবং মাদকদ্রব্য । সন্ত্রাস ও মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত সমঝোতাগুলো ইতোমধ্যেই সকল সদস্য দেশ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং সমঝোতাগুলোর সমর্থনে সদস্য দেশগুলো কর্তৃক প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে ।

১৯৮৬ সাল থেকেই সার্ক অঞ্চলের জনগণের মাঝে সংযোগ স্থাপনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে । সার্ক ভিজুয়াল বিনিময় কর্মসুচি (SAVE) সার্ক চেয়ার , ফেলোশীপ এবং বৃত্তি সকর্মসুচি, সার্ক যুব স্বেচ্ছাসেবী কর্মসুচি এবং সার্ক ভিসা অব্যাহতি কর্মসুচি এক্ষেত্রে গৃহীত কতকগুলো গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ ।

অন্যান্য আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক সংস্থার সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে সার্ক তার কার্যপরিধিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে । সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সার্ক অনেকগুলো আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা, যেমন, আংকটাড (UNCTAD), এসকাপ (ESCAP), ইউনিসেফ (UNICEF), আপট (APT) , ইউএনডিপি (UNDP) এবং ইউএনডিপি (UNDP) -র সাথে সহযোগিতামুলক সমঝোতায় আবদ্ধ হয়েছে । এছাড়াও বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক ফোরামে সার্ক দেশগুলো যৌথ অবস্থান গ্রহণ করছে । ১৯৯২ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলন থেকে শুরু করে সকল প্রধান আর্ন্তজাতিক প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে । এবং এ অঞ্চলের দেশগুলো বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাধারণ অবস্থান জোরালোভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে ।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়, যারা সার্ককে ''স্থবিরতায় আক্রান্ত একটি সংস্থা যার ভবিষ্যত অনিশ্চিত'' বলে মনে করেন, তারা এর সঠিক মুল্যায়ন করতে সক্ষম হননি । গত এক দশকে সার্ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করেছে । যদিও এ অগ্রগতি প্রত্যাশার সাথে সংগতিপুর্ণ নয় । কিন্তু দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও পারস্পরিক অবিশ্বাসে দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ায় এ অগ্রগতিকে ছোট করে দেখার উপায় নেই । সার্ক এমন একটি বাহন যার মাধ্যমে শান্তি ও সমৃদ্ধির নতুন যুগে প্রবেশ করার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারে । সার্ক যার ভিত্তি ইতোমধ্যেই স্থাপন করেছে । এখন প্রয়োজন এ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক সদিচ্ছা যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার একশত কোটি জনগোষ্ঠিকে সমৃদ্ধশালী জীবন উপহার দিতে পারে ।

সার্ক-এর সাংগঠনিক কাঠামো

১) রাষ্ট্র/সরকার প্রধানদের বৈঠক

সার্ক রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ বছরে একবার বৈঠকে মিলিত হন।

২) মন্ত্রি পরিষদ (Council of Ministers)

সদস্যদেশগুলোর পররাষ্ট্র মন্ত্রিদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রি পরিষদ সার্ক-এর নীতি নির্ধারণী সংস্থা। মন্ত্রি পরিষদ বছরে দুবার বৈঠকে মিলিত হন। প্রয়োজনে এর অসাধারণ সভাও অনুষ্ঠিত হতে পারে। মন্ত্রি পরিষদের মুল কাজগুলো হচ্ছে ঃ ক) নীতি প্রণয়ন ; খ) সহযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা; গ) সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র নির্ধারণ; ঘ) প্রয়োজনবোধে সংস্থার জন্য অতিরিক্ত কার্যসাধন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ; ঙ) সংস্থার জন্য সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ।

৩) স্ট্যান্ডিং কমিটি

সদস্য দেশগুলোর পররাষ্ট্র সচিবদের সমন্বয়ে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি বছরে অন্তমঃ একবার বৈঠকে মিলিত হবে। স্ট্যান্ডিং কমিটির মুখ্য কাজগুলো হচ্ছে ঃ

১. সহযোগিতা কর্মসুচির সামগ্রিক মনিটরিং ও সমন্বয়;
২. প্রকল্প ও কর্মসুচিসমুহের অনুমোদন এবং তাদের অর্থায়নের পন্থা নির্ধারণ;
৩. আন্তঃ সেক্টর অগ্রাধিকার নির্ধারণ;
৪. আঞ্চলিক এবং বহিঃ সম্পদ সংগ্রহ; এবং
৫. সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ।

৪) প্রোগ্রামিং কমিটি

প্রোগ্রামিং কমিটি প্রবীণ কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত। এ কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটির অধিবেশনগুলোর আগে মিলিত হয়ে সচিবালয়ের বাজেট পরীক্ষা করে, কার্যক্রমের তালিকা চূড়ান্ত করে এবং স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক দেয়া অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করে।

৫) কারিগরী কমিটি সমুহ

কারিগরী কমিটিগুলো সকল সদস্য দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় । কমিটিগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সমন্বয় এবং মনিটরিং-এর দায়িত্ব পালন করে থাকে । কমিটিগুলো তাদের কাজ সম্পর্কে স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে প্রতিবেদন পেশ করে ।

৬) এ্যাকশন কমিটিসমুহ

স্ট্যান্ডিং কমিটি দুয়ের অধিক দেশ সংশ্লিষ্ট কিন্তু সকল সদস্য দেশ সংশ্লিষ্ট নয় এমন প্রকল্প বাস্তবায়নে এ্যাকশন কমিটি গঠন করতে পারে ।

৭) সচিবালয়

সার্ক সচিবালয় কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত । এর নেতৃত্বে রয়েছেন মহা-সচিব । সচিবালয় সার্ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়টি সমন্বয় ও মনিটর করার দায়িত্ব পালন করে থাকে । এ ছাড়া সংস্থার সভাগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় সেবা দেয়া এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সার্ক-এর যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও সচিবালয় কাজ করে থাকে ।

আসিয়ান জন্ম

দক্ষিণ এশিয়ার চেয়ে দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার ইতিহাস পুরনো । দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রথম সত্যিকার প্রয়াস বলা যেতে পারে আসা (ASA) বা দক্ষিণ পুর্ব এশিয় সংস্থা (Association of South East Asia) গঠন । এর আগেকার আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়াসগুলো ছিল হয় রাজনৈতিক-সামাজিক সংস্থা গড়ার অথবা এদের মুল অনুপ্রেরণা ছিল অঞ্চলের বাইরের কোন শক্তি । থাইল্যান্ড, মালয় ও ফিলিপাইনের সমন্বয়ে ১৯৬১ সালে আসা (ASA) গঠিত হয় । এই সংস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি । আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এর পরবর্তী প্রয়াস ছিল ১৯৬৩ সালে মাফিলিন্দো (Maphilindo) গঠন । এর সদস্য দেশগুলো ছিল মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া । আপাতঃ দৃষ্টিতে এর উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার তিনটি মালয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশকে একত্রিত করা । কাজেই সেদিক থেকে সংস্থাটিকে রাজনৈতিক বলা যায় । কিন্তু এর সামরিক বা তেমন কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না । এই সংস্থাটিও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি ।

এরপর আসে আসিয়ান । আসিয়ান গঠনের সময় দক্ষিণপুর্ব এশিয়া দুটি উপ অঞ্চলে বিভক্ত ছিল । একটি উপ অঞ্চলে ছিল ক্ষুদ্রতর কিন্তু রাজনৈতিকভাবে অধিকতর দৃশ্যমান ইন্দোচীনের রাষ্ট্র

সমুহ। অপর উপ-অঞ্চলটি ছিল বিরোধী দেশসমুহের এলাকা। এ দেশগুলোই আসিয়ান গঠন করে। দক্ষিণপুর্ব এশিয়ার বিভক্তি তৎকালীন পৃথিবীর বিভক্তিকেই প্রতিফলিত করে। স্নায়ুযুদ্ধকালীন বিশ্ব তখন কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট বিরোধী শক্তিসমুহের মাঝে বিভক্ত ছিল। কম্যুনিষ্ট বিরোধী দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার দেশগুলোর চীন ভীতির সাথে সে সময়ে যোগ হয় ভিয়েতনাম সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ। ভিয়েতনাম ইতোপুর্বে ফ্রান্সকে পরাজিত করে এবং মার্কিন শক্তিকে সে তখন বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করছিল। কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট বিরোধী শক্তিদ্বয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আসিয়ান এর জন্ম, বিকাশ ও কাঠামোকে প্রভাবিত করে। সাধারণ হুমকি আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো নিজেদের মাঝে সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করে। এছাড়া এর ফলে আসিয়ান মোকাবেলায় পাশ্চাত্যের সংগে অধিকতর নৈকট্য অনুভব করে। উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে ১৯৭৬ সালের ৮ই আগষ্ট ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, সিংগাপুর ও থাইল্যান্ড এর পররাষ্ট্র মন্ত্রি এবং মালয়েশিয়ার উপ-প্রধান মন্ত্রির ব্যাংককে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দক্ষিণপুর্ব এশিয় জাতিসমুহের সংস্থা আসিয়ান গঠিত হয়। আসিয়ান গঠনের সময় এর প্রতিষ্ঠাতাদের চিন্তায় নিরাপত্তার বিষয়টি মুখ্য হলেও এটা প্রকাশ্যে উল্লেখিত হয়নি। আঞ্চলিক বিবাদগুলোর মীমাংসা আসিয়ান এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে, এমনটি ধারণা করা হয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে পাঁচটি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার সবগুলো রাষ্ট্রকেই কালক্রমে আসিয়ান এর সদস্য করার আশা করেছিল। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই আশা বাস্তবায়িত হয়নি (যদিও ব্রুনেই সালতানাত ১৯৮৪ সালের জানুয়ারীতে আসিয়ান এ যোগ দেয়, এর দ্বারা আসিয়ান -এর উপ অঞ্চলগত প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয়নি। অতি সম্প্রতিকালে অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে ভিয়েতনাম আসিয়ান এর সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে। এই অঞ্চলের অপর তিনটি রাষ্ট্র অর্থাৎ লাওস, কম্বোডিয়া ও মায়ানমার-এর আসিয়ান - এ যোগ দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

আসিয়ান ঃ বিকাশ

আসিয়ানের ঘোষিত মুখ্য উদ্দেশ্যগুলো ছিল আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। সামাজিক অগ্রগতি সাধন ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটানো। এসব উদ্দেশ্যগুলো খুব সামান্যই অর্জিত হয়েছে। তাদের মোট বাণিজ্যের তুলনায় আসিয়ান দেশগুলোর নিজেদের মধ্যকার বাণিজ্যের শতকরা হার সত্তুরের দশকে হ্রাস পায়। কেবল মাত্র সাম্প্রতিককালে এই হার আসিয়ান এর জন্মের সময়কার অর্থাৎ ১৯৭৬ এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে (দুই নম্বর সারণী দ্রষ্টব্য)।

সারণী-২

আসিয়ান -এর মোট রপ্তানীর ভিতর আন্তঃ আসিয়ান রপ্তানীর পরিমাণ (%)

১৯৬৭	১৯৭০	১৯৭৫	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯০	১৯৯৪
২০.৯	২১.৪	১৭.২	১৭.৯	১৯.২	১৯.৩	২০.৮

সুত্র ঃ Jhon Ravenhill, Economic Cooperation in South-East Asia: Changing incentives, Asian Survey, Vol.XXXV, No. 9.

১৯৭৭ সালে আসিয়ান রাষ্ট্র /সরকার প্রধানগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থা (Preferential Trading Arramgement-PTA) বাস্তবায়নে সম্মত হন । এর আওতায় আসিয়ান দেশসমুহের উৎপাদিত পণ্যের আঞ্চলিক বাজারে প্রবেশে বিশেষ সুবিধা লাভ করার কথা ছিল । কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে সদস্য দেশগুলো পিটিএ (PTA) কে একটি হাস্যাস্পদ বিষয়ে পরিণত করে । আসিয়ান দেশগুলো এমনসব পণ্যে বিশেষ শুল্ক রেয়াত দেয় যেগুলো হয় এই অঞ্চলে উৎপাদত হয়না অথবা এসবের বাণিজ্য এই অঞ্চলে প্রচলিত নেই । যেমন-ইন্দোনেশিয়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র অথবা ফিলিপাইন সড়ক ও রেলপথ থেকে বরফ সরানোর যন্ত্রের উপর বিশেষ শুল্ক রেয়াত দেয় । এক দশক পর দেখা যায় পিটিএ এর আওতায় বিশষে সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য সমুহের বাণিজ্য আন্তঃ আসিয়ান বাণিজ্যের শতকরা এক ভাগেরও কম । যদিও আসিয়ান দেশগুলো ষোল হাজার পণ্যের উপর পিটিএ এর আওতায় বিশেষ শুল্ক রেয়াত দেয় । এই প্রেক্ষাপটে আসিয়ান রাষ্ট্র/ সরকার প্রধানদের ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে আসিয়ান অবাধ বাণিজ্য এলাকা (ASEAN Free Trade Area) গঠনের ঘোষণা বেশ কৌতুহল উদ্দীপক । আসিয়ান রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ তাঁদের সিংগাপুর ঘোষণায় উল্লেখ করেন, আন্তঃ আসিয়ান সকল শিল্প পণ্য এবং প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্যের উপর শুল্ক হার ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী থেকে পনের বছরের ভিতর ০-৫% এ কমিয়ে আনা হবে । ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রি পর্যায়ের বৈঠকে এই সময়সীমা দশ বছর কমিয়ে আনা হয় । আফটা (AFTA) সম্পর্কে মুল্যায়ন করার সময় এখনো আসেনি । সদস্য দেশগুলো আফটা বাস্তবায়নে কতখানি আন্তরিক হবে তার উপরই এর সাফল্য নির্ভর করছে ।

অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আসিয়ান এর অর্জন সীমিত হলেও রাজনৈতিক ঐক্য অর্জন ও কুটনৈতিক সাফল্যের ক্ষেত্রে আসিয়ান এর অগ্রগতি অভাবনীয় । তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য আঞ্চলিক সহযেগিতা সংস্থার তুলনায় আসিয়ান লক্ষ্যণীয় আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছে । আসিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রিদের সাথে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও কানাডা-র পররাষ্ট্র মন্ত্রি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের একজন সমপর্যায়ের প্রতিনিধির বাৎসরিক মত বিনিময় অনুষ্ঠান এই সংস্থার আন্তর্জাতিক মর্যাদার ইংগিতবহ । বর্তমান বছরেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের পনেরটি দেশের সরকার প্রধানগণ আসিয়ান দেশগুলোর সরকার প্রধান এবং চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার প্রধানদের সাথে থাইল্যান্ডে এক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন । এটাও আসিয়ান এর আন্তর্জাতিক মর্যাদাকেই প্রতিফলিত করে ।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসিয়ান এর উল্লেখযোগ্য পদদক্ষেপগুলোর মাঝে রয়েছে জপফ্যান (ZOPFAN) ঘোষণা । ১৯৭১ সালের ২৬-২৭ নভেম্বর আসিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রিরা কুয়ালালামপুরে এ বৈঠকে মিলিত হয়ে দক্ষিণ পুর্ব এশিয়াকে শান্তি , স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার এলাকা (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) হিসেবে ঘোষণা করেন । তাঁরা এলাকাটিকে বাইরের শক্তি সমুহের যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপের আওতামুক্ত বলেও ঘোষণা দেন । ১৯৭৫ সালে ইন্দোচীন কম্যুনিষ্ট বিপ্লব চুড়ান্ত

পর্যায়ে পৌছা অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়ায় মার্কিন সমর্থিত সরকারের পতন পর্যন্ত জপফ্যান ঘোষণা নিষ্ক্রিয়ই থেকে যায়। ইন্দোচীন কম্যুনিষ্ট বিজয়ের পটভূমিতে ১৯৭৬ সালে বালীতে অনুষ্ঠিত আসিয়ান সরকার প্রধানদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে দুটি গুরুত্বপুর্ণ দলিল গৃহীত হয়। দলিল দুটি হচ্ছে ক) বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি এবং খ) আসিয়ান কনকর্ড ঘোষণা। রাজনৈতিক সহযোগিতার বিষয়টিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য বালী সম্মেলন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপুর্ণ। আসিয়ান কনকর্ড এ যৌথ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আসিয়ান এর ভূমিকার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করা হয় এবং শান্তির এলাকা ফর্মুলাটি এতে অন্তর্ভূক্ত হয়। সংস্থা রাজনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সযযোগিতা অর্জনের প্রয়াস পায়। কিন্তু সংস্থার আদর্শগত পরিচয় এর ভৌগলিক বিস্তারের পক্ষে বাধা হয়ে দাড়াঁয়, যা এ ধরণের সহযোগিতার বৃহত্তর কাঠামো প্রস্তুত করতে পারে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য আরো সীমিত যৌথ উদ্যেগ নেয়া হয়। আসিয়ান কনকর্ড- এ আন্তঃ আঞ্চলিক বিরোধ শান্তিপুর্ণ উপায়ে নিস্পত্তির বিষয়টি উল্লেখিত হয়। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বালীতে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে আঞ্চলিক নিস্পত্তির জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা সম্পন্ন হাই কাউন্সিল (High Council) এর ব্যবস্থা রাখা হয়।

১৯৭৮ সালের ২৫শে ডিসেম্বর ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া আক্রমণ করে। ভিয়েতনাম এর কম্বোডিয়া দখল থাইল্যান্ড এর নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করে। জাতীয় সার্বভৌমত্বের পবিত্রতার ধারণা যা আসিয়ান এর বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তিতে সন্নিবেশিত ছিল তাও এই দখলদারীত্বের বিরোধীতা করে এবং কম্বোডিয়া হতে ভিয়েতনামী সৈন্য অপসারণের দাবী জানায়। ১৯৮৩ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর জাকার্তায় অনুষ্ঠিত সভায় আসিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রিরা কম্বোডিয়ার স্বাধীনতার জন্য আবেদন জানান। অন্যান্য বিষয়ের সংগে আসিয়ান এর অব্যাহত চাপ কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামী সৈন্য অপসারণকে ত্বরান্বিত করে।

আসিয়ান ঃ সাংগঠনিক কাঠামো

১) বার্ষিক মন্ত্রি পর্যায়ের সভা

বার্ষিক মন্ত্রি পর্যায়ের সভা আসিয়ান দেশগুলোর পররাষ্ট্র মন্ত্রিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এটা আসিয়ান এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা এবং এর সভা পর্যায়ক্রমে সদস্য দেশগুলোতে বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয়।

২) **স্ট্যান্ডিং কমিটি**

দুটি বার্ষিক মন্ত্রি-পর্যায়ের সভার মধ্যবর্তী সময়ে স্ট্যান্ডিং কমিটি আসিয়ান এর দৈনন্দিন কাজ নির্বাহ করে থাকে। পরবর্তী বার্ষিক মন্ত্রি পর্যায়ের সভা যে দেশে অনুষ্ঠিত হবে সে দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রি এবং সে দেশে নিযুক্ত অন্যান্য আসিয়ান দেশের রাষ্ট্রদূতগণ স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য। স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রতি দু'মাসে একবার মিলিত হয়ে আসিয়ানের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে এবং বার্ষিক মন্ত্রি পর্যায়ের সভার প্রস্তুতি নেয়।

৩) **মহাপরিচালক, আসিয়ান এর কার্যালয়**

এটা প্রতিটি সদস্য দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে আসিয়ান এর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৪) **সরকারী কর্মকর্তা পর্যায়ের নয়টি কমিটি**

কমিটিগুলো তাদের কাজের জন্য স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে বার্ষিক মন্ত্রি পর্যায়ের সভার কাছে দায়ী থাকে। কমিটিগুলোর কাজ হচ্ছে আসিয়ান কর্মসুচি সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করা এবং কর্মসুচি বাস্তবায়ন করা।

৫) **রাষ্ট্র/সরকার প্রধান পর্যায়ের সভা**

এটা আসিয়ান এর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। প্রয়োজন অনুযায়ী এর সভা আহ্বান করা যায়। এই সভায় অতীত কার্যাবলী পর্যালোচনা করা হয় এবং ভবিষ্যত কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়।

৬) **আসিয়ান সচিবালয়**

আসিয়ান সচিবালয় জাকার্তায় অবস্থিত। একজন মহাসচিব এর নেতৃত্ব দেন। সচিবালয় বার্ষিক মন্ত্রি পর্যায়ের সভা ও স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার প্রয়োজনীয় কাজ করে থাকে। এর মুল দায়িত্ব হচ্ছে সকল কমিটির মাঝে যোগসুত্র হিসেবে কাজ করা, বিভিন্ন কর্মসুচির মাঝে সমন্বয় সাধন করা, অনুমোদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটর করা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য পরিকল্পনা ও কর্মসুচি প্রণয়ন করা।

সার্ক ও আসিয়ান ঃ তুলনা

১. ব্যাংকক ঘোষণা ও নয়া দিল্লী ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল সদস্য দেশগুলোর সহযোগিতার কতগুলো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পুরণে একত্রিত হওয়ার বিষয়টি জানানো;

২. উভয় দলিলেই বলা হয় সংস্থাটি হবে আন্তঃ সরকার (Inter-governmental) সংস্থা জয়সক্ষত-শত্যভষশতর সংস্থা নয়।

৩. উভয় দলিলেই নিজস্বভাবে পরাশক্তি সংযোগ ও পরাশক্তি মৈত্রী থেকে সংস্থাকে দুরে রাখা হয়েছে ;

৪. আসিয়ান এ কোন সদস্য রাষ্ট্রকে ভেটো ক্ষমতা দেয়া হয়নি। সার্ক এর ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে কার্যত সকল সদস্য রাষ্ট্রকেই ভেটো ক্ষমতা দেয়া হয়েছে

৫. সার্ক এর ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় ও বিতর্কিত বিষয়গুলোকে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। আসিয়ান এর ক্ষেত্রে এ ধরণের কোন বিধি নিষেধ নেই। আসিয়ান এর ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে প্রভাবিত করে অথবা আঞ্চলিক শান্তি বিঘ্নিত করে এমন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মন্ত্রি পর্যায়ের একটি High Council এর ব্যবস্থা রাখা রয়েছে ;

৬. সার্ক ও আসিয়ান উভয়ের সদস্য পদ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অন্যান্য দেশের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে ;

৭. আসিয়ান স্ট্যান্ডিং কমিটি এএমএম (AMM) এর স্বাগতিক দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রি এবং অন্যান্য সদস্য দেশের রাষ্ট্রদূতদের সমন্বয়ে গঠিত। সার্ক স্ট্যান্ডিং কমিটি পররাষ্ট্র সচিবদের সমন্বয়ে গঠিত স্ট্যান্ডিং শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনকারী দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ;

৮. আসিয়ান চূড়ান্ত দলিলে (Concord) সুস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। দলিলে বলা হয়েছে সদস্য রাষ্ট্রগুলো একক ও সমষ্টিগতভাবে শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষ এলাকা প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সার্ক চূড়ান্ত দলিলে (Charter) রাজনৈতিক বিষয়ের উল্লেখ নেই ;

৯. উভয় সংস্থাই সহযোগিতার কর্মসুচি বাস্তবায়নের চাইতে কর্মসুচি বাস্তবায়নের বাহন (Machinery) প্রস্তুতেই বেশী সময় ব্যয় করেছে ;

১০. উভয় সংস্থাই তাদের অঞ্চলের রাজনৈতিক নিরাপত্তার চাহিদার চাইতে অর্থনৈতিক চাহিদার দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়েছে। বিশেষতঃ সামরিক দিকে খুব সামান্যই দৃষ্টি দেয়া হয়েছে ;

১১. উভয় সংস্থার ক্ষেত্রেই সহযোগিতার ফল প্রত্যাশার চেয়ে কম হয়েছে;

১২. সদস্য দেশসমুহের মাঝে আয়তনগত ও জনসংখ্যার বৈষম্য সার্ককে যতখানি প্রভাবিত করেছে, আসিয়ানকে ততখানি করেনি;

১৩. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিরোধ সার্ক ও আসিয়ান উভয় সংস্থার অগ্রগতিকেই ব্যাহত করেছে। মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইনের মধ্যকার সাবাহ বিরোধ আসিয়ান এর অগ্রগতিকে প্রভাবিত করেছে। ঠিক তেমনি কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধ সার্ক এর অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে ;

১৪. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে সার্ক অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থা (সাপটা) গত ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৫ থেকে কার্যকর হয়েছে। ২২৬টি পণ্য বর্তমানে এর আওতাভুক্ত। সদস্য রাষ্ট্রগুলো এসব পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে পরস্পরকে বিশেষ শুল্ক রেয়াত দিতে সম্মত হয়েছে ;

১৫. আসিয়ান দেশগুলো ১৯৯২ সালের সিংগাপুর ঘোষণায় আসিয়ান অবাধ বাণিজ্য এলাকা (ASEAN Free Trade Area) গঠনের সিদ্ধান্ত জানায়। তারা শিল্পজাত দ্রব্য এবং প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক হার ১৯৯৩ সালের জানয়ারী থেকে পনেরো বছরের ভিতর ০-৫% এ কমিয়ে আনার ব্যাপারে একমত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে এই সময়সীমা দশ বছরে কমিয়ে আনা হয়।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে সার্ক ও আসিয়ান এর মাঝে তুলনামুলক আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। আশি ও নব্বই এর দশকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আসিয়ান দেশগুলোর অভূতপুর্ব অগ্রগতি, আসিয়ানকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি সফল আঞ্চলিক সংস্থার ভাবমূর্তি এনে দিয়েছে। উত্তরের শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে দর কষাকষিতে আসিয়ান দেশগুলোর যৌথ অবস্থান তাদের

অনেকখানি সুবিধাজনক পর্যায়ে উন্নীত করেছে । যদিও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও আসিয়ান দেশগুলোর মধ্যকার আন্তঃ আঞ্চলিক বাণিজ্যের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়নি । এ কারণে অনেকে আসিয়ানকে একটি সফল আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন । তথাপি সংস্থাটির রাজনৈতিক সুফল নিয়ে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই । আসিয়ান সৃষ্ট রাজনৈতিক সদিচ্ছার কারণে আসিয়ান দেশগুলো বিগত তিন দশক পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদ থেকে অনেকখানি মুক্ত থেকেছে যা তাদের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ যুগিয়েছে ।

অপরদিকে সার্ক এর বয়স এক দশক পুর্ণ হলেও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে এর ভাবমুর্তি তেমন উজ্জ্বল নয় । সংস্থাটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করলেও এর সদস্য দেশগুলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চমকপ্রদ অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হননি । সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার আন্তঃ আঞ্চলিক বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়নি । সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার বিবাদ নিরসনেও সংস্থাটি কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি । কাজেই নবীণ সংস্থা সার্ক তার চেয়ে পরিণত সংস্থা আসিয়ান এর সাফল্য ও ব্যর্থতা থেকে অনেক কিছুই শিক্ষণীয় হিসেবে নিতে পারে ।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Nasir A. Naqash, SAARC : Challenges and Opportunities, Ashis Publishing House, New Delhi, 1994.

2. Emajuddin Ahmed & Abdul Kalam (eds.), Bangladesh, South Asia and the World, Academic Publishers, Dhaka, 1992.

3. Bhabani Sen Gupta (ed.) SAARC-ASEAN: Prospects and Probvlems of Inter-regional cooperation, South Asian Publishers, New Delhi, 1988.

4. Michael Leifer, ASEAN and the Security of South-East Asia, Routledge, London and New York, 1989.

5. SAARC In Brief, Information and Media Wing of SAARC Secretariat, Kathmundu, 1995.

6. Anu, Mahmud, Economic Benefits of SAPTA, The Independent, January, 24-25, 1996.

7. Jhon Ravenhill, Economic Cooperation in South-East Asia Changing Incentives, Asian Survey, Vol. XXXV, No. 9, September 1995.

8. E Sudhakar, SAARC : Origin Growth and Future, Gyan Publishing House, New Delhi, 1994.

BANGLADESH - INTERNATIONAL TRADE PACTS

Dr. Shah M. Farid
Secretary

1.0 WORLD TRADE ORGANIZATION

1.01 INTRODUCTION

(1) The WTO was established on 01 January, 1995 . It is the embodiment of Uruguay Round results and the successor to the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

(2) Out of potential membership of 152 countries and territories, 76 governments including Bangladesh became members of the WTO on its first day. Present membership 129. A number of countries awaiting membership including China.

1.02 DEFINITION

WTO is the legal and institutional foundation of the multilateral trading system. It provides the principal contractual obligations determining how governments frame and implement domestic trade legislation and regulations. It is the forum in which trade relations among countries evolve through collective debate, negotiation and adjudication.

1.03 WTO AND GATT

The WTO is not a simple extension of GATT. On the contrary, it not only completely replaces its predecessor but also has a very different character. Among the principal differences are the following:-

(1) The GATT was a set of rules with no institutional foundation, but the WTO is a permanent institution with its own secretariat.

(2) The GATT was applied on a "Provisional Basis", but the WTO commitments are full and permanent.

(3) The GATT rules apply to trade only in goods. The WTO covers trade in services and trade-related aspects of intellectual property in addition to goods.

(4) While GATT was a multilateral instrument, by the 1980s many new agreements had been added of a plurrilateral, and therefore selective nature. The agreements which constitute the WTO are almost all multilateral and thus, involve commitments for the entire membership.

(5) The WTO dispute settlement mechanism is much faster, more automatic, and thus much less susceptible to blockages than the old GATT system. The implementation of WTo dispute findings will also be more easily assured.

(6) GATT was an exclusively capitalist club whereas WTO is more broad based.

(7) GATT Chief Executive was always from OECD countries, whereas WTO Secretary General, although now from Italy (Mr. Renato Ruggiero) is likely to rotate like Secretary General of UNO.

1.04 FUNCTIONS OF WTO

Based in Geneva, Switzerland, in the same building where GATT was located, its essential functions are :

(1) Administering implementing the trade agreements which together constitute the WTO.
(2) Acting as a forum for multilateral trade negotiations.
(3) Resolution of trade disputes.
(4) Overseeing national trade policies.
(5) Co-operating with other international institutions involved in global economic policy making.

1.05 PRINCIPLES OF WTO

(1) Trade without Discrimination;
(2) Predictable and Growing Access to Markets;
(3) Promoting Fair Competition;

(4) Encouraging Development and Economic Reform;

1.06 Performance of WTO was assessed in its first ever Ministerial level meeting held in Singapore during 09-13 December, 1996. Prior to that, Commerce Ministers from 28 LDCs including Bangladesh, met in Geneva during 13-15 November, 1996 to formulate a common strategy for the Singapore conference Main achievements of Singapore meeting are :

(1) Adoption of Singapore ministerial declaration, which reaffirms WTO members support of the multilateral trading system and sets out the WTO work programme for the next few years.

(2) Adoption of a comprehensive and integrated WTO Plan of Action for the Least Developed Countries.

2.0 UNCTAD

2.01 General Assembly of United Nations adopted a resolution in December 1962 calling for a conference in 1964 to minimise confrontation and conflicts and to increase co-operation among the member countries in the field of trade and development. In that conference UNCTAD was established as a permanent institution. Argentine economist Rual Prebisch was the founder Secretary General. Present Secretary General Rubens Ricuperu.

2.02 OBJECTIVES

(a) To promote international trade and economic development of developing countries.

(b) To promote trade & economic co-opearation particularly between countries at different stages of economic development between developing countries and between countries with different economy and social systems.

(c) To formulate principles and policies on international trade and development.

(d) To promote a more equitable international economic order-NIEO-NORTH-SOUTH DIALOGUE.

2.03 THREE ORGANS

(1) The Conference

(2) Trade and Development Board (ECDC, Committee on commodity, shipping, transfer of Tech.) Meets twice a year. It is the executive body of UNCTAD

(3) Secretariat.

2.04 Nine sessions have been held so far, ninth session in Midrand (South-Africa) during 27 April- 11 May, 1996 on"Promoting Growth and Development in a Globalizing and Liberalizing World Economy". In 1996, total membership 188.

জাতীয় শক্তি-এর নির্ধারক উপাদান সমূহ

- মুহাম্মদ আব্দুল কাদের
উপ-পরিচালক, বিপিএটিসি

সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড তথা কুটনৈতিক কর্মকান্ডের মুল চালক হলো শক্তি বা ক্ষমতা। সাম্রাজ্যে - সাম্রাজ্যে, জাতিতে- জাতিতে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে, বা যুগ যুগ ধরে যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছে - তাই মুলতঃ পারস্পরিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে যুগ যুগ নিয়ন্ত্রণ করেছে। N.D. Palmer and H.C. Perkins বলেছেন 'আন্তর্জাতিক রাজনীতির মুল উপাদান হলো 'শক্তি'। বিশ্ব ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, যেই রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য তত বেশি শক্তিশালী ছিল বা প্রভাবশালী ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সেই রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য তত বেশি শক্তিশালী বা প্রভাবশালী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। যেমন, রোমান সাম্রাজ্য, ওসমানীয়া সাম্রাজ্য, বৃটিশ সাম্রাজ্য, সময়ে সময়ে ব্যাপক শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসাবে বিশ্ব প্রেক্ষপটে নিজেদেরকে প্রতিভাত করেছিল। অতীতে অনেক সময় রাষ্ট্রকে শক্তি হিসাবে চালিয়ে দেয়া হতো। সে সময় অবশ্য জাতীয় শক্তির ধারনাটি বিমুর্ত ছিল। তবে শক্তির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পেত। জাতীয় শক্তি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ এর আগে 'শক্তি' বলতে কি বুঝায় তা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। Hans J. Morganthu এর মতে রাজনৈতিক দিক দিয়ে শক্তি হলে¡ "The Power of a man over the minds and actions of other man.' এখানে লক্ষ্যণীয় যে, শক্তি বা power বলতে influence কে বা প্রভাবকে বুঝানো হয়নি, আবার শক্তি বা power কে শুধুমাত্র force বা বলকে বুঝানো হয়নি। অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রভাব বা বলকে শক্তি হিসাবে বুঝালে ভুল করা হবে। কারণ Influence হলো শক্তিহীন প্রভাব, আর force বলতে সাধারণভাবে উগ্র শক্তিকে বুঝানো হয়। তাই শক্তি হলো 'একটি মানুষ বা একটি জাতির সেই সামর্থ্য যা অন্য মানুষ বা অপর জাতির ইচ্ছা শক্তি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উপরে প্রভাব বিস্তার করতে অথবা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে' (That capacity of a man or a Nation to Influence or control the decision or wills of other man or nations).

এ কারণে বর্তমানে বিশ্বের প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ট্র তাদের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য শক্তি অর্জনের চেষ্টা চালায়। তাত্ত্বিকভাবে যদিও বলা হয় আধুনিক রাষ্ট্রগুলি কল্যানমুখী রাষ্ট্র হওয়ায় শক্তি অর্জন বা প্রয়োগ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য নয়, তবুও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা বা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে বা কোন রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে শক্তিকে বাদ দেয়া যায় না। এ জন্যেই রাষ্ট্রকেই অনেক সময় শক্তি হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যেমন কিছুদিন আগেও দু'টি শক্তিশালী রাষ্ট্রকে বৃহৎ শক্তিদ্বয় হিসাবে অভিহিত করা হতো।

এবার জাতীয় শক্তি বলতে কি বুঝায় - তা সংজ্ঞায়নের প্রচেষ্টা চালানো হবে। 'জাতীয় শক্তি' প্রত্যয়ের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন রকমের প্রতিকল্প প্রণয়নের চেষ্টা চালিয়েছেন। বার্ট্রান্ড রাসেল শক্তিকে চার ভাবে বিভক্ত করে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তার মতে শক্তি হলো ঃ ১. Nacked Power, ২. Economic Power, ৩. Revolutionary Power, ৪. Power over Opinion or Propaganda অন্যদিকে E.H. Carr বলেন শক্তি মুলতঃ তিন রকমের ঃ ১. Military Power, ২. Economic Power, ৩. Power over Opinion or Propaganda.

অধ্যাপক লার্চ এর মতে জাতীয় শক্তি হলো 'এক বা একাধিক রাষ্ট্রের উপরে একটি রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা ও নিজের উপরে অন্য রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাকে প্রতিহত করার সামর্থ্য, "National Power may be defined as the sum total of the strength and capabilities a state harnessed and applied to the advancement of its national interests and the attainment of its national objectives".

অর্থাৎ জাতীয় শক্তি হলো একটি দেশে বা একটি সমাজে বা একটি জাতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে শক্তিগুলি বিদ্যমান তাদের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে গৃহিত একটি সমষ্টিগত রুপ। এটা অবশ্য ঠিক যে, রাষ্ট্র কর্তৃক জাতীয় স্বার্থ অর্জনের কাজে ব্যবহৃত ক্ষমতা বা শক্তি মুলতঃ পরিবর্তনশীল। এক সময়ের প্রতাপশালী মুসলিম সাম্রাজ্য আজকে একটি দুর্বল শক্তিতে পরিণত হয়েছে। বৃটিশরা তাদের জাতীয় শক্তি বলে সমগ্র বিশ্বে শাসন কার্য পরিচালনা করতো। সেই বৃটিশদের শক্তি আজকে মিয়মান। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর দেশ হিসেবে নিজেকে আবির্ভুত করেছে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্র এবং শক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় শুধু সামরিক শক্তিকে জাতীয় শক্তি বললে ভুল হবে। কারণ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে অন্য রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করা যায় বা দখলও করা যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক সাহায্য বা চাপ এবং অথবা রাজনৈতিক সমর্থন বা বিরোধীতা দ্বারা নানাভাবে একটি শক্তিশালী জাতিকে প্রভাবিত করা যায়। যেমন ইরাকের উপরে অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক অবরোধ আরোপ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের অর্থনীতিকে পর্যুদস্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। আবার তথ্য প্রবাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা একটি জাতি বিশ্ব প্রেক্ষাপটে উল্লেখযোগ্য অবস্থানে যেতে পারে।

জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহ

জাতীয় শক্তি বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করে। এই উপাদানগুলি সময়ের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন উপাদানের চিরস্থায়ীত্ব দাবী করা যায় না। পৃথিবীতে কোন কোন রাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষমতা অনুযায়ী বিশ্ব রাজনীতিতে ভূমিকা নিতে পারে। আবার অনেকে স্বীয় দুর্বলতার জন্য বিশ্ব রাজনীতিতে সামান্যতম ভূমিকাও নিতে পারে না। জাতীয় শক্তির উপাদান নিয়ে আলোচনায় Morganthau বলেন যে, জাতীয় শক্তির উপাদান দু'রকম হতে পারে। ১. Elements, or tangible elements অর্থাৎ স্থায়ী উপাদানসমূহ ঃ যেমন- ক) ভূ-প্রকৃতি, খ) প্রাকৃতিক অবস্থান, গ) আয়তন। ২. Man made elements or intangible elements অর্থাৎ মানব সৃষ্ট বা অস্থায়ী উপাদান সমূহ।

অধ্যাপক অর্গানসকি বলেন যে, জাতীয় শক্তির উপাদানগুলি দু'রকমের। ১. Natural অর্থাৎ প্রাকৃতিক, যেমন-ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি ২. Social determinants বা সামাজিক নির্ধারকসমূহ, যেমন-নেতৃত্ব জনগণের চরিত্র, অর্থনৈতিক নীতি ইত্যাদি।

অধ্যাপক হার্টম্যান এর মতে জাতীয় শক্তির উপাদান হলো মোট ৯টি।

i) Demographic elements ii) Geographic elements

iii) Economic elements iv) Historical elements

v) Psychological elements vi) Organizational elements

vii) Administrative elements viii) Sociological elements

ix) Military

N.D. Palmer & H.C. Parkins এর মতে জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহ হলো। ক) ভৌগলিক, খ) প্রাকৃতিক সম্পদ, গ) জনসংখ্যা, ঘ) প্রযুক্তি, ঙ) আদর্শ, চ) নৈতিকতা এবং ছ) নেতৃত্ব।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় শক্তি বেশ কিছু উপাদানের উপর নির্ভরশীল। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে জাতীয় শক্তির উল্লেখযোগ্য উপাদানসমূহ নিয়ে এখন আলোচনা করবো।

১. **ভৌগলিক অবস্থা ঃ** কোন দেশের জাতীয় শক্তি ভৌগলিক অবস্থার উপরে বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কোন দেশের ভৌগলিক অবস্থানগত সুবিধা এবং অসুবিধা সে দেশের জাতীয় শক্তির নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। যেমনঃ ভৌগলিক কারণে কম্পুচিয়া পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। এশিয়া এবং ইউরোপ থেকে দূরে থাকার কারণে এবং সমুদ্র বেষ্টিত হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে বিকশিত হতে পেরেছে। অনুরূপভাবে ইংলিশ চ্যানেল দ্বারা বৃটেন ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বৃটেনের জাতীয় শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিক আল্পস্ পবর্তশ্রেণী দ্বারা ইউরোপ হতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্বেও তার জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পায়নি কারণ আল্পস্ পর্বতমালার উপত্যকা সমুহের দক্ষিণ দিকে বালুময় থাকায় মধ্য ইউরোপ থেকে ইতালীকে আক্রমণ করা সহজ। কিন্তু ইতালী থেকে মধ্য ইউরোপকে আক্রমণ করা সহজ নয়। তাই ইতালী উত্তর দিক হতে অনেক বার আক্রান্ত হলেও ইতালী পাল্টা অভিযান চালাতে পারেনি। ভৌগলিক উপাদানকে কয়েক দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারেঃ-

ক) **আয়তন ঃ** কোন দেশের আয়তন তার জাতীয় শক্তি নির্ধারক হিসাবে কাজ করে। বৃহদায়তন বিশিষ্ট রাষ্ট্রগুলির প্রতিরক্ষা সংগঠন জোরদার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সুবিধা থাকায় এসব রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পায়। আয়তন বৃহৎ হওয়ায় ১৮১২ সালে নোপোলিয়ানের এবং পরবর্তীকালে হিটলারের আক্রমণ থেকে রাশিয়া রক্ষা পেয়েছিল। বৃহদায়তন বিশিষ্ট হওয়ার রুশ বাহিনী পশ্চাদপসারণ করে পুনঃ শক্তি সঞ্চয় করে শত্রুর মোকাবিলা করতে পেরেছিল।

খ) **অবস্থান ঃ** কোন দেশের ভৌগলিক অবস্থান সে দেশের জাতীয় শক্তি নির্ধারণে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। দ্বীপ, উপদ্বীপ, উপকূলবর্তী বা স্থল বেষ্টিত সব রকম দেশের জন্যই কতিপয় সুবিধা-অসুবিধা আছে। যেমন- জাপান ও বৃটেনের অবস্থান সমুদ্রের পাশে হওয়ায় তাদের শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। আবার বাংলাদেশ ও রাশিয়ার স্থলবেষ্টিত অবস্থান জাতীয় শক্তির বিকাশে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করেছে।

গ) **ভু-প্রকৃতি ঃ** জাতীয় শক্তির বিকাশে ভু-প্রকৃতি অনেক সময় সহায়ক হিসাবে কাজ করে। পাহাড়, নদী, সমুদ্র বেষ্টিত দেশগুলির প্রতিরক্ষা তথা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে ভু-প্রকৃতি সহায়ক হিসাবে কাজ করে। অন্যদিকে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ভু-গঠন প্রকৃতি জাতীয় শক্তিকে প্রভাবিত করে থাকে। যেমন- আমেরিকার ভু-গঠন সহজে চলাচলযোগ্য হওয়ায় তা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। অন্যদিকে চীনের ভু-প্রকৃতির গঠন প্রতিকূলতাপুর্ণ হওয়ায় জাতীয় শক্তির প্রসারে ততটা সহায়ক নয়।

ঘ) **জলবায়ুঃ** একটা দেশের জলবায়ু তার জাতীয় শক্তি নির্ধারণে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সাধারণতঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ুতে অবস্থিত দেশের জাতীয় শক্তি আনুপাতিক হারে বেশি হয়। দেখা গেছে যে অত্যাধিক শীত ও গরম কোনটাই জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক নয়।

২. **প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ** প্রাকৃতিক সম্পদ একটা দেশের জাতীয় শক্তির হ্রাস বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক বিস্তার করে। জাতীয় সম্পদের উপরে প্রভাব বিস্তারকারী প্রাকৃতিক সম্পদকে আলোচনার সুবিধার্থে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

ক) **খাদ্য ঃ** খাদ্য হলো মানব দেহের শক্তির যোগান দাতা। তাই কর্মঠ ও সামরিক বাহিনীতে কাজ করার মত শক্তি সম্পন্ন মানুষকে খাদ্যের উপরে নির্ভরশীল হতে হয়। যে দেশ খাদ্য সম্পদের দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পুর্ণ সেদেশ বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাবশালী হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে। যেমন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাদ্যে স্বায় সম্পুর্ণ হওয়ায় সেদেশের জাতীয় শক্তির প্রাচুর্য রয়েছে বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে সর্ববৃহৎ শক্তি হিসাবে বিকশিত হতে পেরেছে। আবার জার্মানীর খাদ্য উৎপাদনে স্বয় সম্পুর্ণতা না থাকায় দু'টি বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল যা তার সমর কৌশলের উপরে প্রভাব ফেলে। আবার বৃটেনের খাদ্যের জন্য পরনির্ভরশীলতা থাকায় খাদ্যের আমদানীর পথকে নিরাপদ রাখতে বৃটেনকে সর্বদাই সচেষ্ট থাকতে হয়েছে।

খ) **খনিজ সম্পদ** ঃ বিশ্বের যান্ত্রিক উন্নতির সাথে সাথে খনিজ দ্রব্যাদির তথা শক্তির উৎস হিসাবে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় আমেরিকা, চীন, ইরান প্রভৃতি দেশ বিশ্ব রাজনীতিতে শক্তিধর অবস্থানে আসতে পেরেছে।

৩. **শিল্পের ধারন ক্ষমতা** ঃ বর্তমান বিশ্বে প্রাকৃতিক বা খনিজ সম্পদের অধিকারী হলেই জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি ঘটবে একথা আশা করা যায় না। যেসব দেশের শিল্পের ধারণ ক্ষমতা বেশি সেসব দেশই অধিকতর শক্তিশালী অবস্থানে যেতে পেরেছে। যেমন- কঙ্গো প্রচুর পরিমানে খনিজ সমৃদ্ধ দেশ হলেও শিল্প ক্ষেত্রে অনগ্রসর হওয়ায় তার জাতীয় শক্তি তেমন বৃদ্ধি পায়নি। অপরদিকে শিল্প বিপ্লবের পর পর বৃটেনের সমান শক্তি সম্পন্ন কোন দেশই ছিল না। আবার শিল্প প্রতিষ্ঠান বিকাশে আমেরিকা সফল হওয়ায় তার জাতীয় শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. **প্রযুক্তি** ঃ বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিগত উন্নতি জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। জাতীয় শক্তির অন্যান্য উপাদান উপস্থিত থাকলেও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ব্যতিত জাতীয় শক্তির যথাযথ বিকাশ সম্ভব নয়। যেমন-মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি আজকে পর্যাপ্ত পরিমানে খনিজ তেলের অধিকারী হওয়া সত্বেও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণে তারা বিশ্ব রাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থানে আসতে পারেনি।

৫. **লোক সংখ্যা বা জনবল** ঃ জনসংখ্যা বা মানবিক শক্তি জাতীয় শক্তিকে প্রভাবিত করে থাকে। বর্তমান বিশ্বে নানাবিধ কারণে শিল্প উৎপাদন, সামরিক বাহিনীর গঠন ইত্যাদি কারণে জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি বা বিকাশে জনবল গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় শক্তির উপরে জনসংখ্যার প্রভাব বিভিন্নভাবে দেখা যায় ঃ

ক) **জনগণের গুণাবলী** ঃ জনসাধারণের দক্ষতা বা গুণ জাতীয় শক্তি বর্ধনে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। জনসাধারণকে অবশ্যই শক্তিবান ও কর্মক্ষম হতে হবে। প্রযুক্তি বিদ্যায় পারদর্শী এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকজন জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। যেমন-জাপানের জনসংখ্যা কম হলেও জনগণের দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠা জাপানের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

খ) **জনসংখ্যার পরিমান** ঃ প্রযুক্তিগত উন্নতি ও যান্ত্রিক উৎকর্ষতা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও জনসংখ্যার পরিমাণ জাতীয় শক্তির নির্ধারণে আজও গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সামরিক বাহিনীর বিকাশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তথা জাতীয় শক্তির বৃদ্ধিতে জনসংখ্যার পরিমান বিশেষ ভুমিকা পালন করে থাকে। ঘন বসতিপুর্ণ এলাকায় বিদেশী শত্রুর অভিযান প্রায়শঃই বাধাগ্রস্থ হয়। ১৮০০ সালে যে ফ্রান্স অধিক জনসংখ্যার জন্য সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল সেই ফ্রান্সই আবার ১৮৬৯ সালে জার্মানীর সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের কারণে জার্মানীর নিকট পরাজিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামরিক শক্তি তথা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফ্যাসিস্ট ইতালী এবং নাৎসী জার্মানী নিজ নিজ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করেছিল।

৬. **আদর্শ ঃ** জাতীয় শক্তির বিকাশে আদর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। আদর্শ ভিন্ন কোন জাতি যে রকম সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না তেমনিভাবে সে জাতির শক্তি বৃদ্ধিও ঘটে না। আমরা জানি যে চীনারা একমাত্র আদর্শের বলে উজ্জীবিত থেকে ভারতের তুলনায় একদশমাংশ প্রযুক্তি ও শিক্ষা নিয়ে ভারতের সমসাময়িক কালে স্বাধীনতা অর্জন করে অনেক বেশি পরিমান উন্নতি অর্জন করেছে। আবার জার্মানরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেরে গেলেও নাৎসীবাদের আদর্শ নিয়ে তারা সাফল্য অর্জন করেছে। অন্যদিকে দৃঢ়আদর্শিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বাংলাদেশের জাতীয় শক্তি তেমন একটা বিকশিত হতে পারেনি। উল্টো দিকে ইরান সৃদৃঢ় আদর্শিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্যাপকভাবে উন্নতি অর্জনে তথা শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে বিকশিত হতে সক্ষম হয়।

৭. **জাতীয় চরিত্র ও মনোবল ঃ** জাতীয় চরিত্র ও মনোবল জাতীয় শক্তির বিকাশে বিশেষ ভুমিকা পালন করে থাকে। প্রত্যেকটি জাতিরই একটি নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে যা উপেক্ষা করে কোন জাতি রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তি নিরূপণ করা যায় না। Margganthu মনে করেন যে, ইংরেজ ও মার্কিনরা যুদ্ধের প্রতি অনীহা দেখায় বলে সেসব দেশের সরকার সাধারণভাবে জঙ্গী মনোভাব থেকে নিজেকে বিরত রাখতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে জার্মান জাতি যুদ্ধবাজ হওয়াতে জার্মান সরকার জঙ্গী মনোভাব দেখায়। আবার চীনাদের 'Isolation Policy'

তাদের জাতীয় চরিত্রেরই প্রতিফলন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী হিটলার কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলে ফ্রান্সের মনোবল ভেঙ্গে যায় যা ফ্রান্সের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপান ও জার্মান অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের ব্যবধানে তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষতা তথা মনোবলের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠে।

৮. **নেতৃত্ব ঃ** জাতীয় শক্তির অন্যতম উপাদান হিসাবে নেতৃত্বকে বিবেচনা করা হয়। কোন জাতি কি করতে পারবে বা কতদুর সাফল্য অর্জন করতে পারবে তা অনেকখানি নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে। কারণ জাতীয় শক্তির বিভিন্ন উপাদানকে সমন্বিত করে দেশকে একটি শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দৃঢ় ভিত্তিক জাতীয় নেতৃত্বের দরকার। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দিক থেকে এগিয়ে থেকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার শক্তি দুর্বল হয়ে আসে। অন্যদিকে যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটোর যোগ্য নেতৃত্বের কারণে বিশ্ব দরবারে শক্তিশালী দেশ হিসেবে যুগোশ্লাভিয়া নিজেকে বিকশিত করতে পেরেছিল।

৯. **কূটনৈতিক যোগ্যতা ঃ** কোন জাতির কূটনৈতিক যোগ্যতা বা গুণ তাকে শক্তিশালী হিসাবে বিকশিত করতে সাহায্য করে। যেমন কূটনৈতিক যোগ্যতার বলে ভিয়েতনাম এক সাথে চীন ও রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে আমেরিকাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। অন্যদিকে কাম্পুচিয়ার বিপর্যয়ের জন্য তার কূটনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন নেতৃত্বের অভাবকে দায়ী করা যায়।

১০. **রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ঃ** কোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি যদি ব্যাপক জন সমর্থন থাকে অর্থাৎ যদি তার সরকার বৈধতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেই সরকার ব্যবস্থা জাতীয় শাক্তর বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। যেমন আমেরিকা বা গ্রেট বৃটেনের সরকার ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক অবস্থা অর্থাৎ একটি দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পদের বন্টন ব্যবস্থা যদি জনকল্যাণমুখী হয় তবে তা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করে। অনুরূপভাবে একটি রাষ্ট্রের সামাজিক ব্যবস্থা যদি জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং সেই দেশের জাতীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ হয় তবে স্বভাবতঃই সেই দেশের জাতীয় শক্তি কাঙ্খিত মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

১১. **সামরিক প্রস্তুতি ঃ** কোন দেশের জাতীয় শক্তি, প্রত্যক্ষভাবে সামরিক শক্তির উপরে নির্ভরশীল। অধ্যাপক এর ভাষায় সামরিক প্রস্তুতি সাধারণভাবে একটি দেশের জাতীয় শক্তির উপাদান হিসাবে তিনটি দিক দিয়ে আলোচিত হতে পারেঃ-

ক) **রণ পদ্ধতি ও দক্ষতা ঃ** বর্তমান বিশ্বে সামরিক শক্তি রণ পদ্ধতি বা রণ কৌশলের উপরে নির্ভরশীল। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র, গতিশীলতা, সামরিক নেতৃত্বের দক্ষতা, মনোবল এবং বেসামরিক সমর্থনের উপরে সামরিক বাহিনীর দক্ষতা ও যোগ্যতার উপরে নির্ভর করে। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধে

সাবমেরিন ব্যবহার করে জার্মানী বৃটেনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ১৯৭৩ সালে আরব-ইজরাইল যুদ্ধে আরবরা SAM নামক সমরাস্ত্র ব্যবহার করে ইজরাইলকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

খ) গঠন ও বিন্যাস ঃ একটি দেশের সামরিক শক্তি সে দেশের গঠন ও বিন্যাসের উপরে নির্ভর করে। কত বড় বাহিনী দরকার, স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর আনুপাতিক হার কি হওয়া উচিত, কি পরিমান অস্ত্র উৎপাদন করা দরকার ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান যদি না থাকে তবে অর্থ ব্যয় সামরিক দক্ষতা ও আধুনিক সমর বিজ্ঞানের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও সামরিক প্রস্তুতি দুর্বল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ বিশালাকায় বাহিনী গঠন একটি দেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করে থাকে।

গ) **নেতৃত্ব** ঃ সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব বিশেষভাবে জাতীয় শক্তিকে প্রভাবিত করে। সামরিক বাহিনীর যদি যোগ্যতা সম্পন্ন সংগঠন থাকে তবুও নেতৃত্বের অভাবহেতু সেই সামরিক শক্তি জাতীয় শক্তিতে তেমন অবদান রাখতে পারে না। ফ্রেডরিক দ্যা গ্রেট এর মত একজন সমর বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে প্রশিয়ার সামরিক বাহিনী বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় শক্তি উক্ত উপাদানসমূহের উপরে কম বেশি নির্ভর করে থাকে। তবে জাতীয় শক্তির উপাদানসমুহ সময়ের পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। ফলে উপরোক্ত উপাদানগুলি ব্যতীত অন্যান্য উপাদান দ্বারা ও জাতীয় শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করতে পারে। যেমন অতীতে কয়লা খনিজ সম্পদ হিসেবে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করায় জাতীয় শক্তির নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু বর্তমানে খনিজ তৈল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে কাজ করছে। জাতীয় শক্তির মাত্রা পরিমাপের জন্য যেহেতু একটা যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি নাই সেহেতু এই উপাদানগুলিও আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল। সেইজন্য জাতীয় শক্তির উত্থান-পতন ও বিকাশ জাতীয় শক্তির পরিমাপ করার ক্ষেত্রে কোন একটি উপাদান নয় বরং সবগুলি উপাদানকে সমন্বিতভাবে দেখা বা বিচার করা উচিত। যদিও জাতীয় শক্তির বিকাশে কোন একটি উপাদান কোন বিশেষ সময় প্রাধান্যশীল হয়ে উঠে এবং ক্রিয়া করে যেমন জার্মানীর নাৎসী পার্টি জাতীয় চরিত্র এবং সামরিক শক্তির উপর ভিত্তি করে জার্মানীকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিনত করেছিল। কিন্তু এভাবে খন্ডিত করে দেখলে জাতীয় শক্তির অবস্থান এবং জাতীয় শক্তির পরিমাপ প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

BANGLADESH AND ITS IMMEDIATE NEIGHBORS

এ, কে, এম, সবুর
সিনিয়র রিসার্স ফেলো
বি, আই, আই, এস, এস

Owing to an array of reasons pertaining to its geography, history, ecology as well as socio-economic and politico-cultural life, South Asian countries constitute the most immediate neighbors of Bangladesh. The region remains the most significant area of importance to the country. Besides, Myanmar is also an immediate neighbour.

In this regard, India occupies the paramount position. As a matter of fact no country merits greater consideration in the conduct of Bangladesh foreign policy than India. A complex web of reasons could be held responsible for such a situation. Barring a small border with Myanmar over a highly difficult terrain in the south-east of the country, Bangladesh is surrounded by India on three sides. Its sea-routes through the Bay of Bengal are guarded by the Indian Navy with no parallel in the region. Bangladesh and India are common co-basin states in the Ganges and the Brahmaputra river basins importance of which for the very survival of Bangladesh could hardly be exaggerated.

Historically, relations between the peoples of these two countries were characterized by numerous ups and downs. They have common ethno-linguistic origin. They are common heirs to one of the greatest ancient civilizations. They have lived for centuries within the same political entity.

The list could be enlarged further. Nonetheless, the relations between the people of Bangladesh on the one hand, and that of India on the other . over a long historical period, have also been characterized by a struggle for the survival of the former and the supremacy of the later. It has deeply influenced the formation of the collective personality of the people of Bangladesh creating an adversary self-image vis-a-vis India. Even the experience of 1971 liberation war proved to be insufficient to break such a self-image.

Over the recent couple of years, relations between Bangladesh and India are characterized by the parallel existence of two opposite trends. On the one hand, sharp differences between them continue to persist over India's regional security posture and a number of bilateral issues. On the other hand efforts are being employed by both the sides, albeit with varied degree of sincerity, to bridge the differences. Simultaneously, both the countries are committed to regional cooperation within the frame work of SAARC.

1. BANGLADESH-INDIA RELATIONS

Bangladesh-India relations are characterized by the existence of a number of contentious issues which proved to be too difficult to resolve and continue to be the central concern of the leadership of both the countries. The list of such issues would be long enough.

i. the sharing of the water resources of common rivers, particularly that of the Ganges;

ii. implementation of the 1974 Land Border Agreement in general, and accord on the leasing of Tin Bigha Corridor to Bangladesh in particular;
iii. India's policy towards the ethnic insurgency in the Chittagong Hill Tracts;
iv. demarcation of maritime boundaries and the ownership of South Talpatty Island;
v. trade imbalances in favour of India;
vi. smuggling, illegal cross-border activities and a number of other issues.

The relations between Bangladesh and India have been shaped under the influence of a host of historical, geographical, ecological, socio-economic and politico-cultural factors highly contradictory in nature. While some of them warranted close ties others dictated a distant approach. In addition, some factors while creating high degree of interdependence between the two countries, also generate almost irreconcilable conflict of interests. In the circumstance, the emergence of disputes between Bangladesh and India could be viewed as natural or even inevitable. Nonetheless, the persistence of all these disputes creating such a crisis of confidence in bilateral relations for so many years and with no solution in sight looks certainly bizarre.

Answer to the questions why and how it happened is difficult to find out and could very well be controversial. However, in order to look at the future, answer to such questions are indispensable. When responsibility for something done is difficult to establish, it is better to investigate along the

question: who benefits from that ? here we could get a more or less clear picture. In comparative perspective , the degree of adverse consequences for Bangladesh and India resulting from the procrastination of the settlement of contentious bilateral issues very widely leaving the former in a much disadvantageous position. It is particularly true when one looks at the matter from strictly bilateral perspectives. For Bangladesh, economic and ecological consequences of the deadlock over the sharing of water of the Ganges alone is so critical that the very survival of the nation has, over time, been put to the question. Other issues are as well of considerable concern to her. For her, there is no option other that the early settlement of the disputes. On the other hand, India's stake in the early settlement of the disputes is viewed to be less significant if it is to be compared with that of Bangladesh. No less important point, Bangladesh remains in the receiving end of almost all the issues, while India holds the key to the solution. Such a situation has shaped India's long standing policy toward the contentious issues. Over a period of time, it has developed a policy which could be summarized as follows:

i. procrastination of the settlement of the disputes with the assumption that time would work in favour of her

ii. Creating occasional pressures on Bangladesh with a view to weakening her moral

iii. when pressure fails, displaying indifference to the sensitivities of Bangladesh.

It is a comprehensive policy approach with the ultimate objective of compelling Bangladesh to come to terms with New Delhi on the terms offered by the latter.

Lacking any viable leverage on India, Bangladesh had to depend on the goodwill of the latter which is persistently failed to demonstrate. Constrained by its predicaments, Bangladesh neither could afford confrontation with India nor it could submit to the will of the latter. In the circumstances, it had to find out a gray area between confrontation and submission which let her to avoid major crises in bilateral relations that Bangladesh could hardly afford. However, from such a gray area Bangladesh neither could compile India to find out a compromise solution to the disputes nor could it generate any concession from New Delhi. Contrary, India could compel Bangladesh to make substantial compromise on at least two issues. These are: Ganges Water; and the Tin Bigha Corridor. According to the agreement reached in April 1975, India agreed to limit its lean season withdrawal of Ganges water from 11,000 to 16,000 cusses. In 1977, the agreement was reached after nearly doubling India's withdrawal authority from 11,000 to 16,000 cusecs range to 20,500 to 26,500 cuses range. It was, however, agreed that in case of exceptionally low level of flows, Bangladesh would be guaranteed a minimum of 80 percent of the volume earmarked for it in the schedule of allocation. Subsequently, however, Indian attitude, once again, stiffened significantly. The Memorandum of Understanding (MOU) that was signed in October 1982, dropped the 80 percent guarantee clause leaving Bangladesh at the whim of India.[1] Similarly, India could compile Bangladesh to make substantial

compromise on the Tin Bigha Corridor issue as well. The agreements signed in 1982 and 1992 envisage the common louse of the corridor by both Bangladesh and India instead of lease in perpetuity to Bangladesh as it was envisaged in the 1974 agreement.[2]

Thus, as seen from bilateral perspective, the dynamics of Bangladesh-India relations reveal a rather frustrating picture for the former. However, If the complexities in Bangladesh-India relations are judged from a regional perspective, New Delhi stands nowhere better than Dhaka does. Over the recent years, Indians themselves are clearly realizing it. India is engaged in similar or even more serious disputes and conflicts with almost all of her neighbors, Pakistan, Sri Lanka and Nepal in particular. While assessing the magnitude of all these disputes taken together, their consequences for the long-standing interest of India in the region, Indian leadership could hardly avoid disappointment.

Such a situation compelled India to reconsider its regional security posture. As a matter of such a change was gradually taking shape even during the last days of Rajiv Gandhi and by the period when Narasimha Rao assumed office a considerably moderate regional security posture was evident. However, despite the replacement of India's regional security posture of the 1980s by a much more moderate one and its realization of the consequences of protracted disputes with the neighbors, Indian ability to undertake any courageous initiative with a view to resolving bilateral disputes, including those with Bangladesh, was severally circumscribed. it was due primarily to a weak government that was vulnerable to domestic

opposition and was morally blackmailed by the rising tide of Hindu nationalism almost exclusively directed against the Muslims. Whether it was sincere enough to find out solution to Bangladesh-India bilateral disputes also remains an open question. As a consequence of all these, dispute so many talks between the two countries at various levels, Bangladesh-India disputes remained virtually statemented.

However, the 1996 elections and consequential changes, seen to have put India on the Threshold of a radical change in its policy towards the neighbours. The 1996 elections unseated the Congress Party from power and exposed the severe isolation of the Hindu nationalists from the rest of the political forces in the country, and thus, brought to the power a coalition government headed by the United Front. Under the United Front Government, India has undertaken an initiative with a view to resolving the country's some of the long-standing disputes with the neighbours, and thus, improving the overall political climate in the region. The new Foreign Minister I.K. Gujral's long-standing image as a liberal gave the initiative additional credibility.

In the regional "cham offensive"[3] as launched by India, Bangladesh came out to be at the top of the agenda. Soon after the 12 June Elections in Bangladesh, a leading English daily, the Indian Express, in an editorial expressed hopes that the governments in New Delhi and the new government in Bangladesh would be able to resolve the Farakka problem.[4] In practice as well, following the change of government in both the countries, the relations between Bangladesh and India, particularly with

regard to bilateral disputes, began to move in a positive direction and that rather quickly. A series of high level visits have been exchanged between the two countries during which Indian side assured Bangladesh that "Highest authority of India wants quickest resolution of bilateral problems with Bangladesh. Indian authority is aware of the problems faced by the people of Bangladesh owing to lesser flow of water from Farakka barrage. [5] Indian Foreign Minister I.K. Gujral even expressed confidence over the signing of Indo-Bangladesh accord on the issue of the sharing of the Ganges water before the ensuing dry session. [6]

Finally, the diplomatic initiative culminated in a summit meeting between Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina and her Indian Counterpart Deve Gowda. During the summit meeting, Sheikh Hasina and Deve Gowda signed an agreement on December 12, 1996 that envisages the sharing of Ganges water between the two countries for the next 30 years. Under the new agreement Bangladesh will receive a 50 percent share of the Ganges water when the water flow at Farakka is less than 70,000 cusecs. If the flow rises beyond that level, Bangladesh is guaranteed 35,000 cusecs; if it passes the 75,000 cusecs mark, India is guaranteed 40,000 cusecs.[7] The treaty marked an end to the oldest and, by for, the homiest disputes between Bangladesh and India.

- Another area where Indo-Bangladesh relations moved in a positive direction is the CHT issue.

- The recent improvement environment of relations between the two countries seems to have far reaching consequences.

2. BANGLADESH-PAKISTAN RELATIONS

There are two major problems in relations between Bangladesh and Pakistan. These are : I. the repatriation of stranded Pakistanis; and ii. the division of common assets. A recent survey conducted by Pakistan has found at least 238,000 stranded Pakistanis in Bangladesh. With regard to the division of common asets, Bangladesh is supposed to get assets worth Rs. 24 billion after meeting the liabilities it had as a part of Pakistan until 1971.[8] Despite the existence of these disputes and Pakistan's clearly demonstrated unwillingness to settle them, relations between the two countries during the post-1975 period developed rather smoothly. If one takes into consideration internal colonialism perpetrated by the ruling elite of Pakistan in relation to Bangladesh for long twenty three years and the military crackdown of March 25, 1971 which unleashed the worst genocide and exodus in the post-War history such a smooth development of relations between the two countries would certainly look bizarre. There were , however, an array of reasons which made it possible. First and foremost is the difficulties in Bangladesh-India relations. For reasons, discussed above, Bangladesh witnessed a resurgence of anti-Indian feelings during the post-independent period. Certain ideas and personalities rejected by the Liberation War also could come to the forefront of socio-political life of the country. Pakistan took the most cynic advantage of the situation. No less important, successive regimes in Bangladesh displayed undue eagerness to

develop relations with Pakistan. As a consequence, Pakistan even did not formally regard the crimes committed by its army in Bangladesh during 1971 as ?Germany and Japan did in relation to the victims of World War II.

It is not to argue that no attempts were made to resolve the disputes over the repatriation of stranded Pakistanis and the division of common assets. Each time, following the meeting between the leaders or off ails of the two countries, hopes were raised for a solution to these problems. Such hopes , however, never came true and issues were left to uncertainty. More importantly, the pattern of behavior as displayed by successive regimes in Bangladesh in relation to Pakistan let the batter believe that it could develop relations with the former without resolving the outstanding issues which in course of time, would be taken off from the agenda of bilateral relations. As a matter or fact the issue of the division of assets no more figure prominently in bilateral talks. The stranded Pakistanis are living in Bangladesh. Primary in the cities, creating a host of additional problems with regard to employment, housing, ale and order situation and the like. More importantly, despite their allegiance to Pakistan as citizens of that country, they are living in Bangladesh for decades. In the absence of any effective diplomatic measures, they are likely to live in Bangladesh in the foreseeable future. This makes them a potentially destabilizing factor. The problem was further complicated with Pakistan's continuous attempts to push Pakistani citizens of Bangali origin back to Bangladesh. More ominous, the pattern of behavior as displayed by Pakistan suggests that it is trying to link the issue with the repatriation of stranded Pakistanis from Bangladesh.[9] And this poses a challenge to Bangladesh foreign policy in relation to Pakistan.

MAYNMAR

1 Rohingya Issue

ii Prospects for co-operation

3. **REGIONAL COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF SAARC**

From the very onset of de-colonization, South Asia has been beset with numerous interrelated domestic and inter-state conflicts. Parallel to these, there had been efforts in South Asia to reduce tension and even to find out an orderly structure of mutual relations with a view to releasing some of the resources and energy for the fulfilment of the tasks of socio-economic development. As suggested by the post-war experience of inter-state relations in South Asia, the region was left with two options:

i. to employ efforts with a view to resolving the issues of mutual discord and reaching a consensus on whence the treats come from and how to face them before going for regional co-operation; or

ii. to initiate a process of regional co-operation amidst conflicts and mistrust in the hope that regional co-operation itself would serve as a catalyst for conflict management and resolution.

South Asian tried the first option for about four decades with no tangible results. More frustrating, another four decades could have been spent trying the first option without seeing the light in the tunnel. Such a

situation tempted South Asian statesmen to try the second option the ultimate result of which was the creation of SAARC in 1985.

The central objective of South Asian leaders was to initiate the process of regional co-operation amidst mistrust and conflicts in the hope that regional co-operation would generate a dynamism of its won in the process of which mutual confidence could be built, conflicts and disputes could be resolved or, at least properly managed minimizing their damaging effects.

Past decade since the emergence of SARRC have shown how swiftly politics in South Asia can oscillate between conflict and co-operation, between combativeness and constructive diplomacy. Despite enormous difficulties suffered by South Asian countries in their mutual relationship, SAARC made considerable efforts to move towards substantive areas of co-operation. The most remarkable achievement has been the Agreement on South Asian Preferential Trading Agreement (SAPTA) signed by SAARC countries during the Seventh Summit of the organisation 0n 11 April, 1993. The aim of SAPTA was to augment inter SAARC trade. Accordingly, a list of 226 commodities for preferential tariff concessions, ranging from 10 to 100 percent, was approved by the Heads of State or Government of SAARC countries during the Eight Summit held in New Delhi during 2-4 May, 1995. With this final list of commodities, SAPTA came into operation on 7 December, 1995. Meanwhile, SAARC has also decided to transform SAPTA into a SAARC Free Trade Area (SAFTA) by 2001.

The concrete achievements of SAARC, in terms of fostering either regional co-operation or friendly relations among the member- states, were, however, not much significant. Gradually it became more and more evident that a regional politico-security environment full of suspicion and distrust, and a host of bilateral conflicts among the member-states are serving as a stumbling block in the way of moving towards substantive sares of co-operation within the framework of SAARC.

MAJOR ISSUES

I. India's regional ambitions and the response of neighboring countries;(India Doctrine)

II. Indo-Pakistan rivalry;

Recent change in India's approach to its South Asian neighbors.

While it is still to early to reach a conclusion, Indian policy towards its South Asian neighbors appears to be on the threshold of a qualitative transformation. At the center is a conscious effort o the part of the new rulers of India to replace India doctrine with what came to be known as 'Gujril Doctrine' The new doctrine envisages a friendly neighborhood around India. Along with accommodation on and reconciliation of differences among South Asian countries, the doctrine also envisages that no South Asian country should allow its territory to be used for any activity that casuses harm to the interests of the neighboring countries. [10] The new Indian policy, while being indicative of departure from the past, it is still far from taking a concrete shape. More important, its practical implementation

and the consequential reaction of India's neighbors still largely remains at the stage of speculation. In the circumstances, the policy itself and its implications for the region still remain open questions. For the same reason, they deserve careful scrutiny.

TWO MAJOR CHANGES

I. Gujral Doctrine;

II. As it seems, Pakistan's insistence that Kashmir problem must be resolved first before moving towards closer co-operation on substantive areas is gradually weakening.

IMPLICATIONS FOR SAARC:

Subregional Co-operation:

Facilitated by improved relations between India and Bangladesh on the one hand, and India and Nepal on the other, these three countries and Bhutan moved, rather quickly, to form a subregional co-operative framework: South Asian Growth Quadrangle. It would encompass Seven North-Eastern states of India and the three countries mentioned.

Area of co-operation : Trade, Transit, Common water resources and energy.

V. CONCLUDING REMARKS

As evident from the preceding discussions, an ear of fresh opportunity with enormous prospects for pulling the country out of the poverty trap and marching towards socio-economic progress has opened before the nation. These opportunities, however, are accompanied by formidable challenges. On the positive side, the country is also left with wide options. The paper dealt with the problems on how can foreign policy serve as an instrument of materializing these opportunities and facing these challenges. The tasks, however, are national, and to achieving them, it is necessary to mobilize the resources and the energy of the whole nation. In this regard, concerted efforts on the part of policy makers, diplomats, business circles, academia and professionals, and above all, the national leadership are indispensable.

This brings a very hard fact of our national life to the forefront: lack of consensus on a number of issues of vital importance. To this is added the fact that foreign policy remains a highly sensitive area of political polemics. Actions and inaction in the spheres of external relations, often, have been motivated more by narrow regime interests than broad national interests. On the other hand, instead of generating constructive debate, criticism on foreign policy often turned to be propaganda campaign aimed at achieving parochial political goals. The country needs a departure from the past. Some of the apparently irreconcilable differences among mainstream political forces on fundamental issues of domestic politics have already been bridged successfully. It is time to initiate efforts aimed at bridging the differences among the mainstream political forces on the basic issues of foreign policy and thus, achieving national consensus on the subject.

নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ

কাজী মোঃ শামসুল আলম
উপ-পরিচালক,বিপিএটিসি

ভূমিকা

পৃথিবীকে অধিকতর শান্তিময়, সুন্দর ও বাসযোগ্য করে তোলার আকাঙ্খা মানুষের চিরকালের। এ আকাঙ্খা থেকেই মানুষ স্বপ্ন দেখেছে, সংগ্রাম করেছে। বর্তমান শতাব্দীতে এক্ষেত্রে মানুষের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপটি হলো জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা। এর মাধ্যমে তৎকালীন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পুরনো বিশ্ব ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই স্নায়ুযুদ্ধের বিস্তার নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে অংকুরেই বিনষ্ট করে। বর্তমান দশকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর বিজয়ী মিত্রশক্তি ১৯৪৫ সনে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে। জাতিসংঘ সনদের প্রথম আর্টিকেলে ঘোষণা করা হয় জাতিসংঘের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, আর্ন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং জাতিসমূহের সমানাধিকারের ভিত্তিতে জাতিসমূহের মাঝে বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন। আর্ন্তজাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা মানবিক সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিস্তার ঘটানো। জাতিসংঘ সনদেই দুই নম্বর আর্টিকেলে বলা হয়েছে, জাতিসংঘ জাতিসমূহের সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মাঝে সৃষ্ট সকল বিরোধ শান্তিপুর্ণ উপায়ে নিস্পত্তি করতে হবে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ প্রতিশ্রুতি দেয়, তারা জাতিসংঘের আদর্শের পরিপন্থীরূপে শক্তি ব্যবহার করবে না অথবা শক্তি ব্যবহারের হুমকি দেবে না।[1]

জাতিসংঘের মাধ্যমে নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অচিরেই বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গের পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভেস্তে যায়। বিজয়ী মিত্রশক্তি মার্কিন ও সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন দুটি ব্লকে বিভক্ত হয়ে পরস্পর স্নায়ুযুদ্ধে লিপ্ত হয়।

---

1 The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 29. pp. 142-143.

স্নায়ুযুদ্ধ

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-র অমর সৃষ্টি মোনালিসা-র হাসির মতই স্নায়ুযুদ্ধ বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন অর্থ বহন করে। এটা ছিল বিশ্বের দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত। এটা ছিল ইউরোপের এবং সুনিদির্ষ্টভাবে জার্মনীর দুটি পরস্পর বিরোধী প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভূক্তি। এটা ছিল আদর্শগত সংঘাত, কারো কারো মতে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মাঝে, অন্যদের মতে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মাঝে। এটা ছিল তৃতীয় বিশ্বের আনুগত্য লাভ এবং তার উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এটা ছিল পর্দার অন্তরালে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বুদ্ধির লড়াই। এটা ছিল এমন এক সংগ্রাম যা সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানসমুহ এবং ইতিহাসকে পরিবর্তিত করেছিল। এটা ছিল এমন এক অস্ত্র প্রতিযোগিতা যা বিশ্বসভ্যতাকে সম্পুর্ণ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। কোরিয়া যুদ্ধ, কিউবা ক্ষেপণাস্ত্র সংকট এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধকে বিশ্বের সামনে প্রকটভাবে উপস্থাপিত করে। ১৯৯০ সনে জামানীর একত্রীকরণের মাঝ দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে। ১৯৯০ সনের নভেম্বরে প্যারিসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন, "স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হয়েছে।" ১৯৯১ সনে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি নিকট ভবিষ্যতে স্নায়ুযুদ্ধের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনাকে দুরীভূত করেছে।

নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণা

স্নায়ুযুদ্ধের অবসান নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণাকে সামনে নিয়ে এসেছে। নব্বইয়ের দশকে নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় সবচেয়ে খ্যাতনামা প্রবক্তা হচ্ছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ। তাঁর ধারণায় নয়া বিশ্ব বিব্যবস্থার মুল ভিত্তি হচ্ছে জাতিসমুহের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক আইনের শাসন বজায় রাখা। এর মাধ্যমেই বুশ প্রশাসন আর্ন্তজাতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্য অর্জন করতে চেয়েছে। উপসাগরীয় যুদ্ধকেও বুশ প্রশাসন নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছে। সাদ্দাম হোসেনকে নব্য হিটলার আখ্যায়িত করে বুশ বলেন, ইরাকের কুয়েত দখলের জোরালো ও আপোষহীন জবাব দেয়ার মাধ্যমেই কেবল ভবিষ্যতের আগ্রাসী শক্তিসমূহকে নিবৃত্ত করা যেতে পারে। বুশ প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যুক্তরাষ্ট্রকেই বিশ্বে সমষ্টিগত নিরাপত্তা রক্ষায় নেতৃত্ব নিতে হবে।[২]

অপরদিকে কিছু সংখ্যক সাংবাদিক এবং পন্ডিতদের মত অনুযায়ী নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হবে বিশ্বের সকল দেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্রায়ন পন্থীরা বিশ্বের অবশিষ্ট কমুনিষ্ট শাসিত দেশগুলো, একনায়ক শাসিত দেশগুলো এবং রাজা শাসিত দেশগুলোর দ্রুত গণতন্ত্রায়নের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে ; এর আর্ন্তজাতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য অনেক কম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে যদিও আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা পন্থী এবং বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রায়নের সর্মর্থকদের

[2] Ted Galen Carpenter, The New World Disorder, Foreign Policy, Fall, p. 25.

মাঝে নীরব আঁতাত লক্ষ্য করা যায় , এ আঁতাত দীর্ঘস্থায়ী হবে এমনটা আশা করা যায় না । কারণ লক্ষ্য দুটি পরস্পর বিরোধী ।[৩]

আশি ও নব্বইয়ের দশকের দ্রুত অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধি, সামরিক শক্তি, বিশাল আয়তন ও বিপুল জনসংখ্যার কারণে চীনের বিশ্ব রাজনীতিতে ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে । কারো কারো মতে চীন আগামী শতাব্দীতে বিশ্বে দ্বিতীয় পরাশক্তিরূপে আবির্ভূত হবে । নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা চীনের প্রতি তিনটি চ্যালেঞ্জের জন্ম দিয়েছে ঃ

১) পারমাণবিক অস্ত্রের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়া

২) সামরিক শক্তির চেয়ে অর্থনৈতিক শক্তির অধিকতর গুরুত্ব লাভ এবং

৩) মার্কিন-সোভিয়েত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চীনের কৌশলগত সুবিধা বিলুপ্তি ।

নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার মার্কিন ধারণার প্রতিক্রিয়ায় চীন এ সম্পর্কে তার ধারণা প্রকাশ করেছে । চীনের সংজ্ঞায় তিনটি বিষয় মুখ্য ঃ

১) বিশ্বের সকল দেশ ছোট অথবা বড়, সমমর্যাদা সম্পন্ন কোন দেশ অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না

২) বিশ্ব রাজনীতিতে একটি মাত্র দেশের ক্ষমতার একাধিপত্য রোধ করতে হবে । জাতিসমুহ সম্মিলিত ভাবে ক্ষমতা ভোগ করবে এবং জাতিসংঘ এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে

৩) নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও (New Inernational Economic Order) অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, যাতে উন্নত দেশগুলো উন্নয়নগামী দেশগুলোকে তাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তা করবে ।[৪]

চীনের দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্যের বাইরের অনেক দেশেরই সমর্থন পেয়েছে । কারণ প্রাচ্যের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল অনেক রাষ্ট্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পাশ্চাত্যের নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণাকে তাদের স্বার্থে ও মুল্যবোধের প্রতি হুমকি গণ্য করে । তাদের বিশ্বাস নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে পাশ্চাত্য নিজ স্বার্থ রক্ষায় তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দস্তক্ষেপ করবে এবং তাদের উপর নিজস্ব মুল্যবোধ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে । যা তাদের সামাজিক সুস্থিতি ও ঐতিহ্যগত মুল্যবোধের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে । তাছাড়া তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।

---

[3] Ibid, p. 26.

[4] Ja,es C Hsiung,'China's Ommi-Directional Diplomacy : Realignment to cope with Monopolar U.S. Power,' Asian Survey, Vol. XXXV, No. 6 June 1995, pp. 574-575.

জাতিসংঘ ও অন্যান্য আর্ন্তজাতিক সংস্থাকে পাশ্চাত্য তার নিজ আধিপত্য বজায় রাখা, স্বার্থ রক্ষা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুল্যবোধ বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে । এসব সংস্থার কার্যক্রম প্রাচ্যের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থের অনুকূলে হয়নি । নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণাকেও একইভাবে তাদের স্বার্থের পরিপন্থিরূপে ব্যবহার করা হতে পারে এ আশংকার জন্য তাদের দোষী করা যায় না ।

উপসংহার

আর্ন্তজাতিক স্থিতিশীলতা পন্থীদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিশ্বের সকল রাষ্ট্র যদি তাদের বিবাদ সামরিক শক্তি ব্যবহারের পরিবর্তে শান্তিপুর্ণ উপায়ে নিস্পত্তি করে তাহলে বিশ্ব মানব বসবাসের জন্য অধিকতর উপযুক্ত স্থান হয়ে উঠবে । একই রকমভাবে বিশ্বের অবশিষ্ট কমুনিষ্ট সরকার, সামরিক একনায়ক, একদলীয় রাষ্ট্র এবং সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারগুলোর জায়গায় যদি নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে পৃথিবী তুলনামুলকভাবে অনেক ভাল জায়গা হবে । তবে এ ধরণের ইউটোপিয়া (এ্যঢ়ষসভত) বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলেও তার জন্য কত মুল্য দিতে হবে, সেটাই ভেবে দেখার বিষয় । কারণ নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অথবা বিশ্বের গণতন্ত্রায়নের মুখরোচক বুলির আড়ালে বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর অপ উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । বৃহৎ শক্তিগুলোর অতীত কার্যকালপ আমাদের সেসব আশংকাকেই জোরদার করে । ১৯৫৩ সনে সিআইএ পরিচালিত অভ্যুত্থানে ইরানের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দেকের উৎখাত, ১৯৫৪ সনে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত অভ্যুত্থানে গুয়াতেমালার নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতাচ্যুতি, সত্তরের দশকে আলেন্দের নেতৃত্বাধীন চিলির নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতে যুক্তরাষ্টের প্রচেষ্টা, গণতন্ত্র এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আন্তরিকতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেনা । তাছাড়া স্বাধীনতার প্রতি ভালবাসার জন্য যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয় তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন স্বৈরশাসক যেমন ইরানের শাহ নিকারাগুয়ার সমোজা, দক্ষিণ কোরিয়ার পার্ক চুংহি এবং ফিলিপাইনের ফার্ডিন্যান্ড মার্কোসিকে সমর্থন করেনি । এসবের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বা কৌশলগত স্বার্থ জড়িত ছিল । সরকারীভাবে এসবের পেছনে যে উদ্দেশ্যগুলো দেখানো হয়েছিল তা ছিল নেহায়েতই প্রচারণা । তাই নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার মার্কিন ধারণা বা প্রচারণায় আমাদের উৎফুল্ল হবার তেমন কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না ।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Sameul P. Huntington, *The clash of civilizations? Foreign Affairs'*, Summer, 1993.

2. Robert Kagan, *The case for Global Activisim,* Commentary Vol. 98, Number Three, September 1994.

3. Francis Fukuyama, *'Against the New kPessimism.'* Commentary Vol. 97. Number 2 February 1994.

4. Mahathir Mohammad, *'Bpsnia and the West,'* the 5th column, FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW, September 7, 1995.